বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম

বাংলা ভাষা-২
ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও প্রায়োগিক বাংলা

কোর্স কোড : বিবিএ ২৩০২

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম

বাংলা ভাষা-২
ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও প্রায়োগিক বাংলা

রচনায়

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

ফিরোজা ইয়াসমীন

আমীনুর রহমান

সৌমিত্র শেখর

রচনাশৈলী নির্দেশনা ও সম্পাদনা

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ

গ্রন্থটি রেফারি কর্তৃক নিরীক্ষণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের
এসএসএইচএল-এর শিক্ষার্থীদের জন্য মুদ্রিত হয়েছে

বাংলা ভাষা- ২

ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও প্রায়োগিক বাংলা

(সকল স্বত্ব বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০১
পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩, ২০২৪

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
মাসুদ মাহ্‌মুদ মল্লিক
পিপিডি বিভাগ, বাউবি

কভার গ্রাফিক্স
আবদুল মালেক

ডিটিপি ও প্রাক-মুদ্রণ কার্যক্রম
ডিটিপি পুল
পিপিডি বিভাগ, বাউবি

অক্ষর বিন্যাস
মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম সরকার

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
সৃস্টি প্রিন্টার্স
৪৮, মাতুয়াইল, হাসেম রোড
ঢাকা।

ISBN: 984-34-1009-2

সূচি

ইউনিট-১ : প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের আলোচনা

পাঠ-১ : পদ-প্রকরণ ---------- ২
পাঠ-২ : সাধু ও চলিত ভাষা ---------- ১২
পাঠ-৩ : সন্ধি ---------- ১৬
পাঠ-৪ : সমাস ---------- ১৯
পাঠ-৫ : কারক ---------- ২৯
পাঠ-৬ : প্রচলিত ব্যাকরণে বাক্যরীতি ---------- ৩৬
পাঠ-৭ : উপসর্গ ও অনুসর্গ ---------- ৪১
পাঠ-৮ : যতি বা বিরাম চিহ্ন ---------- ৪৫

ইউনিট-২ : বাংলা শব্দসম্ভার

পাঠ-১ : বাংলা শব্দসম্ভার : ভূমিকা ও শ্রেণীকরণ ---------- ৫০
পাঠ-২ : বাংলা শব্দের শ্রেণীকরণ ---------- ৫৩
পাঠ-৩ : বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া ---------- ৫৯
পাঠ-৪ : বাংলা সমার্থক শব্দ : তালিকা ---------- ৬৫
পাঠ-৫ : বাংলা বিপরীতার্থক শব্দ : সজ্ঞার্থ, তালিকা ---------- ৬৮
পাঠ-৬ : বাংলা নানার্থক শব্দ : সজ্ঞার্থ, তালিকা ---------- ৭৩
পাঠ-৭ : জোড়া শব্দ : সংজ্ঞার্থ ও তালিকা ---------- ৭৭
পাঠ-৮ : বাংলা পদ-পরিবর্তন : তালিকা ---------- ৭৯
পাঠ-৯ : বাংলা প্রবাদ ও বাগধারা ---------- ৮৩

ইউনিট-৩ : বাংলা ভাষার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

পাঠ-১ : বাংলা শব্দের প্রয়োজনীতি ---------- ৯২
পাঠ-২ : বাংলা বানানের নিয়ম ---------- ৯৬
পাঠ-৩ : বাংলা শব্দের যথার্থ প্রয়োগ ---------- ১০৩

ইউনিট-৪ : বাংলা উচ্চারণ

পাঠ-১ : প্রমিত বাংলা উচ্চারণ : স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য ---------- ১০৭
পাঠ-২ : প্রমিত বাংলা উচ্চারণ : ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ---------- ১১৫
পাঠ-৩ : বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ ---------- ১২৩

ইউনিট-৫ : বাংলা অভিধান ও শব্দকোষ

পাঠ-১ : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ---------- ১৩০
পাঠ-২ : অভিধানের প্রয়োজনীয়তা ---------- ১৩৭
পাঠ-৩ : বাংলা অভিধানের ব্যবহার নীতি ---------- ১৩৯

ইউনিট-৬ : সাধারণ বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা
পাঠ-১ : ভাষাতত্ত্ব : সংজ্ঞার্থ ও শ্রেণীকরণ ---------- ১৪৪
পাঠ-২ : ধ্বনিতত্ত্ব ---------- ১৫১
পাঠ-৩ : রূপতত্ত্ব ---------- ১৫৮
পাঠ-৪ : বাক্যতত্ত্ব ---------- ১৬৪
পাঠ-৫ : অর্থতত্ত্ব ও অর্থ পরিবর্তন ---------- ১৭১
পাঠ-৬ : ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণ ---------- ১৭৬

ইউনিট-৭ : বাংলা পরিভাষা
পাঠ-১ : বাংলা পরিভাষা : ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা ---------- ১৮২
পাঠ-২ : বাংলা পরিভাষার ইতিহাস ---------- ১৮৫
পাঠ-৩ : বাংলা পরিভাষা নির্মাণ কৌশল ---------- ১৮৯

ইউনিট-৮ : অনুবাদ– ইংরেজি থেকে বাংলা
পাঠ-১ : অনুবাদ-ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা ---------- ১৯৩
পাঠ-২ : ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ কৌশল ---------- ১৯৬
পাঠ-৩ : নির্ধারিত পাঠের ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ ---------- ১৯৯

ইউনিট-৯ : পত্র রচনা
পাঠ-১ : পত্র রচনা- ভূমিকা, প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা ---------- ২০৪
পাঠ-২ : ব্যবহারিক পত্র ও দলিল রচনার কৌশল ---------- ২০৮
পাঠ-৩ : সংবাদপত্রে পত্ররচনার কৌশল ---------- ২১২
পাঠ-৪ : স্মারকলিপি, মানপত্র ইত্যাদি রচনার কৌশল ---------- ২১৬

ইউনিট-১০ : অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা
পাঠ-১ : অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ : ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ ---------- ২২১
পাঠ-২ : অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার কৌশল ---------- ২২৫
পাঠ-৩ : নির্ধারিত বিষয়ে অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা করা ---------- ২২৮

১

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের আলোচনা

ব্যাকরণ হলো ভাষার নিয়ম সংক্রান্ত ধারণা। প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার এ সব নিয়ম বা সূত্রের আলোচনা করে। সে-অনুযায়ী বাক্যের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা বিচার করা হয়। প্রতিটি ভাষাই অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি। বাক্যসমূহ কীভাবে ও কোন রীতিতে গঠিত হবে, তা প্রথাগত ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

স্কুল, কলেজে শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথাগত ব্যাকরণ পড়ে থাকেন। সেই পঠিত বা অর্জিত জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করার মানসেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রমে 'প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের আলোচনা'র বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ-১. পদ-প্রকরণ
- পাঠ-২. সাধু ও চলিত ভাষা
- পাঠ-৩. সন্ধি
- পাঠ-৪. সমাস
- পাঠ-৫. কারক
- পাঠ-৬. প্রচলিত ব্যাকরণে বাক্য রীতি
- পাঠ-৭. উপসর্গ ও অনুসর্গ
- পাঠ-৮. যতি, কমা (বিরাম চিহ্ন)

পাঠ - ১

পদ-প্রকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- *পদ কি তা জানতে পারবেন*
- *পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন*
- *পদের প্রকারভেদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা প্রথমেই পদ কী তা জেনে নিই, 'বিভক্তি যুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলা হয়।' যেমন, 'তিনি কাল সন্ধ্যায় আসবেন'-এই বাক্যে চারটি পদ আছে। পদ চার টি হলোঃ তিনি, কাল, সন্ধ্যায়, আসবেন।

অর্থাৎ, বিভক্তিযুক্ত নাম-শব্দ ও ধাতুই হলো পদ। বাংলা বাক্যে অনেক সময়েই পদের সঙ্গে কোন বিভক্তি লাগানোর দরকার হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, যে বিভক্তিটি লাগানো হয় তা যেন শূন্য; এ জন্য একে বলা হয় শূন্য বিভক্তি। যেমন, তিনি 'শাহনামা' পড়ছেন। এই বাক্যের 'শাহনামা' শব্দটিতে কোন বিভক্তি নেই, কিংবা বলা চলে 'শূন্য বিভক্তি' আছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন, উপরের আলোচনার আলোকে আমরা 'পদ'-এর একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলা হয়।

সংজ্ঞা: বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন, এবার পদের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করি।

পদ পাঁচ প্রকার। যথা– বিশেষ্য বা নাম, বিশেষণ, সর্বনাম বা প্রতিনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

বিশেষ্য পদ

যে পদে কোন কিছুর নাম বোঝায় তা-ই বিশেষ্য বা নাম পদ।

যে পদে কোন কিছুর নাম বোঝায় তা-ই বিশেষ্য বা নাম পদ। কীসের নাম বোঝায়, এই ভিত্তিতে বিশেষ্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আসুন আমরা বিশেষ্যের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করি।

- **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোন বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, দেশ, নদী, পর্বত ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– নজরুল, পদ্মা, ঢাকা, শৈলকুপা ইত্যাদি।
- **জাতিবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোন প্রাণী, মানুষ প্রভৃতির সাধারণ নাম বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বা সামান্যবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– ইংরেজ, গরু, পাখি, মানুষ, পশু ইত্যাদি।
- **বস্তুবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোন বস্তুর বা পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বা পদার্থবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– জুতো, কাঠ, রসগোল্লা, বাতাস ইত্যাদি।
- **সংখ্যা বা পরিমাণবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে সংখ্যা অথবা পরিমাণ বোঝায় তা-ই সংখ্যাবাচক বিশেষ্য বা পরিমাণবাচক বিশেষ্য। যেমন– উনিশ, মিটার, কিলোগ্রাম, ঘণ্টা, ডজন ইত্যাদি।
- **গুণবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে গুণ, দোষ, ইত্যাদির ভাব বোঝায় তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন– সাহস, পাপ, পুণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি।

- **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য শব্দে কোন কিছুর সমষ্টি বোঝায় তা-ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যেমন– শ্রেণী, গুচ্ছ, ঝাঁক, জনতা ইত্যাদি।
- **অবস্থাবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোন অবস্থার নাম বোঝায় তাকে অবস্থাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– সুখ, পরাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি।
- **ভাববাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে মনোগত কিংবা অবস্থাগত ভাব বোঝায় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– সুখ, আনন্দ, দুঃখ, গুরুত্ব, উন্মাদনা ইত্যাদি।
- **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোন কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– যাওয়া, খাওয়া, দেখা, লাগানো ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ

বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন– সুন্দরী তরুণী, ভালো ছেলে।

'সুন্দরী তরুণী' বললে সব তরুণীকে না বুঝিয়ে শুধু সুন্দরীদের বোঝানো হয়েছে। তেমনি, 'ভালো ছেলে' বললে সব ছেলেকে বোঝানো হয় না, শুধু 'ভালো' ছেলেদের বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন, উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বিশেষণ পদের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: যে পদ অন্য কোন পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

যে পদ অন্য কোন পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

বাক্যের মধ্যে কোথায় রয়েছে, কোন শ্রেণীর পদকে বিশেষিত করছে, বিশেষণ পদটি কীভাবে গঠিত হচ্ছে, এ সব দিক বিবেচনা করে বিশেষণের বেশ কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

বাক্যের অবস্থা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ

ক. সাক্ষাৎ বিশেষণ : যে বিশেষণ বিশেষিত পদের আগে বসে তাকে সাক্ষাৎ বিশেষণ বলে। যেমন– হালকা মেঘ, অপূর্ব দৃশ্য, তাড়াতাড়ি এসো ইত্যাদি। এখানে হালকা, অপূর্ব, তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ বিশেষণ।

খ. বিধেয় বিশেষণ : কোন বিশেষণ বাক্যের বিধেয় অংশ হলে তাকে বিধেয় বিশেষণ বলে। নাম বিশেষণই সাধারণত এই শ্রেণীর বিশেষণ হয়। যেমন– শিমুর মাথার চুল খুব লম্বা। ডলি অসুস্থ। সমুদ্রের পানি নীল। এখানে, লম্বা, অসুস্থ, নীল বিধেয় বিশেষণ।

কোন শ্রেণীর পদকে বিশেষিত করছে এই অনুসারে

ক. বিশেষ্যের বিশেষণ : যে বিশেষণ কোন বিশেষ্য অথবা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, বর্ণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে নাম বিশেষণ বলে। এর দুটো শ্রেণী হতে পারে। বিশেষ্য বা নামপদের বিশেষণ হলে বিশেষ্যের বিশেষণ; আর সর্বনামের বিশেষণ হলে সর্বনামের বিশেষণ। তবে এরা আলাদা কোন বিশেষণ নয়, একই বিশেষণ সর্বনাম কিংবা বিশেষ্যের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণে বিষয়টি দেখানো হলো। বিশেষ্যের বিশেষণ: বিরাট বাড়ি, বুদ্ধিমতী মেয়ে। সর্বনামের বিশেষণ : তুমি সত্যবাদী, সে বিদ্বান।

খ. বিশেষণের বিশেষণ : যে বিশেষণ অন্য কোন বিশেষণ পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ এদের দোষ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে নাম বিশেষণ কিংবা ক্রিয়া বিশেষণ– এই দুই রকম বিশেষণই বিশেষণের বিশেষণ হতে পারে। যেমন, খুব ভাল মেয়ে। ভারি চমৎকার ছবি। খুবই আস্তে কথা বলেন তিনি। এখানে– খুব, ভারি, খুবই বিশেষণের বিশেষণ।

গ. ক্রিয়ার বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ ঃ যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা, ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায় তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। তাড়াতাড়ি যাও। সহাস্যে বললেন। আস্তে বল। এই তিনটি বাক্যে 'তাড়াতাড়ি' 'সহাস্যে' 'আস্তে' এই তিনটি পদ যাও, বললেন ও বলা ক্রিয়াকে বিশেষণ করছে।

অর্থ ও রূপ অনুযায়ী ক্রিয়া বিশেষণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

অর্থ অনুযায়ী ভাগ

- কালবাচক : 'সদা থাকো আনন্দে'। (রবীন্দ্রনাথ)
- স্থানবাচক : কোথায় পাব তারে।
- প্রকৃতিবাচক : সহাস্যে বললেন; দারুণ লাগছে।

রূপগত ভাগ

- বিভক্তিহীন : বৃষ্টি-পড়ে টাপুর-টুপুর।
- বিভক্তিযুক্ত : সাবধানে থেকো।
- প্রত্যয়যুক্ত : কার্যত দেখা গেল।
- অসমাপিকা ক্রিয়া : গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে। (অতুল প্রসাদ)
- দ্বিরুক্তশব্দ : ঝরঝর ঝরছে।

ঘ. অব্যয়ের বিশেষণ : অব্যয় পদের বিশেষণকে অব্যয়ের বিশেষণ বলা হয় । যেমন, ঠিক সামনে নজর রাখো; অতি অকস্মাৎই ঘটনাটা ঘটলো।

গঠনের বিচারে

ক. তদ্ধিত প্রত্যয়জাত বিশেষণ : শব্দে যে প্রত্যয় যোগ করা হয়, তা তদ্ধিত প্রত্যয়। বহু বিশেষ্য শব্দে এই শ্রেণীর প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ পাওয়া যায়। এই জাতীয় বিশেষণই হলো তদ্ধিত প্রত্যয়জাত বিশেষণ। যেমন, মঙ্গল+ইক(ঠঞ্) = মাঙ্গলিক, শরদ্+অ (অণ্) = শারদ, নেপাল+ই=নেপালি।

খ. ক্রিয়াজাত বিশেষণ : ধাতুর সাথে কৃৎপ্রত্যয় যোগ করে যে শব্দ হয় তার পদ বিশেষণ হলে তাকে বলা হয় ক্রিয়াজাত বিশেষণ। এর অন্য নাম কৃদন্ত বিশেষণ। এই শ্রেণীর বিশেষণের কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করা যায় :

- কৃদন্ত একপদী : নিরন্ত, ধর্তব্য।
- কৃদন্ত বহুপদী : হারিয়ে-যাওয়া ধন।
- ক্রিয়াদ্বিত্বজাত : আসি আসি ভাব; পালাই পালাই মন।
- ধ্বন্যাত্মক শব্দজাত : প্যাঁক পেকে হাঁস।
- অসমাপিকা ক্রিয়াজাত : চেঁচিয়ে বলল।
- ক্রিয়াবিশেষ্যজাত : পাখিতে খাওয়া কলা।

গ. সর্বনামজাত বিশেষণ : দেশ, কাল, পরিমাণ, সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রকাশে কিছু কিছু সর্বনাম প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণের কাজ করে– এদের বলা হয় সর্বনামজাত বিশেষণ। যেমন– এত আলো, তত টাকা; যত তারা তব আকাশে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ঘ. অব্যয়জাত বিশেষণ : বিশেষণ হিসেবে অব্যয় ব্যবহৃত হলে তাকে অব্যয়জাত বিশেষণ বলে। আচ্ছা বিপদ; অকস্মাৎ বৃষ্টি। তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

সর্বনাম পদ

যে পদ বিশেষ্য বা নামপদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। আমি, তুমি, সে, তা, এটি, কী, সর্বনামের উদাহরণ।

যে পদ বিশেষ্য বা নামপদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে আলোচনা করি।

- একই বিশেষ্য পদের বারবার ব্যবহার পরিহার করার জন্য সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন, শিমু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় নি। সে অসুস্থ।
- কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় না জানা থাকলে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কেউ নিশ্চয় আছে।
- পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন, নাম জানার কী দরকার কেউ একজন হবেন।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন- কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে; (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

বাংলা সর্বনামকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

ক. ব্যক্তি বাচক বা পুরুষবাচক : ব্যক্তিনামের পরিবর্তে যে সর্বনাম বসে তাকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বা পুরুষবাচক সর্বনাম বলে। এই সর্বনামের তিনটি শ্রেণী আছে। নিচে শ্রেণীগুলো আলোচনা করা হলো।

পুরুষভেদে সর্বনামের তিনটি ভাগ আছে, সেগুলি হলোঃ

- উত্তমপুরুষ : বক্তা স্বয়ং কিংবা তার সাথে অন্য যাঁদের হয়ে তিনি বলছেন, তিনি হলেন উত্তমপুরুষ। যেমন– আমি, মুই, আমরা, মোরা। লিঙ্গভেদে এই সর্বনামের কোন পরিবর্তন হয় না। বচন ও কারকের বিভক্তি এর সাথে যুক্ত হয়। অবিভক্তিক রূপ 'আমি'। বিভক্তিগ্রাহী রূপ 'আমা'। এই সর্বনামের কিছু বিভক্তিযুক্ত রূপ– আমার, আমাকে, আমায়, মোর, আমাদের, মোদের, আমাদিগকে, আমাদিগের, আমাদেরকে। আমাদেরকে বেশি ব্যবহৃত হয় না। মোর, মোদের, প্রধানত কবিতায় ব্যবহার হয়। মুই, মোদিগকে, সাধারণত আঞ্চলিক ভাষায় শোনা যায়।

বক্তা স্বয়ং কিংবা তার সাথে অন্য যাঁদের হয়ে তিনি বলছেন, তিনি হলেন উত্তমপুরুষ।

- মধ্যমপুরুষ : কোন বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতা হলো মধ্যমপুরুষ। এই পুরুষে ব্যবহৃত সর্বনাম– তুমি, তোমরা। এটি সাধারণ রূপ। এ ছাড়া একটি সম্মানিত রূপ আছে। সম্মানিত রূপ হলো– আপনি, আপনারা। এবং তুচ্ছার্থক রূপ হলো– তুই, তোরা। লিঙ্গ ভেঙ্গে এই সর্বনামের কোন পরিবর্তন হয় না। বচন ও কারক ভেদে বিভক্তিযুক্ত হয়ে অন্য রূপ নেয়। এই সর্বনামের কিছু উদাহরণ– তোমার, তোমাকে, তোমাদের, আপনার, আপনাকে, আপনাদের, তোর, তোকে, তোদের।

কোন বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতা হলো মধ্যমপুরুষ।

- প্রথম পুরুষ : যেখানে কোন কথাবার্তা হচ্ছে সেখানে অনুপস্থিত, কিন্তু কথাবার্তায় উল্লিখিত এমন ব্যক্তি কিংবা বস্তু কিংবা প্রাণী প্রথম পুরুষ। যেমন– বাসায় এসে দেখি শিমু বসে আছে। তিনি এখনও আসেন নি। প্রথম পুরুষের জন্য যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয় তা হলো– সে, তারা, তাহারা; তিনি, তারা, তাঁহারা; ও, ওরা, ওরা; উহা, উহারা। লিঙ্গ ভেদে এ সব সর্বনামের কোন পরিবর্তন হয় না। তবে বচন ও কারকভেদে প্রত্যয় অথবা বিভক্তিযুক্ত হয়ে অন্য রূপ নেয়। যেমন- সে, তাকে, তার; তিনি, তাকে, তাঁর, তাঁহার, তাঁরা, তাহার, তাদের, তাদেরকে, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদিগের; ও, ওকে, ওর; ওঁর, ওঁকে, ওদের, ওদেরকে; ওঁদের ওঁদেরকে, উহাদিগের, উহাদিগকে। প্রথম পুরুষের সর্বনামগুলির মধ্যে কিছু সর্বনাম কেবল প্রাণীবাচক শব্দের পরিবর্তেই বসে। যেমন– সে, তিনি, তারা, তাঁরা, তাঁহার। কিছু সর্বনাম অপ্রাণীবাচক ও প্রাণীবাচক দুরকম শব্দের পরিবর্তেই বসতে পারে। যেমন– এ, এটা, সেটি, ওগুলো, সেটা।

যেখানে কোন কথাবার্তা হচ্ছে সেখানে অনুপস্থিত, কিন্তু কথাবার্তায় উল্লিখিত এমন ব্যক্তি কিংবা বস্তু কিংবা প্রাণী প্রথম পুরুষ।

খ. নির্দেশক বা নির্ণয়বাচক : যে সর্বনামে কোন কিছুকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বা নির্ণয় বাচক সর্বনাম বলে। এই শ্রেণীর সর্বনামের দুটো শ্রেণী আছে।

- দূরত্ববাচক : এই শ্রেণীর নির্দেশক সর্বনাম দূরের জিনিস নির্দেশ করে। যেমন– ওটা, ওরা, ওঁরা, ওইটা, ওইগুলি।
- সামীপ্যবাচক : কাছের জিনিসকে নির্দেশ করতে এই শ্রেণীর নির্দেশক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন– এটা, এইটা, এইগুলি, এইটি, এঁরা, এরা, ইনি, এগুলি।

গ. অনির্দেশ বাচক বা অনিশ্চয়বাচক : যে সর্বনাম কোন কিছুকে সরাসরি নির্দিষ্ট করে দেয় না, তাকে অনির্দেশক সর্বনাম বা অনিশ্চয়বাচক সর্বনাম বলা হয়। যে ব্যক্তি কিংবা বস্তুর পরিচয় জানা নেই, তাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত সর্বনামও এই শ্রেণীর। যেমন– কেউ, কিছু, অমুক, কোথাও, কখনো। একাধিক সর্বনাম অথবা সর্বনামের দ্বিত্ব অনির্দেশক সর্বনামের কাজ করতে পারে। এদের বলা হয় যৌগিক সর্বনাম। যেমন– যে কেহ, কেউ কেউ, কোন কিছু, যা কিছু. অন্য কিছু, কিছু কিছু।

ঘ. প্রশ্নবাচক : প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জন্য যে সর্বনাম বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে। যেমন– কে, কারা, কী, কোন, কই, কোথায় ইত্যাদি।

ঙ. আত্মবাচক বা আত্মবোধক : অন্য কারো সহায়তায় নয় বা মাধ্যমে নয়, কর্তা নিজেই– এ রকম ভাব বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বা আত্মবোধক সর্বনাম বলা হয়। যেমন, তিনি স্বয়ং এসেছিলেন। আমি নিজের চোখে দেখলাম। এই সর্বনামকে স্বকর্তৃত্বজ্ঞাপক সর্বনামও বলা হয়ে থাকে। এর একটি বিশেষ রূপকে বলে ব্যতিহার সর্বনাম। এতে দুই পক্ষের সহযোগ বা একের উপর অন্যের নির্ভরতা বোঝায়। যেমন, ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে। দুই ভাই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

চ. সংযোগবাচক বা সংগতিবাচক : যে সর্বনাম দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে। তাকে সংযোগবাচক সর্বনাম বা সংগঠিতবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, আমি বললাম যে তুমিই এই কাজটা করো। আমি বলি কী তুমি এখানেই থেকে যাও। সাপেক্ষ বা সমুচ্চয়ী সর্বনাম সংযোগবাচক সর্বনামেরই একটি বিশেষ ব্যবহারিক রূপ।

ছ. অন্যাদিবাচক : যে সর্বনাম নিজ ভিন্ন অন্যকে বোঝায় তাকে অন্যাদিবাচক সর্বনাম বলা হয়। যেমন– অন্য, অপর, অমুক।

জ. সাকুল্যবাচক : যে সর্বনাম ব্যক্তি, বস্তু প্রভৃতির সমষ্টি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে সাকুল্যবাচক সর্বনাম। যেমন– উভয়, সকল, ইত্যাদি, প্রভৃতি।

ঝ. প্রতিনির্দেশক : যার-তার, যে-সে ইত্যাদি সর্বনাম একের সঙ্গে অন্যটি ব্যবহৃত হয়। এদের বলা বলা হয় প্রতিনির্দেশক সর্বনাম।

অব্যয়

লিঙ্গ, বচন ও কারকভেদে যে পদের কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করা যায় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।

লিঙ্গ, বচন ও কারকভেদে যে পদের কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করা যায় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অব্যয়ের সংজ্ঞা যেভাবে দিয়েছেন তা হলো, 'বাক্যগত উক্তিকে এবং বাক্যস্থ অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রকার বিষয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দেয়, এমন পদকে অব্যয় বলে।'

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করি।

অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে অনেক রকম মত আছে। সে-সব মতের সমন্বয়ে অব্যয়ের যে শ্রেণীবিভাগ করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হলো।

ক. মনোভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক : আবেগ, প্রশ্ন, ঘৃণা, বিরক্তি, প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশক শব্দ, যা বাক্যের অন্বয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়েও বাক্যে পদ হিসেবে থাকে, তাদের বলা হয়

মনোভাববাচক অব্যয় বা আবেগবাচক অব্যয় বা অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয়। কী ধরনের ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে, এই বিচারে মনোভাববাচক অব্যয়ের বেশ কয়েকটি শ্রেণী আছে।

- প্রশ্নবাচক : সে কী আসবে ?
- বাক্যালংকার বা অনর্থক : কিছুই তো বাকি থাকবে না।
- নিষেধাত্মক : তুমি এখন যাবে না।
- অসম্মতিজ্ঞাপক : কখনোই না।
- সম্মতিজ্ঞাপক : আচ্ছা তোমার কথাই রইল।
- প্রশংসাবাচক বা অনুমোদনসূচক : 'আ মরি বাংলা ভাষা'-(অতুল প্রসাদ)।
- ঘৃণা-বিরক্তিসূচক : ধ্যুৎ, এটা কী করেছ তুমি ?
- ভয়-যন্ত্রণা-মনোকষ্টজ্ঞাপক : হায় হায়, সব গেল।
- বিস্ময়সূচক : একী অবাক কান্ড।
- করুণাসূচক : আহা! বেচারাকে আমার কাছে আসতে দাও।
- সম্বোধন বা আহ্বান সূচক : হে বন্ধু হে প্রিয়।

খ. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় একাধিক পদ কিংবা বাক্যের সংযোগ ঘটায়, অথবা তাদের পৃথক করে, কিংবা সংকোচন করে তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। সমুচ্চয়ী অব্যয়ের বেশ কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। নিচে প্রকারভেদের আলোচনা করা হলো:

- সংশয়বাচক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় সন্দেহ দ্বিধা ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন, 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। 'ওই বুঝি বাঁশি বাজে, (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
- সংযোজক বা যোজক অব্যয় : যে অব্যয় দুটি পদ কিংবা দুটি খন্ডবাক্যকে জোড়া লাগানোর কাজ করে, তাকে সংযোজক অব্যয় বা যোজক অব্যয় বলে। যেমন, মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। সে এসে পৌঁছালো এবং তৎক্ষণাৎ ট্রেন ছাড়লো। কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাউরুটি আর ঝোলা গুড়।
- বিয়োজক বা বৈকল্পিক অব্যয় : যে অব্যয় দুটি বিকল্পের মধ্যে সংযোগ সাধন করে, তাকে বিয়োজক বা বৈকল্পিক অব্যয় বলে। শাপলা অথবা শিমু যাবে। গোসল করে যাবে না এসে গোসল করবে? সে এখানে আসবে কিংবা আমি সেখানে যাব।
- সংকোচ অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় সাধারণত দুটি বাক্যকে যুক্ত করে। যুক্ত বাক্য সাধারণত বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। যেমন– সে সব জানল ও বুঝল কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। এত বিশ্বাস করলাম অথচ সেই আমাকে ঠকাল!
- হেতুবাচক বা কারণাত্মক অব্যয় : যে অব্যয় কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশক দুটি বাক্যকে যোজনা করে, তাকে হেতুবাচক অব্যয় বা কারণাত্মক অব্যয় বলে। যেমন, এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে বাইরে যাওয়া যায় নি। হাতে টাকা ছিল না বলেই তখন দাম দিতে পারি নি। দলের সবাই সভাত্যাগ করলেন, সুতরাং তাঁকেও যেতে হলো।
- ব্যতিরেকাত্মক বা অন্যথাসূচক অব্যয় : কোন একটি ঘটনা না ঘটলে তার পরিণতিতে কী হবে, এ রকম ভাব প্রকাশক দুটো বাক্য কিংবা বাক্যাংশকে যে অব্যয় দিয়ে যুক্ত করা হয় তাই-ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় বা অন্যথাসূচক অব্যয়। যেমন, ভালো করে পড় নইলে ফেল করবে। একটু আগেই যেয়ো নতুবা বসার জায়গা পাবে না। যদি টাকার যোগাড় না হয় তাহলে কী হবে?
- নিত্যসম্বন্ধী বা সাপেক্ষ অব্যয় : কিছু কিছু অব্যয় সর্বদাই একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের অব্যয়কে নিত্যসম্বন্ধী বা সাপেক্ষ অব্যয় বলা হয়। নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়ের উদাহরণ, যেমন– তেমন, পাছে-তাই, যদি-তবু, বটে-কিন্তু। 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে'। 'পাছে সুর ভুলি তাই ভয় হয়'-(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

- প্রতিষেধক বা সীমানির্দেশক বা প্রতিপাক্ষিক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় দুটি বাক্যকে যুক্ত করে দেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রথম বাক্যটির অর্থকে নির্দিষ্ট অথবা সীমিত করে। যেমন, সবাই এসেছিল শুধু একজন বাদে। এত বৃষ্টি হলো তবু গরম কমল না। পরিশ্রান্ত হয়েছ বরং একটু বিশ্রাম নাও।
- অবস্থাত্মক বা ঘটনাসূচক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় সাধারণত বাক্যের প্রথমে বসে ও পরের খন্ডবাক্য দুটিকে জুড়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে একটি খন্ডবাক্যকে অন্যটির সাপেক্ষ ও শর্তাধীন করে দেয়। যেমন, যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম। -(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। যদি উপায় থাকতো তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করতাম।
- ব্যবস্থাত্মক অব্যয় : এই শ্রেণীর অব্যয় এমন দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায় যার প্রথমটি কোন অবস্থার কথা জানায়, আর দ্বিতীয়টি সেই অনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেয়া হলো তা প্রকাশ করে। যেমন, গরম লাগছিল তাই পাখাটি চালিয়ে দিলাম। কাজটা শক্ত তাহলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
- উপমাদ্যোতক অব্যয় : যে অব্যয় উপমান ও উপমেয়র মধ্যে সংযোগ ঘটায় তা উপমাদ্যোতক অব্যয়। যেমন, চাঁদের মত মুখখানি– উপমা দেয়া হচ্ছে মুখ-এর। তাই 'মুখ' উপমেয়। চাঁদের সঙ্গে উপমা দেয়া হচ্ছে– 'চাঁদ' উপমান। 'মত' অব্যয়টি এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটাচ্ছে। তাই এটি হলো উপমাদ্যোতক অব্যয়। তেমনি, কচি কলাপাতার মত সবুজ রং।

গ. পদান্বয়ী অব্যয় : যে অব্যয় বাক্যের দুটি পদের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে, তাকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। এই শ্রেণীর অব্যয় প্রকৃতপক্ষে অনুসর্গ। যেমন- আমার দ্বারা; সুখের জন্য; আনন্দের সঙ্গে; তোমাকে দিয়ে একাজ হবে না । অনেক উপমাদ্যোতক অব্যয়কেও এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। যেমন– পাগলের মত ; কানু হেন গুণবিধি।

ঘ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে অনেক সময়েই অব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং তাকে বলা হয়ে থাকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। যেমন, শূন্য বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। স্কুলে ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠলো। মাছি ভন ভন করে। ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই শ্রেণীর অব্যয়কে অনুকার অব্যয় বা অন্ধকার সূচক অব্যয়ও বলা হয়। উপরের উদাহরণের ধ্বন্যাত্মক শব্দের অনেকগুলিই ক্রিয়া বিশেষণ, কয়েকটি সংযোগমূলক ক্রিয়া। ধ্ব্যাত্মক শব্দ অন্য যে কোন শব্দের মতই বাংলা শব্দ। তা বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া সব রকমেই হতে পারে। যেজন্য এদের নির্বিচার অব্যয় হিসেবে গণ্য করা চলে না।

ক্রিয়া পদ

বাক্যে যে পদ কোন কিছু করা, ঘটা, হওয়া ইত্যাদি নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়া বলে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন ক্রিয়াপদ কাকে বলে প্রথমেই আমরা তা জেনে নিই।

বাক্যে যে পদ কোন কিছু করা, ঘটা, হওয়া ইত্যাদি নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়া বলে।

বাক্যে ক্রিয়া পদ থাকবেই। আমি যাই। তিনি এসেছিলেন। সবাই বলল। তবে বাংলায় অনেক সময়ই ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। 'ঢাকা একটি শহর'। এর ক্রিয়াপদ 'হয়' উহ্য আছে। তবে এ ধরনের বাক্য অতীতকাল হলে উহ্য ক্রিয়াটি বেরিয়ে পড়ে। 'সুমি সুন্দরী'। এই বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য। কিন্তু 'সুমি সুন্দরী ছিল'। এখানে 'ছিল' ক্রিয়াপদটিকে উহ্য রাখা যায় না। ধাতুর উত্তর বা পরে ক্রিয়া বিভক্তি যোগে ক্রিয়া পদ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন, করি(কর+ই); যাব>যাইব(যা+ইব); পড়ছি> পড়িতেছি (পড়+ ইতেছি) ইত্যাদি। সব ক্রিয়াই কোন না কোন ধাতু থেকে উৎপন্ন। ক্রিয়ার অনেক রকম শ্রেণী বিভাগ সম্ভব। যেমন: সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, অপূর্ণরূপ ক্রিয়া, অকর্তৃক ক্রিয়া, অস্ত্যর্থ ক্রিয়া, নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া, ণিজন্ত ক্রিয়া, সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক ক্রিয়া।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমেই আমরা সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া কি তা জেনে নিয়ে অন্য ক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করবো।

সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার বর্ণিত বিষয় শুধুমাত্র উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেই সম্পূর্ণ হয় না, অন্য কিছুকে নিয়ে তবেই পূর্ণ হয়, সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলা হয়। সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম থাকে। সে ভাত খায়।

যে ক্রিয়ার বর্ণিত বিষয় শুধুমাত্র উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেই সম্পূর্ণ হয় না, অন্য কিছুকে নিয়ে তবেই পূর্ণ হয়, সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলা হয়। সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম থাকে।

এই বাক্যে 'খায়' ক্রিয়াপদটির কর্তা 'সে', কর্ম 'ভাত'। তাহলে 'খায়' ক্রিয়া সকর্মক। সে আমাকে উপহার দিয়েছে। মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন। ক্রিয়াটির বিষয়ে কী কিংবা কাহাকে (কাকে) প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পাওয়া যায়, তাহলে ক্রিয়াটি সকর্মক। কোন কোন সকর্মক ক্রিয়ার একটি মাত্র কর্ম থাকতে পারে। সে ফুটবল খেলে। বাঘ মাংস খায়। এখানে 'খেলে' ও 'খায়' ক্রিয়াপদগুলি বিষয়ে 'কী' প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে 'ফুটবল' এবং 'মাংস'। 'কাকে' প্রশ্নটির উত্তর এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুটি কর্ম হওয়া সম্ভব। এ রকম ক্রিয়াকে বলে দ্বিকর্মক ক্রিয়া। তিনি আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। এখানে 'দিয়েছেন' ক্রিয়ার দুটি কর্ম 'আমাকে' ও 'কলম'। ণিজন্ত বা প্রযোজক ক্রিয়া সব সময় সকর্মক।

অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম নেই এবং কর্ম থাকাও সম্ভব নয়, তাকে বলা হয় অকর্মক ক্রিয়া। এই ধরনের ক্রিয়াতে কেবল ঘটনাটাই বোঝায়, কার অথবা কীসের ওপর তা ঘটছে, তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সে যায়। জাহাজ জলে ভাসে। সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে-(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উদাহরণগুলির যায়, ভাসে,আসে ইত্যাদি ক্রিয়াপদ অকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কর্ম নেই এবং কর্ম থাকাও সম্ভব নয়, তাকে বলা হয় অকর্মক ক্রিয়া।

ক্রিয়াপদের অন্যান্য শ্রেণীর আলোচনা নিচে করা হলো:

- অপূর্ণরূপ ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া : যে সব ক্রিয়াকে সব রকম কালে ও ভাবে প্রকাশ করা চলে না তাদের বলা হয় অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বা অপূর্ণরূপ ক্রিয়া বা পঙ্গুক্রিয়া। যে সব ধাতু থেকে এই ধরনের ক্রিয়া হয় তাদের নাম অসম্পূর্ণ ধাতু বা পঙ্গু ধাতু। 'আছ্' ধাতুর ভবিষ্যৎকাল নেই, এই কালের জন্য 'থাক' - ধাতু ব্যবহার করতে হয়। 'বট্' ধাতুর বর্তমান কাল ছাড়া অন্য কোন কাল নেই। আমি আজ চোর বটে। কিন্তু 'বটব', 'বটতাম' হয় না। 'যা'-ধাতুর ক্ষেত্রে অতীতকালে 'গম্' ধাতুর সাহায্য লাগে। যায়, যাবে কিন্তু গেল, গেলাম। পুরাঘটিত বর্তমানেও তাই।
- অকর্তৃক ক্রিয়া বা কর্মহীন ক্রিয়া : অনেক ক্রিয়াপদের কর্তা থাকে না কিংবা তাদের নির্ণয় করা যায় না। এই জাতীয় ক্রিয়াপদকে অকর্তৃক ক্রিয়া বা কর্তাহীন ক্রিয়া বলা হয়। যেমন, লজ্জা করছে; শীত করছে; খিদে পেয়েছে, গরম লাগছে।
- অস্ত্যর্থ ক্রিয়া বা অস্তিবাচক ক্রিয়া : অস্তিত্ব-থাকা ইত্যাদি বোধক ক্রিয়াপদকে অস্ত্যর্থক ক্রিয়া বা অস্তিবাচক ক্রিয়া বলা হয়। হ, আছ, বৃৎ, রহ্, থাক্ প্রভৃতি ধাতু থেকে এই শ্রেণীর ক্রিয়া হয়। যেমন, বাড়ীতে চাল আছে। তার অনেক টাকা ছিল। তুমি আজ সাধু বটে।
- ন্যাস্ত্যর্থ ক্রিয়া বা নঞর্থক ক্রিয়া : যে সব ক্রিয়াপদ নঞর্থক অর্থাৎ না, নাই, নিষেধ, প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে তাকে নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া বা নঞর্থক ক্রিয়া বলে। যেমন, সে বাড়ীতে নেই। কাজটা সহজ নয়।
- **ণিজন্ত ক্রিয়া বা প্রযোজক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ায় অন্যকে দিয়ে করানো বা সংগঠন বোঝায়, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বা ণিজন্ত ক্রিয়া বলে। যেমন, মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন। তিনি মিস্তিরিকে দিয়ে কলটা সারিয়ে নেবেন। তিনি লোক দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করাচ্ছেন। ণিচ্ প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন প্রযোজক ধাতু হয়, সংস্কৃতে তাকে বলে ণিজন্ত। বাংলা প্রযোজক ধাতু গঠনের মূল ধাতুর সঙ্গে 'আ' অথবা 'ওয়া' যোগ করতে হয়। এরা কোন মতেই 'ণিচ্' প্রত্যয় নয়। তবুও সংস্কৃত নামের অনুষঙ্গে ণিজন্ত শব্দটি বাংলায় চলছে। যেমন, √কর্+আ(ণিচ্)→√করা। এর থেকে ক্রিয়ারূপ করানো, করাচ্ছি, করাব, করাবেন ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই ধাতুর ক্রিয়াবিশেষ্য করানো। √খা + ওয়া (ণিচ্)→√ খাওয়া। এর থেকে ক্রিয়াবিশেষ্য খাওয়ানো। ক্রিয়ারূপ–খাওয়ায়, খাওয়াবেন, খাওয়াচ্ছেন ইত্যাদি।
- **সমাপিকা ক্রিয়া :** বাক্যের যে ক্রিয়া কিংবা ক্রিয়ারূপ বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট করে ও বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করে তাকে বলে সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন, আমি যাই। শিমু গান গাইছে। আমি তার কাছ থেকেই কথাটা শুনলাম। সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া বাক্য হয় না। উল্লেখ্য যে, সমাপিকা ক্রিয়া কোন পৃথক শ্রেণীর

ক্রিয়া নয়। যে কোন ক্রিয়ারই সমাপিকা এবং অসমাপিকা– এই দুরকম রূপই হতে পারে। সব বিধেয় ক্রিয়াই সমাপিকা ক্রিয়া।

- **অসমাপিকা ক্রিয়া বা অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ :** যে ক্রিয়ারূপ বাক্যকে সম্পূর্ণতা দেয় না এবং বিধেয় বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু প্রকাশ করে না, তাকে বলে অসমাপিকা ক্রিয়া বা অসমাপিক ক্রিয়ারূপ। যেমন, কথাটা শুনে তিনি খুশি হলেন; 'আজ তোমাকে দেখতে এলেম'-(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর); 'টাকা মেরে পালাবি শেষে'?–(সুকুমার রায়)। এই সব বাক্যে দেখতে, শুনে, মেরে অসমাপিকা ক্রিয়া।

- **যৌগিক ক্রিয়া :** একটার বেশি ক্রিয়া নিয়ে তৈরি ক্রিয়াপদকে বলা হয় যৌগিক ক্রিয়া বা মিলিত ক্রিয়া। যেমন, খাইয়া ফেলিল→খেয়ে ফেলল, করিতে পারিবে→করতে পারবে; বসিয়া পড়িল→বসে পড়ল। যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি অসমাপিকা ও অন্যটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থই প্রাধান্য পায়। তাই তাকে বলে মুখ্যক্রিয়া। খাইয়া ফেলিল→খেয়ে ফেলল; বসিয়া পড়িল→বসে পড়ল। সমাপিকা ক্রিয়াটি মুখ্যক্রিয়াকে সাহায্য করে বা সহায়তা দেয়। এর নাম গৌণ ক্রিয়া বা সহকারী ক্রিয়া। করিতে পারিবে→করতে পারবে; বসিয়া পড়িল→বসে পড়ল। মুখ্যক্রিয়াটিতে 'ইতে', 'ইয়া'; কিংবা চলিত ভাষায় 'তে'; 'ইয়ে', 'য়ে' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। কালবাচক প্রত্যয় ও পুরুষবাচক বিভক্তি কেবলমাত্র গৌণক্রিয়াতেই যোগ হয়। দিতে **চেয়েছিল**।

  'ইতে' কিংবা 'তে'-অন্ত মুখ্যক্রিয়া বিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়াকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। (১) প্রারম্ভিকতাবোধক : খেতে লাগল; যেতে লাগল। (২) ইচ্ছাবোধক : দিতে চাই; বলতে চাইছে। (৩) অনুমতি বা অনুমোদনবোধক : বলতে দাও; গাইতে বলো। (৪) শক্যতাবোধক : করতে পারবে; হাঁটতে পারে না। (৫) সামর্থ্যবোধক বা অন্যনির্ভর সামর্থ্যবোধক : দেখতে পেলাম। (৬) নিরন্তরতাবোধক : বলতে থাকে ; দৌড়াতে থাকে।

  'ইয়া' বা 'এ'-অন্ত মুখ্যক্রিয়াবিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়াকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। (১) পূর্ণতাবোধক : খেয়ে ফেলল; করে বসল; গড়ে তুলেছে; ভেঙ্গে পড়েছে। (২) আরম্ভবোধক : কেঁদে উঠল; লেগে পড়ল। (৩) স্থায়িত্ব বা নিত্যতাবোধক : লেগে থাকল; জেগে থাকে; দাঁড়িয়ে রইল। (৪) নিরন্তবতাবোধক : বলে চলল। (৫) নিশ্চয়তাবোধক : দিয়ে এসো, ঘুমিয়ে নিল। (৬) অভ্যাসবোধক : গিয়ে থাকেন; নিয়ে আসে (৭) পরীক্ষাবোধক : চেয়ে দেখেন; বুঝে নিয়ো। ক্রিয়াদ্বন্দ্বও যৌগিক ক্রিয়ার একটি শ্রেণী। এখানে দুই কিংবা তারও বেশী সংখ্যক ক্রিয়া তাদের নিজের অর্থ বজায় রেখে একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন, যাওয়া আসা; বুঝে শুনে দেখা, হেঁটে চলে বেড়ানো।

- সংযোগমূলক ক্রিয়া : একাধিক পদ সমন্বিত ক্রিয়াপদের একটি বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ হলে, তাকে বলা হয় সংযোগমূলক ক্রিয়া। যেমন, লাফ দেয়া; জিজ্ঞাসা করা; নির্বাসিত করা; দৌড় লাগানো; দূরীভূত করা; হাত লাগানো; বহে চলে।

  উল্লেখ্য যে, যৌগিক ক্রিয়াও একাধিক পদের ক্রিয়া, কিন্তু এতে সবগুলিই ক্রিয়াপদ। সংযোজকমূলক ক্রিয়ার একটি পদ বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পদ কাকে বলে? কয় প্রকার? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পদ বলতে কী বোঝেন? পদ প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত?

২. বিশেষ্য কাকে বলে? বিশেষ্য কয় প্রকার ও কি কি ? উদাহরণ সহ পরিচয় দিন।

৩. বিশেষণ কাকে বলে? বিশেষণ কয় প্রকার ও কি কি ? উদ্দেশ্য বিশেষণ ও বিধেয় বিশেষণ বলতে কি বোঝেন?

৪. নাম বিশেষণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের একটি করে উদাহরণ দিন।

৫. বিশেষণের অতিশায়ন বলতে কি বোঝেন? কিরূপে তা সাধন করা হয়?

৬. অব্যয় কাকে বলে? অব্যয় কয় প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেক প্রকারের দুটি করে উদাহরণ দিন।

৭. উদাহরণসহ সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৮. কিরূপে অকর্মক ধাতুকে সকর্মক ধাতুতে পরিণত করা যায়। সমধাতুজ কর্ম কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৯. ক্রিয়ার পুরুষ বলতে কি বোঝেন? কয় প্রকার ও কি কি? পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপের কী পরিবর্তন হয় দেখান।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ২

সাধু ও চলিত ভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *সাধু ভাষা কি তা জানতে পারবেন*
- *চলিত ভাষা কি তা জানতে পারবেন*
- *সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য কি তা জানতে পারবেন*
- *সাধু ও চলিত ভাষা কেন গড়ে উঠেছে তা জানতে পারবেন*

আদিমাত্রায় তৎসম শব্দবহুল, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি-সমাস আশ্রয়ী। এ ভাষারীতিতে ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের দীর্ঘ রূপ ব্যবহৃত হয়। মূলত সাহিত্যের ভাষাকে আশ্রয় করেই সাধুরীতি গড়ে উঠেছিল।

বাংলার মানুষের মুখের ভাষার পাঁচটি প্রধান উপভাষা– রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। এ গুলির মধ্যে রাঢ়ী কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের হুগলি, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ-পরগণার শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষা; আর এই ভাষার উপর ভিত্তি করে যে বাংলা ভাষারীতি গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় চলিত ভাষা বা চলিত গদ্যরীতি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে। সাহিত্যের ভাষা উন্নত চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে বলে তা অপেক্ষাকৃত মার্জিত, পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। অন্যদিকে আমরা মুখের ভাষা দৈনন্দিন জীবনে পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করি বলে তা অপেক্ষাকৃত স্বতঃস্ফূর্ত ও জীবনস্পর্শী। লিখিত ও মুখের ভাষারূপের এ পার্থক্য সব ভাষাতেই রয়েছে। বাংলা ভাষাও এ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু বাংলা লিখিত ভাষায় এক সময় দুটি ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল। এ রীতি দুটি হলো: সাধুরীতি ও চলিতরীতি।

সাধুরীতি: আদিমাত্রায় তৎসম শব্দবহুল, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি-সমাস আশ্রয়ী। এ ভাষারীতিতে ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের দীর্ঘ রূপ ব্যবহৃত হয়। মূলত সাহিত্যের ভাষাকে আশ্রয় করেই সাধুরীতি গড়ে উঠেছিল।

চলিতরীতি: বাংলার মানুষের মুখের ভাষার পাঁচটি প্রধান উপভাষা– রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। এ গুলির মধ্যে রাঢ়ী কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের হুগলি, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ-পরগণার শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষা; আর এই ভাষার উপর ভিত্তি করে যে বাংলা ভাষারীতি (Standard Colloquial Bengoli=SCB) গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় চলিত ভাষা বা চলিত গদ্যরীতি।

চলিত ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিশুদ্ধ কিছু সংস্কৃত শব্দ আছে। কিন্তু এর মূল শব্দ হল সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আসা বিপুল তদ্ভব শব্দ ভাণ্ডার, আর এ দেশের আর্যপূর্ব জাতিদের ভাষা থেকে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত দেশী শব্দসমূহ। এ ভাষা শুধু সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ ভাষা বর্তমানে যেমন সাহিত্যের ভাষা তেমনি শিক্ষিত জনের মৌখিক ভাববিনিময়েরও মাধ্যম।

সাধু ও চলিত রূপের প্রতিষ্ঠা

খ্রিস্টান মিশনারি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়) লেখকেরা যখন বাংলায় ধর্মগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে উদ্যোগী হন, তখন তাঁদের সামনে সাহিত্যিক গদ্যের কোন আদর্শ ছিল না। তাঁরা সংস্কৃত গদ্যের আদর্শে বাংলা সাধু ভাষার মূল কাঠামোটি রচনা করেন। যাঁদের হাতে বাংলা সাধু গদ্যের প্রাথমিক রূপটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পর রামমোহন রায় সাধু গদ্যের আরো যুক্তিনির্ভর কাঠামো নির্মাণ করেন। রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধু ভাষা কথাটি তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থে" ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সাধু ভাষা বিকশিত হয়ে সৃজনশীল ও মননধর্মী সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের বর্ণনায় সাধু ভাষা ব্যবহার করলেও পাত্র-পাত্রীর সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের ধারাই অনুসরণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য, উইলিয়াম কেরীর কথোপকথোনের বিভিন্ন শ্রেণীর সংলাপে ব্যবহৃত গদ্য যদিও আদর্শ চলিত বাংলা ছিল না, তবুও এখানেই মৌখিক গদ্য সাহিত্যের প্রথম প্রবেশাধিকার বলে ধরে নেয়া হয়। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সংলাপ অংশে কিছু চলিত গদ্য ব্যবহার করেন। কলকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষাকে কিঞ্চিৎ সাধুভাষার মিশ্রণসহ সাহিত্যে প্রথম রূপ দেন প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) উপন্যাসে। কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষার ব্যবহার করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্য ভাষাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং এই ভাষাকে 'অপর ভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি এ ভাষাকে "প্রচলিত ভাষা" বলেছিলেন। সম্ভবত এই 'প্রচলিত ভাষা' থেকেই পরে 'চলিত ভাষা' কথাটির প্রচলন হয়। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করে চলিত গদ্যের পক্ষে ব্যাপক সাহিত্যিক আন্দোলন শুরু করেন। তখন রবীন্দ্রনাথও তাতে উৎসাহিত হয়ে পুরোপুরি চলিত গদ্য লেখা আরম্ভ করেন এবং এভাবে সাহিত্যে ক্রমে চলিত গদ্য একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পুরোপুরি চলিত ভাষার ব্যবহার করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) গ্রন্থে।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

- সাধারণত সাধু ভাষার শব্দভান্ডারে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ বেশি থাকে। কিন্তু চলিত ভাষায় তদ্ভব ও দেশী, বিদেশী শব্দের আধিক্য দেখা যায়।
- সাধু ভাষায় সর্বনামের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– তাহা, যাহা, যাহার, ইহা, তাহাদের, যাহাদের ইত্যাদি। চলিত ভাষায় সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– তা, যা, যাব, তাদের, এ, ও ইত্যাদি।
- সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা সাধু ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন– আসমুদ্র হিমাচল, কার্যকারণ শৃঙ্খলিত ইত্যাদি। চলতি ভাষায় সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কম। যেমন: সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত, কার্য ও কারণের দ্বারা শৃঙ্খলিত ইত্যাদি।
- সাধুভাষায় অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়ার দীর্ঘরূপ প্রচলিত। যেমন– করিয়া, করিতেছি, করিয়াছিলাম ইত্যাদি। চলতি ভাষায় ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– করে, করছি, করেছিলাম ইত্যাদি।
- বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত কতকগুলি অনুসর্গেরও সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন– সাধু ভাষা : দ্বারা, সহিত, হইতে, অভ্যন্তরে ইত্যাদি। চলিত ভাষা : দিয়ে, সঙ্গে, ভিতরে, ভেতরে বা মধ্যে ইত্যাদি।
- অন্য ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন (Proverbs) ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ (Idioms) চলিত ভাষায় সহজেই খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু সাধু ভাষায় সেগুলোর প্রয়োগ বিরল। যেমন– জোর যার মলুক তার, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, কলা দেখানো ইত্যাদি।
- সাধু ভাষার মধ্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই বিন্যাসক্রম সাধারণত ল–ঘন করা হয় না । কিন্তু চলিত ভাষার ক্ষেত্রে বাক্যে পদের বিন্যাসক্রম অনেক খানি নমনীয়। যেমন– বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে।
- যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধু ভাষায় বেশি। কিন্তু চলিত ভাষায় কিছুটা কম। যেমন– সাধু ভাষা: গমন করা, শয়ন করা, শ্রবণ করা ইত্যাদি। চলিত ভাষা: যাওয়া, শোওয়া, শোনা ইত্যাদি।

নিচে সাধুরীতি থেকে চলিত রীতিতে পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা দেয়া হল:

ক. **সাধু ভাষা:** এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বলিল, "পিতা আপনার সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে দিন।" তাহাতে তাহাদিগের পিতা নিজ সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

চলিত ভাষা: একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি বাবাকে বলল, "বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাব, তা আমাকে দিন।" তাতে তাদের বাবা নিজের সম্পত্তি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

খ. **সাধু ভাষা:** আমাদের ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এইটুকু কোন দিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে। পশ্চিম হইতে যাহা কিছু শিখিবার আছে, জাপান তাহা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ ছড়াইয়া দিল। ইহার প্রধান কারণ, সে শিক্ষাকে তাহারা দেশী ভাষার আধারে বাধাই করিতে পারিয়াছে।

চলিত ভাষা: আমাদের ভিরুতা কি চিরদিনই থেকে যাবে? ভরসা করে এটুকু কোন দিন বলতে পারব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করে নিতে হবে। পশ্চিম থেকে যা কিছু শেখবার আছে, জাপান তা দেখতে দেখতে দেশে ছড়িয়ে দিল। এর প্রধান কারণ, সে শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করতে পেরেছে।

গ. **সাধু ভাষা:** মানুষ কোন দিন উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে নাই, থাকিতে পারে না। উপাস্যের সন্ধানে ও নির্বাচনে তাহার ভুল হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ তৃষ্ণায় মানুষ চিরদিন মহত্তর শক্তির সম্মুখে দেহ ও মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া আসিতেছে।

চলিত ভাষা: মানুষ কোন দিন উপাসনা না করে থাকতে পারে নি, থাকতে পারে না। উপাস্যের সন্ধান ও বাছাইয়ে তার ভুল হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ তৃষ্ণায় মানুষ চিরদিন মহত্তর শক্তির সম্মুখে দেহ ও মাথা লুটিয়ে আসছে।

ঘ. **সাধু ভাষা:** প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য; অথচ সে দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষীকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কিনা, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরীভক্তি, পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কিনা এসব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

চলিত ভাষা: প্রয়োজনের দিক থেকে দেখলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য; অথচ সে দিক দিয়ে আলোচনা করতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষীকে বিদ্যা শেখালে তার চাষ করবার শক্তি কমে কিনা, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শেখালে তার হরীভক্তি, পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কিনা এ সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সাধু ও চলিত ভাষা বলতে কী বোঝেন? সাধু ও চলিত ভাষা কেন গড়ে উঠেছে? সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সাধু ও চলিত ভাষা বলতে কি বোঝেন?

২. সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, উল্লেখ করুন।

৩. বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত ভাষা কেন গড়ে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লিখুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *সন্ধি কি তা জানতে পারবেন।*
- *সন্ধির প্রকারভেদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।*
- *সন্ধির নিয়ম জানতে পারবেন।*
- *সন্ধি কিভাবে নির্ণয় করতে হয়, সে বিষয়ে ধারণা পাবেন।*

দ্রুত উচ্চারণের জন্য পরস্পর সন্নিহিত ধ্বনির পরিবর্তন হয়। এতে দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন কিংবা লোপ হতে পারে। এ ধরনের মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে।

দেব + আলয় = দেবালয়, উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস, অতঃ + এব = অতএব। উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্তী হলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তারা উভয়ে মিলে এক বর্ণ হয়, দুটি বর্ণের একটির রূপান্তরিত হয়, কিংবা একটির লোপ হয়, অথবা দুটির রূপান্তর হয়। এ আলোচনার আলোকে আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সন্ধির একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

দ্রুত উচ্চারণের জন্য পরস্পর সন্নিহিত ধ্বনির পরিবর্তন হয়। এতে দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন কিংবা লোপ হতে পারে। এ ধরনের মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে।

সন্ধির প্রকার ভেদ

সন্ধি দুই প্রকার : (১) স্বর সন্ধি ও (২) ব্যঞ্জন সন্ধি

সন্ধি দুই প্রকার : (১) স্বর সন্ধি ও (২) ব্যঞ্জন সন্ধি

১. স্বর সন্ধি : দুটি স্বর নিকটবর্তী হলে প্রায়ই তাদের মিলনে একটি স্বর উৎপন্ন হয়। একে স্বর সন্ধি বলে।

স্বর সন্ধির নিয়ম

- অ + অ = আ হয়। যেমনঃ বেদ + অন্ত = বেদান্ত, অপর + অপর = অপরাপর
- অ + আ = আ হয়। যেমনঃ দেব + আলয় = দেবালয়, জল + আশয় = জলাশয়
- আ + আ = আ হয়। যেমনঃ মহা + আশয় = মহাশয়, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।
- ই + ই = ঈ হয়। যেমনঃ অতি + ইত = অতীত, অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট
- ঈ + ঈ = ঈ হয় । যেমনঃ সতী + ঈশ = সতীশ, রজনী + ঈশ = রজনীশ।
- উ + উ = ঊ হয়। যেমনঃ কটু + উক্তি = কটূক্তি, গুরু + উপদেশ = গুরূপদেশ।
- ঊ + ঊ = ঊ হয় । যেমনঃ ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।
- ঊ + উ = ঊ হয়। যেমনঃ বধূ + উক্তি = বধূক্তি।
- অ + ই, ঈ = এ হয়। যেমনঃ দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র, পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর।
- আ + ই, ঈ =এ হয়। যেমনঃ যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, রমা + ঈশ = রমেশ।
- অ + উ, ঊ = ও হয়। যেমনঃ পর + উপকার =পরোপকার, এক + ঊনবিংশতি = একোনবিংশতি।
- অ + ঋ = অর্ হয়। যেমনঃ রাজ + ঋষি = রাজর্ষি, দেব + ঋষি = দেবর্ষি।
- অ + এ, ঐ =ঐ হয়। যেমনঃ জন + এক = জনৈক, মত + ঐক্য = মতৈক্য ।
- অ + ও, ঔ = ঔ হয়। যেমনঃ জল + ওকা = জলৌকা, দিব্য + ঔষধ = দিব্যৌষধ।
- আ+ও, ঔ=ঔ হয়। যেমনঃ মহা+ঔষধ = মহৌষধ।
- ই + ই ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ =য। যেমনঃ প্রতি + এক = প্রত্যেক, প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন।

- উ অথবা ঊ + উ বা ঊ ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ = ব (অন্তস্থ)। যেমনঃ অনু + এষণ = অন্বেষণ, সু + আগত = স্বাগত।

২. ব্যঞ্জন সন্ধি : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনের ফলে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। উল্লেখ্য যে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন-সন্ধির অন্তর্গত।

ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়ম

- 'ত' অথবা 'দ'-এর পর 'চ' থাকলে ত, দ-এর স্থানে 'চ' হয়। যেমনঃ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ, উৎ + চারণ = উচ্চারণ।
- 'দ'-এর পর ক, ত, প, ত, স থাকলে 'দ' এর স্থানে খন্ডত (ৎ) হয়। যেমনঃ তদ্ + সম = তৎসম, হৃদ + পিন্ড = হৃৎপিন্ড, উদ্ + ফুল্ল = উৎফুল্ল।
- দ + ধ +(নাসিক্য বর্ণ) ন, ম থাকলে দ, ধ স্থানে 'ন' হয়। যেমনঃ তদ্ + ময় = তন্ময়, উদ্ + নয়ন = উন্নয়ন।
- 'ত' অথবা 'দ' এর পর জ থাকলে 'ত', 'দ'-এর স্থানে 'জ' হয়। যেমনঃ বিপদ + জনক = বিপজ্জনক, যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন।
- ত্, দ-এর পর 'শ' থাকলে দ-এর স্থানে চ এবং শ-এর স্থানে 'ছ' হয়। যেমনঃ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস, চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি, উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল।
- 'ড' পরে থাকলে পূর্বস্থিত 'ত' ও 'দ' স্থানে 'ড' হয়। যেমনঃ উদ + ডীন = উড্ডীন, উৎ + ডয়ন = উড্ডয়ন।
- 'ত' ও 'দ'-এর পর 'ল' থাকলে 'ত' 'দ'-এর স্থানে ল হয় । যেমনঃ উৎ + লাস = উল্লাস, উৎ + লেখ = উল্লেখ।
- 'ম'-এর পর ক, খ, গ, ঘ, চ, ল থাকলে 'ম'-এর স্থানে অনুস্বার হয়। যেমনঃ সম্ + শয় = সংশয়, সম্ + কলন = সংকলন, সম্ + গীত = সংগীত, সম্ + যোগ = সংযোগ, বরম+চ = বরংচ।
- 'দ'-এর পরে 'হ' থাকলে 'হ' এর স্থানে 'ধ' হয়। যেমনঃ উদ্ + হত = উদ্ধৃত, তদ্ + হিত = তদ্ধিত।

বিসর্গ সন্ধি

- বিসর্গের পর 'ত' থাকলে বিসর্গের স্থানে 'স' হয়। যেমনঃ নিঃ + তার = নিস্তার, অধঃ + তন = অধস্তন।
- বিসর্গের পর 'চ' অথবা 'ছ' থাকলে বিসর্গের স্থানে 'শ' হয়। যেমনঃ দুঃ+চরিত্র = দুশ্চরিত্র, দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা, নিঃ + চিন্তা = নিশ্চিন্ত।
- বিসর্গের পর ট অথবা ঠ থাকলে বিসর্গের স্থানে মূর্ধন্য -ষ হয়। যেমনঃ ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ +ঠুর = নিষ্ঠুর।
- স্বরবর্ণ পরে থাকলে যে কোন স্বর পরবর্তী 'র' জাত বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। এই 'র' পরবর্তি স্বরে যুক্ত হয় অথবা রেফ (´) রূপে পরবর্তি ব্যঞ্জনের উপরে বসে। যেমন, অহঃ + অহ = অহরহ, প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ, অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত, নিঃ + ঝর = নির্ঝর।
- স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্, পরে থাকলে 'অ' কারের পরের 'র' জাত স্থানে 'র' হয়। এই 'র' পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয় অথবা রেফ (´) রূপে পরবর্তি ব্যঞ্জনের উপরে বসে। যেমনঃ পুনঃ + অধিকার = পুনরাধিকার, বহিঃ + আগমন = বহিরাগমন, অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা, পুনঃ + আয় = পুনরায়, পুনঃ + বার = পুনর্বার, প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব, বহিঃ + গমন = বহির্গমন।

- বিসর্গের পর 'র' থাকলে বিসর্গস্থানীয় 'র' লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, নিঃ + রস = নীরস, চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ, নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রোগ = নীরোগ।
- বিসর্গের পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গের স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন, বহিঃ + কার = বহিষ্কার, চতুঃ + কোন = চতুষ্কোন, আবিঃ + কার = আবিষ্কার, নিঃ + ফল = নিষ্ফল।
- বিসর্গের পর ক,খ, প, ফ, শ, স থাকলে অনেক সময় বিসর্গের পরিবর্তন হয় না । যেমন, দুঃ + সাধ্য = দুঃসাধ্য, প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ, মনঃ + পীড়া = মনঃপীড়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সন্ধি কাকে বলে? কয় প্রকার? উদাহরণসহ লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সন্ধি কাকে বলে? কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের তিনটি করে উদাহরণ দিন।
২. বিসর্গ সন্ধি কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
৩. স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? পাঁচটি করে উদাহরণ দিন।
৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন: সোনালী, নরাধম, পবন, নীরোগ, সঞ্চয়, উচ্ছ্বাস, তজ্জন্য, সম্পূর্ণ, পরিষ্কার, নিশ্বাস, শিরচ্ছেদ, আশীর্বাদ, নীরস, তস্কর, পুরোহিত, অতএব, মনীষা, পুনর্বার।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৪

সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।*
- *সমাস কত প্রকার ও কি কি তা জানতে পারবেন।*
- *বিভিন্ন সমাসের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, সে-বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।*

ধাতু ও প্রত্যয় যোগে শব্দ হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ তৈরি হয় সমাসের মাধ্যমে। যেমন: পিতা ও মাতা= পিতা-মাতা; নীল যে আকাশ= নীলাকাশ; মাল বহনের গাড়ি= মালগাড়ি। এ সবই সমাসের উদাহরণ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।

পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।

মনে রাখবেন

- যে যে শব্দ একত্র হয়ে সমাস তৈরি করে তাদের বলা হয় সমস্যমান পদ। যেমন: চন্দ্রবদন -এর অর্থ এমন কেউ যার মুখ (বদন) চন্দ্রের মত (সুন্দর)। এর মধ্যে আছে দুটি সমস্যমান পদ– 'চন্দ্র' এবং 'বদন'।
- একত্রিত অবস্থায় বড় শব্দটির নাম সমস্তপদ। যেমন, গোপীজনবল্লভ–এই সমস্তপদটির সমস্যমান পদ তিনটি– গোপী, জন, বল্লভ।

  শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা এবার সমস্তপদটির অর্থ করার জন্য সমস্যমান পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে একটু নজর দিই।
- সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য। যেমন: 'বীণাপাণি'– এই সমস্ত পদটির অর্থ 'বীণাপাণিতে (হাতে) যার' এবং এটিই ব্যাসবাক্য। ঠিক তেমনি পুণ্যভূমি – যে ভূমি পুণ্য; রাজাপ্রজা= রাজা এবং প্রজা।
- সমস্তপদের প্রথম পদটিকে বলা হয় পূর্বপদ এবং পরেরটি উত্তরপদ। বীণাপাণি– এই সমাসের পূর্বপদ 'বীণা' ও উত্তরপদ 'পাণি'।
- দুয়ের অধিক সমস্যমান পদ থাকলে প্রথম পদকে পূর্বপদ শেষ পদকে উত্তরপদ এবং মধ্যের পদগুলোকে মধ্যপদ বলে।

  সমাসে সমস্যমান পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়। বাংলায় বহু স্থলেই বিভক্তির চিহ্ন থাকে না, পূর্বপদে বিভক্তি থাকলে বা অনুসর্গ থাকলে সমস্তপদে তা লোপ পায়।

  বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা শব্দ ছাড়াও বহু সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি শব্দের প্রচলন রয়েছে। এক সময় বিভিন্ন শব্দের একত্র ব্যবহার সমর্থন করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে শ্রুতিকটু না হলে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের মিশ্রণের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে না। সংস্কৃত -সংস্কৃত, সংস্কৃত-বাংলা, বাংলা-বাংলা, বাংলা-বিদেশী এবং বিদেশী-বিদেশী, শব্দের মিলনে সমাস হয়। তবে সমাস করার সময় যে কোন দুই বা ততোদিক পদকে এক পদে পরিণত করলেই সমাস হয় না। পদগুলোর পরস্পরের মধ্যে অন্বয় বা সম্পর্ক থাকতে হবে এবং পদগুলোকে একত্রে একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করতে হবে।

সমাসের শ্রেণী বিভাগ

বাংলায় সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা: ১. দ্বন্দ্ব ২. অব্যয়ীভাব ৩. তৎপুরুষ ৪. বহুব্রীহি ৫. কর্মধারয় ও ৬. দ্বিগু।

বাংলায় সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা– (১) দ্বন্দ্ব (২) অব্যয়ীভাব (৩) তৎপুরুষ (৪) বহুব্রীহি (৫) কর্মধারয় ও (৬) দ্বিগু।

কোন কোন বৈয়াকরণবিদ সমাসের পূর্বপদ ও উত্তরপদের অর্থের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সমাস গঠনে কখনও উভয় পদের অর্থ প্রধান হয়, কখনও পূর্বপদের অর্থ প্রধান হয়, কখনও পরপদের অর্থ প্রধান হয়। আবার কখনও বা উভয় পদবহির্ভূত ভিন্ন অর্থ প্রধান হয়ে থাকে। যেমন:

ক) উভয় পদের অর্থ প্রধান : দ্বন্দ্ব সমাস

খ) পূর্বপদের অর্থ প্রধান : অব্যয়ীভাব সমাস

গ) পর পদের অর্থ প্রধান : তৎপুরুষ সমাস, কর্মধারয় সমাস, দ্বিগু সমাস।

ঘ) উভয় পদ বহির্ভূত অর্থ প্রধান : বহুব্রীহি সমাস।

কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান বলে তাদের তৎপুরুষ সমাসের দলভুক্ত করা যেতে পারে। তবে বাংলা ব্যাকরণে সমাসকে দ্বন্দ্ব, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, কর্মধারয় ও দ্বিগু -এই ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তা ছাড়া এই ছয় প্রকার সমাসের আরও কতিপয় উপ-বিভাগ রয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাস

'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ 'জোড়া'। যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির প্রতিটির অর্থই সমান প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। 'ও', 'এবং', 'আর', 'তথা' প্রভৃতি সংযোগার্থক অব্যয়ের সাহায্যে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাস অর্থাৎ, বিভাগ করতে হয়। যে পদটি বানানে বা উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত ছোট, এই সমাসে সাধারণত সেটি প্রথমে বসে। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। যে পদটির অর্থ অপেক্ষাকৃত গৌরব-বোধক বলে বিবেচিত হয়, সে পদটি অন্যটি অপেক্ষা বড় হলেও প্রথমে বসতে পারে।

দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ

মা ও বাপ = মা-বাপ, হাত ও মুখ = হাতমুখ, শমিকে আর শিমুকে =শমিশিমুকে, স্ত্রীর পুত্রের এবং কন্যার = স্ত্রীপুত্রকন্যার।

যে সমাসে সমান বিভক্তিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে এক পদে পরিণত হয় এবং সমস্যমান প্রত্যেকটি পদের অর্থ সমভাবে প্রধান থেকে যায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা এবার দ্বন্দ্ব সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা : যে সমাসে সমান বিভক্তিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে এক পদে পরিণত হয় এবং সমস্যমান প্রত্যেকটি পদের অর্থ সমভাবে প্রধান থেকে যায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

এবার আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্বন্দ্ব সমাসের গঠন নিয়ে আমরা আলোচনা করি। বিশেষ্যে-বিশেষ্যে, বিশেষণে–বিশেষণে, সর্বনামে-সর্বনামে, ক্রিয়ায়-ক্রিয়ায় এবং ক্রিয়াবিশেষণে-ক্রিয়াবিশেষণে সাধারণত দ্বন্দ্ব সমাস হয়ে থাকে। নিচে এগুলোর উদাহরণ দেয়া হলো:

- বিশেষ্যে- বিশেষ্যে: মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা, দিবা ও রাত্রি= দিবারাত্রি।
- বিশেষণে-বিশেষণে : ভাল ও মন্দ= ভালমন্দ, ছোট ও বড় = ছোটবড়।
- সর্বনামে-সর্বনামে : যে ও সে = যে-সে, যা ও তা = যা-তা।
- ক্রিয়ায়-ক্রিয়ায় : দেয়া ও নেয়া = দেয়া-নেয়া, চলা ও ফেরা = চলা-ফেরা।
- ক্রিয়াবিশেষণে-ক্রিয়াবিশেষণে: ছলে ও বলে = ছলে-বলে, কলে ও কৌশলে = কলেকৌশলে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা এবার দ্বন্দ্ব সমাসের শব্দ বিষয়ে আলোচনা করি।

- দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণত অল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দ পূর্বে বসে। যেমন: কীট ও পতঙ্গ = কীটপতঙ্গ, ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে।

- সমান স্বরবিশিষ্ট দুটি শব্দের মধ্যে স্বরাদি শব্দ পূর্বে বসে। যেমনঃ আম ও জাম =আম-জাম, আপদ ও বিপদ = আপদ-বিপদ।
- দুটি সমান স্বরবিশিষ্ট আ-কারান্ত শব্দ পূর্বে বসে। যেমনঃ রাজা ও রানী = রাজা-রানী, মশা ও মাছি = মশা-মাছি।
- দুটি সমান স্বরবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে উ-কার বা ও-কার যুক্ত শব্দ পরে বসে। যেমনঃ নাক ও মুখ = নাক-মুখ, মণি ও মুক্তা = মণি-মুক্তা, হাতি ও ঘোড়া = হাতি-ঘোড়া, ভাই ও বোন = ভাই-বোন।
- দুটি সমান স্বরবিশিষ্ট ও-কার যুক্ত ও উ-কার যুক্ত শব্দের মধ্যে উ-কার যুক্ত শব্দ পরে বসে। যেমনঃ চোখ ও মুখ = চোখ-মুখ, সোনা ও রূপা = সোনা-রূপা।
- দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণত সম্মানসূচক শব্দ পূর্বে বসে। যেমনঃ রাজা ও প্রজা = রাজা-প্রজা, স্বামী ও স্ত্রী = স্বামী-স্ত্রী।
- অ-কারান্ত, হসন্ত ও সন্ধিস্বরযুক্ত শব্দ পূর্বে বসে। যেমনঃ নদ ও নদী = নদ-নদী, দাস ও দাসী = দাস-দাসী, সুখ ও দুঃখ = সুখ-দুঃখ।
- দ্বন্দ্ব সমাসে নিম্নলিখিত স্থলে সিদ্ধ হয়। যেমনঃ অহন ও রাত্রি = অহোরাত্রি, অহন ও নিশি = অহর্নিশি।

দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকারভেদ

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকার হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

- **সাধারণত দ্বন্দ্ব :** দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হলে তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব বলে। যেমনঃ ফল ও মূল = ফলমূল, আনা ও গোনা = আনাগোনা।
- **অলুক দ্বন্দ্ব :** বাংলা বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বন্দ্ব প্রচুর। সমস্ত পদে পদগুলোর বিভক্তি লোপ না হলে তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমনঃ আগে ও পাছে= আগে-পাছে, দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে, পথে ও ঘাটে = পথে-ঘাটে।
- **'ইত্যাদি' অর্থে দ্বন্দ্ব :** সহচর-শব্দের সাথে সমাস-দ্বারা 'অনুরূপ বস্তু' এইভাব-প্রকাশের জন্য এক প্রকারের দ্বন্দ্ব-সমাস বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমনঃ লোক ও জন = লোকজন, কাজ ও কর্ম = কাজকর্ম, মাথা ও মুন্ডু = মাথা-মুন্ডু।
- **একশেষ দ্বন্দ্ব :** আমরা, তোমরা ইত্যাদি সর্বনামকে বলা হয় এক শেষ দ্বন্দ্ব। এ সব শব্দের মধ্যে একাধিক সর্বনাম মিশে আছে ও তাদের প্রতিটিই প্রধান। যেমনঃ আমরা বলতে বোঝায় – (ক) আমি এবং তুমি; (খ) আমি, তুমি এবং সে; (গ) আমি এবং তোমরা; (ঘ) আমি, তোমরা এবং তারা; (ঙ) আমি, তুমি এবং তারা।
- **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব :** কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের মিলন বোঝালে তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমনঃ ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে, মা ও বাপ = মা-বাপ, ভাই ও বোন = ভাই-বোন।
- **সমার্থক দ্বন্দ্ব :** প্রায় একই রকম অর্থবোধক পদের মিলন বোঝালে তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমনঃ ঘর ও বাড়ি = ঘর-বাড়ি, ধন ও সম্পদ = ধন-সম্পদ, হাট ও বাজার = হাট-বাজার।
- **বহুপদী দ্বন্দ্ব :** দুয়ের অধিক পদের মিলন হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব বলে। যেমনঃ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ = রূপ- রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ, ইট, কাঠ ও পাথর = ইট-কাঠ-পাথর; স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল = স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল।
- **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব :** বিপরীত অর্থবোধক পদের মিলন বোঝালে তাকে বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমনঃ আয় ও ব্যয় = আয়-ব্যয়; সুখ ও দুঃখ = সুখ-দুঃখ, জমা ও খরচ = জমা-খরচ, ছোট ও বড় = ছোট-বড়।

অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদের পূর্বপদ অব্যয় হয় এবং সমস্তপদে পূর্বপদের অর্থ প্রধান ভূমিকা পালন করে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অব্যয় পদ পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যাতে অব্যয়ের অর্থ প্রধান ভূমিকা পালন করে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমনঃ কূলের সমীপে = উপকূল, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ, বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন। উপকূল, ক্ষণে ক্ষণে, নির্বিঘ্ন এই তিনটি সমস্ত পদে অব্যয়ের সাথে সমাস হয়েছে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবার অব্যয়ীভাব সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

যে সমাসে সমস্যমান পদের পূর্বপদ অব্যয় হয় এবং সমস্তপদে পূর্বপদের অর্থ প্রধান ভূমিকা পালন করে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

মনে রাখবেন

- সামীপ্য, পৌন্যঃপুন্য (বীপ্সা), অভাব, পশ্চাৎ, অনতিক্রম, পর্যন্ত, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যেমনঃ কূলের সমীপে = উপকূল, দিনে দিনে = প্রতিদিন, ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ, পদের পশ্চাৎ = অনুপদ, ক্রমকে অতিক্রম না করিয়া = যথাক্রম, মরণ পর্যন্ত = আমরণ, বনের সাদৃশ্য = উপবন, রূপের যোগ্য = অনুরূপ।

অব্যয়ীভাব সমাসে অনেক সময় পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পায় এবং 'অক্ষি' স্থানে 'অক্ষ' হয়। যেমনঃ অক্ষির সমীপে = সমক্ষ, অক্ষির অভিমুখ = প্রত্যক্ষ, অক্ষির আগোচর = পরোক্ষ।

অব্যয়-যুক্ত বহু সমাসসিদ্ধ পদ বাংলায় নাম-পদ-রূপে পরিণত হয়েছে। যেমনঃ উপদ্বীপ, দুর্ভিক্ষ, নির্বিঘ্ন, নিরামিষ, প্রত্যক্ষ ইত্যাদি।

প্রাদি সমাস

প্রাদি সমাস মূলত অব্যয়ীভাব সমাসের বৈচিত্র্য।

প্রাদি সমাস মূলত অব্যয়ীভাব সমাসের বৈচিত্র্য। গঠনের দিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা দেখি যে, অব্যয়ীভাবের মতোই প্রথমে উপসর্গ এবং অব্যয়ের সাথে নামপদ সংযুক্ত হয়ে প্রাদি সমাস হয়। পার্থক্য কেবল উপসর্গের বিশেষ ধরনের প্রাদি সমাসে সাধারণত প্র, পরা, অনু ইত্যাদি উপসর্গ পূর্বপদে বসে কৃদন্ত (কৃৎ প্রত্যয় সাধিত) বিশেষ্যের সমান হয়। যেমনঃ প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, প্র (প্রকৃষ্ট) রূপে ভাত = প্রভাত, পরি (চতুর্দিকে) ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনু(পশ্চাৎ) তাপ = অনুতাপ, দুঃ (মন্দ) দিন = দুর্দিন, অভি (সম্মুখ) মুখ = অভিমুখ।

তৎপুরুষ সমাস

'তৎপুরুষ' শব্দের অর্থ 'তাহার সম্পর্কীয় পুরুষ'– এই সমস্ত পদটিকে অনুরূপ সমস্তপদের প্রতীক বা নামস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃতে কর্তৃকারক ব্যতীত পাঁচটি কারক এবং 'সম্বন্ধ পদ' আছে। এই ছয়টির জন্য এক-এক শ্রেণীর বিভক্তি নির্দিষ্ট আছে। সে-অনুসারে সংস্কৃতে তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ, তৃতীয়া-তৎপুরুষ, চতুর্থী-তৎপুরুষ, পঞ্চমী-তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী-তৎপুরুষ– এই ছয়টি উপশ্রেণীতে পড়ে। বাংলায় অতিরিক্ত 'প্রথমা তৎপুরুষ'ও ধরা হয়ে থাকে। তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের অর্থই প্রধান হয়; আর পূর্বপদের সঙ্গে তার কারক সম্পর্কের তুল্য সম্পর্ক থাকে। যেমনঃ

কালকে প্রাপ্ত = কালপ্রাপ্ত
বজ্রদ্বারা আহত = বজ্রাহত
প্রজার জন্য হিত = প্রজাহিত
বৃক্ষ হইতে পতিত = বৃক্ষপতিত
ফুলের বাগান = ফুলবাগান
হস্তের স্থিত = হস্তস্থিত

উপরে উল্লিখিত সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির লোপ হয়ে উত্তর পদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝাচ্ছে। তাহলে এবার আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তৎপুরুষ সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: যে সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তির লোপ হয়ে উত্তর পদের অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদ

তৎপুরুষ সমাস প্রধানত নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের হয়ে থাকে: (ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস, (খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস, (গ) চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস (ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস (ঙ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস এবং (চ) সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।

যে সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তির লোপ হয়ে উত্তর পদের অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

ক. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: ভয়কে প্রাপ্ত = ভয় প্রাপ্ত, মাকে হারা = মাহারা, বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন। ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: ক্ষণ কাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী।
ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে কৃদন্ত পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যেমন: ধীরভাবে গামী = ধীরগামী, নিমভাবে রাজি = নিমরাজি।

খ. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: কষ্ট দ্বারা সাধ্য=কষ্টসাধ্য, মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা, মন দিয়ে গড়া= মনগড়া, পদ দ্বারা দলিত= পদদলিত।

গ. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন, গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণকে দেয় = ব্রাহ্মণদেয়।
'নিমিত্ত' 'জন্য' 'তরে' প্রভৃতি নিমিত্তার্থক অনুসর্গের লোপেও চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: বিয়ের নিমিত্তে পাগলা = বিয়ে-পাগলা, মেয়েদের জন্য স্কুল = মেয়ে-স্কুল, হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা = হজ্বযাত্রা, ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল, বিদ্যার উদ্দেশ্যে আলয় = বিদ্যালয়।

ঘ. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত, সর্ব হতে শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হতে চ্যুত= স্বর্গচ্যুত।

ঙ. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের ষষ্ঠীবিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: নদীর জল = নদীজল, ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত, ফুলের গাছ = ফুলগাছ, মাতার তুল্য = মাতৃতুল্য।

মনে রাখবেন

- সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের ঈ-কারান্ত (ইন প্রত্যয়ান্ত) পুংলিঙ্গ ই-কারান্ত হয় এবং তা-ভাগান্ত (তৃ-প্রত্যয়ান্ত) থাকলে, তৃ-ভাগান্ত শব্দ হয়। যেমন: পক্ষীর শাবক = পক্ষিশাবক, মাতার ধন = মাতৃধন, জ্ঞানীর বৃন্দ = জ্ঞানীবৃন্দ, স্বামীর গৃহ = স্বামিগৃহ, পিতার গৃহ = পিতৃগৃহ। অবশ্য কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে বাংলা ভাষায় এই নিয়ম সব স্থানে মানার প্রয়োজন নেই।
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজা স্থলে রাজ এবং পরপদে সখা স্থলে সখ হয়। যেমন: রাজার রানী = রাজরানী, রাজার সখা = রাজসখা, রাজার বাড়ি = রাজবাড়ি।
- বাংলা সমাসে পূর্বপদের ঘোড়া স্থানে ঘোড় হয়। যেমন, ঘোড়ার সওয়ার = ঘোড়সওয়ার, ঘোড়ার দৌড় = ঘোড়দৌড়।

- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পিতা, মাতা ও ভ্রাতা স্থানে যথাক্রমে পিতৃ, মাতৃ ও ভ্রাতৃ হয়। যেমনঃ মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ, পিতার ধন = পিতৃধন।
- তৎপুরুষ সমাসের উত্তরপদ সহ, সম, তুল্য, প্রায়, প্রতিম, নিভ শব্দ হলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমনঃ মাতার তুল্য = মাতৃতুল্য, চন্দ্রের নিভ = চন্দ্রনিভ, সহোদরের প্রতিম = সহোদর প্রতিম, ভ্রাতার সহ = ভ্রাতাসহ, মৃত্যের প্রায় = মৃতপ্রায়।
- পরপদে ডিম্ব, অন্ড, শাবক, শিশু, দুগ্ধ প্রভৃতির সাথে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমনঃ মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, হরিণীর শাবক = হরিণশাবক, হংসীর ডিম্ব = হংসডিম্ব।
- গ্রাম, মহল, রাজি, বৃন্দ, যূথ, গণ প্রভৃতি সমষ্ঠিবাচক শব্দ উত্তরপদ হলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমনঃ গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, মহিলাদের মহল = মহিলামহল, বৃক্ষের রাজি = বৃক্ষরাজি, ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, হস্তীর যূথ = হস্তিযূথ, শিক্ষকের মন্ডলী = শিক্ষকমন্ডলী।
- নিপাতনে সিদ্ধ : 'নিপাতন' শব্দের অর্থ ব্যাকরণের নিয়মের বহির্ভুত। সে- হিসেবে নিয়মের বাইরে কিন্তু প্রচলিত এমন তৎপুরুষ সমাসকে এভাবে উল্লেখ করা হয়। যেমনঃ ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র।
- কালবাচক পদের সাথে কালের কোন অংশ বিশেষের সমাস হলে সমস্ত পদে উত্তর পদের পূর্বনিপাত হয়। যেমনঃ রাত্রির পূর্বভাগ = পূর্বরাত্র, অহ্নের (দিনের) মধ্যভাগ = মধ্যাহ্ন, অহ্নের অপর ভাগ = অপরাহ্ণ। 'অর্ধ' বলতে 'অর্ধাংশ' বোঝালে উত্তরপদের পূর্বনিপাত হয়। যেমনঃ চন্দ্রের অর্ধ = অর্ধচন্দ্র, পথের অর্ধ = অর্ধপথ।

চ. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্ব পদের সপ্তমী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমনঃ গাছে পাকা = গাছপাকা, রাতে কানা = রাতকানা, রণে পটু = রণপটু।

কখনও কখনও সহজ করার জন্য সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর মধ্যে' অনুসর্গের প্রয়োগ হয়। যেমনঃ বিশ্বের মধ্যে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত, কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ, বনের মধ্যে বাস = বনবাস।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে তৎসম শব্দের পূর্বপদটির নিপাত হলে তাকে সুপ্‌সুপা সমাস বলে। এ সমাস তাই সপ্তমী তৎপুরুষের বৈচিত্র্য।

সুপ্‌সুপা সমাস

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে তৎসম শব্দের পূর্বপদটির নিপাত হলে তাকে সুপ্‌সুপা সমাস বলে। এ সমাস তাই সপ্তমী তৎপুরুষের বৈচিত্র্য। যেমনঃ পূর্বে অজ্ঞাত = অজ্ঞাতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব।

যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

অলুক তৎপুরুষ সমাস

যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমনঃ গায়ে পড়া = গায়ে-পড়া, হাতে বুনা = হাতেবুনা, কলের পানি = কলের-পানি।

যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদের ন, না, নয়, নেই (নঞ্) অর্থবাচক অব্যয় থাকে তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে।

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস

যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদের ন, না, নয়, নেই (নঞ্) অর্থবাচক অব্যয় থাকে তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমনঃ নয় ধর্ম = অধর্ম, নয় শিক্ষিত = অশিক্ষিত, নয় ইচ্ছা = অনিচ্ছা। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে পরপদের প্রথমে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে অ এবং স্বরবর্ণ থাকলে অন্ হয়। যেমন, অন্যায়, অনাচার, অধর্ম ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত পদের পূর্বে উপসর্গ বসে এবং অন্য শব্দও বসে। উপসর্গ ভিন্ন শব্দকে উপপদ বলে। এ ধরনের উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ বলে। যেমন: ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা, বর্ণচুরি করে যে = বর্ণচোরা, বাস্তু হারিয়েছে যারা = বস্তুহারা, ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে যে/যা = ভুঁইফোঁড়া। এ সমাসে সাধারণত পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদ ক্রিয়া হয়। সে হিসেবে বলা যায়; বিশেষ্য + ক্রিয়া = উপপদ তৎপুরুষ।

দ্বিগু সমাস

ব্যাখ্যামূলক বা আশ্রয়মূলক সমাসে, যেখানে প্রথম পদ সংখ্যা বাচক হয়, এবং সমস্ত পদটির দ্বারা সংযোগ বা সমষ্টি বোঝায়, সেখানে একে দ্বিগু বলে। সংস্কৃতে 'দুই গো বা গোরুর সমষ্টি', অর্থে দ্বিগু শব্দের ব্যবহার হয় । সেখান থেকে এ ধরনের সমাসের নামকরণ করা হয়েছে। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে যে কর্মধারয় সমাস তদ্ধিতের অর্থ বা সমাহার বোঝায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: দ্বিগো দ্বারা ক্রীত = দ্বিগু। এখানে ক্রীত তদ্ধিতের অর্থ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা দ্বিগু সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: যে সমাসে সমাহার অর্থাৎ সমষ্টি অর্থে সংখ্যাবাচক পূর্বপদের সাথে উত্তরপদের সমাস হয় এবং উত্তর পদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

যে সমাসে সমাহার অর্থাৎ সমষ্টি অর্থে সংখ্যাবাচক পূর্বপদের সাথে উত্তরপদের সমাস হয় এবং উত্তর পদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

দ্বিগু সমাসের উদাহরণ : চৌ (চার) মাথার সমাহার = চৌমাথা, নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন, সপ্ত অহের (দিনের) সমাহার = সপ্তাহ। দ্বিগু সমাসে কোন কোন অ-কারান্ত উত্তর পদ ঈ-কারান্ত হয়। যেমন: শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, ত্রি লোকের সমাহার = ত্রিলোকী, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, ত্রিফলা শব্দ আ-কারান্ত হয়।

কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাসে উত্তরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এবং পূর্বপদ উত্তরপদের বিশেষণ স্থানীয় হয়ে থাকে। যেমন: 'কালোপ্যাঁচা' এই সমাসবদ্ধ পদটির অর্থ 'যে প্যাঁচা কালো'। অর্থাৎ 'কাল প্যাঁচা' এক ধরনের 'প্যাঁচা'। 'প্যাঁচা' এখানে উত্তর পদ। পূর্বপদ 'কাল' বা 'কালো' প্যাঁচাকেই বিশেষিত করছে বা গুণ বিষয়ে কিছু জানাচ্ছে। সেজন্য 'কালপ্যাঁচা' কর্মধারয় সমাস।

কর্মধারয় সমাসে প্রথম পদটি দ্বিতীয়পদের বিশেষণ-রূপে অবস্থান করে এবং দ্বিতীয়পদের অর্থই ঠিক থাকে। 'কর্মধারয়' শব্দের অর্থ 'কর্ম বা বৃত্তি-ধারণকারী'। 'বিশেষণ ও বিশেষ্যে' 'বিশেষ্য ও বিশেষণ', 'বিশেষণ ও বিশেষণ', বিশেষ্য ও বিশেষ্য – সব ধরনের শব্দযোগে কর্মধারয় সমাস হয়।
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন এবার আমরা উপরের আলোচনার আলোকে কর্মধারয় সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: যদি পূর্বপদ বিশেষণের মত বা বিশেষণ হয় ও পরের পদ বিশেষ্যর মত বা বিশেষ্য হয় এবং এই দুই পদের মিলনে একটি পদ হয়েও যদি পরের পদের অর্থ প্রধাণরূপে অবস্থান করে তাহলে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যদি পূর্বপদ বিশেষণের মত বা বিশেষণ হয় ও পরের পদ বিশেষ্যর মত বা বিশেষ্য হয় এবং এই দুই পদের মিলনে একটি পদ হয়েও যদি পরের পদের অর্থ প্রধানরূপে অবস্থান করে তাহলে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

এবার আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি।

- কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদে মহৎ বা মহান শব্দ স্থানে মহা এবং পরপদে রাজা স্থানে রাজ হয়। যেমন: মহৎ যে জন = মহাজন, মহান যে রাজা = মহারাজা।
- কর্মধারয় সমাসে সখা স্থানে 'সখ' হয়। যেমন: প্রিয় যে সখা = প্রিয়সখ।

- কর্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পদ সাধারণত পংলিঙ্গের আকার ধারণ করে। যেমনঃ মহতী যে নদী = মহানদী, সাধ্বী যে রমণী = সাধুরমণী।
- কর্মধারয় সমাসে অনেক সময় সুন্দর স্থানে 'সু' এবং কুৎসিত স্থানে 'কু', 'কা' কিংবা 'কদ' হয়। যেমনঃ সুন্দর যে পুরুষ = সুপুরুষ, কুৎসিত যে আকার = কদাকার, কুৎসিত যে পুরুষ = কুপুরুষ, বা কাপুরুষ।
- বিশেষ্য-বিশেষ্য কর্মধারয়: উভয় বিশেষ্য দ্বারা একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। যেমনঃ যিনি রাজা, তিনিই ঋষি = রাজর্ষি; যিনি মৌলভী, তিনিই সাহেব = মৌলভীসাহেব।
- বিশেষণে-বিশেষণে কর্মধারয়: দুটি বিশেষণ একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। যেমন: কিছু কাঁচা কিছু পাকা = কাঁচাপাকা, খানিক মিঠা খানিক কড়া = মিঠাকড়া।
- বিশেষণে-বিশেষ্যে কর্মধারয়: যেমনঃ সৎ যে লোক = সৎলোক, নীল যে আকাশ = নীলাকাশ,. খাস যে মহল = খাসমহল।

কখনও কখনও সমস্ত পদে উত্তরপদ পূর্বে বসে। যেমনঃ বাঁটা যে মরিচ = মরিচবাঁটা, ভাজা যে পটল = পটলভাজা।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

- মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস বাক্যের মাঝের ব্যাখ্যামূলক পদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমনঃ ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু; ঘরে থাকে যে জামাই = ঘরজামাই; স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর।
- উপমান কর্মধারয় : উপমান শব্দের অর্থ তুলনীয় বস্তু। উপমান ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে সমাস হলে তাকে উপমান কর্মধারয় বলা হয়। যার সাথে তুলনা করা হয়, তাকে বলা হয় উপমান এবং যাকে তুলনা করা হয়, তাকে উপমেয় বা উপমিত বলা হয়। উভয়ের মধ্যে যে গুণ বা সদৃশ থাকে তা সাধারণ ধর্ম। উপরের আলোচনার আলোকে আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা উপমান-কর্মধারয় সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

উপমান ও সাধারণ গুণ বা ধর্মবাচক পদের সাথে যে সমাস হয় এবং যাতে সেই সাধারণ গুণকে বোঝায়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

সংজ্ঞা: উপমান ও সাধারণ গুণ বা ধর্মবাচক পদের সাথে যে সমাস হয় এবং যাতে সেই সাধারণ গুণকে বোঝায়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমনঃ তুষারের ন্যায় ধবল = তুষারধবল; কাজলের ন্যায় কাল = কাজলকাল, শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত।

- উপমিত কর্মধারয় সমাস : উপমান ও উপমেয় যুক্ত হয়ে সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করলে তাকে বলে উপমিত কর্মধারয় সমাস।

  চরণপদ্ম–এই সমাসবদ্ধ শব্দটিতে পদ্মের সঙ্গে চরণের তুলনা করা হয়েছে। পদ্ম-উপমান; চরণ-উপমেয়। সে জন্য চরণপদ্ম উপমিত কর্মধারয় সমাস। তেমনি, সিংহের মতো বলশালী মানুষ = নরসিংহ, চন্দ্রের তুল্য মুখ = মুখচন্দ্র।

- রূপক কর্মধারয় সমাসঃ উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলা হয়ে থাকে। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' কিংবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়ে থাকে। 'জ্ঞানালোক' এই সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান রূপ আলোক', যেন জ্ঞান-ই আলো হয়ে (মনের) অন্ধকার দূর করছে। জ্ঞানালোক তাই রূপক কর্মধারয় সমাস। তেমনি, বিদ্যা (উপমেয়) রূপ ধন (উপমান) = বিদ্যাধন, চাঁদ (উপমান) রূপ মুখ (উপমেয়) = চাঁদমুখ।

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসবদ্ধ পদের অর্থ সমস্যমান পদগুলি কোনটিকেই না বুঝিয়ে অন্য কিছুকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। 'বীণাপাণি' এই সমাসবদ্ধ শব্দটিতে আছে 'বীণা' আর 'পাণি'। কিন্তু 'বীণাপাণি' শব্দে এ দুটির

কোনটিকেই বোঝায় না। 'বীণাপাণি' অর্থ সরস্বতী। বীণাপাণি-এর ব্যাসবাক্য হলো, 'বীণা পানিতে যার।' অতএব এটি বহুব্রীহি সমাস।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বহুব্রীহি সমাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: যে সমাসে পূর্বপদ বা উত্তরপদের কোনটিরই অর্থ বোঝায় না এবং সমস্তপদটি অন্য একটি পদের অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যে সমাসে পূর্বপদ বা উত্তরপদের কোনটিরই অর্থ বোঝায় না এবং সমস্তপদটি অন্য একটি পদের অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

মনে রাখবেন

- বহুব্রীহি সমাসে সহ, সহিত ও সমান শব্দের স্থলে 'স' হয় এবং 'স' পূর্বপদে বসে। যেমন: ফলের সহিত বা ফলসহ বর্তমান যা = সফল; সমান জাতি যার = সজাতি, লজ্জাসহ বর্তমান যে = সলজ্জ।
- বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণপদ ও সমাসান্ত পদ প্রায়ই পূর্বে বসে। যেমন: ছিন্ন শাখা যার = ছিন্নশাখা, পাপে মতি যার = পাপমতি।
- পরপদ 'জায়া' স্থানে 'জানি' হয়। যেমন: সুন্দরী জায়া যার = সুন্দরজানি।
- পরপদে 'অক্ষি' স্থানে 'অক্ষ' হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঊর্ণ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: পদ্মের ন্যায় অক্ষি যার = পদ্মাক্ষ, পদ্মাক্ষী (স্ত্রী লিঙ্গে)।
- বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে 'ঊণা' স্থানে 'ঊর্ণ' এবং পরপদে 'নাভি' স্থানে 'নাভ' হয়। যেমন: ঊর্ণা নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ; পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মণাভ।
- বহুব্রীহি সমাসে ঈ-কারান্ত ও উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদের উত্তর এবং এ-কারান্ত শব্দের উত্তর 'ক' হয়। যেমন: স্ত্রীর সাথে বর্তমান যে = সস্ত্রীক, নদী মাতা যে দেশের = নদীমাতৃক।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করি। বহুব্রীহি সমাস কয়েক প্রকার হয়। বহুব্রীহি সমাসকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

- **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়ই বিশেষ্য হয়, তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন, পেট সর্বস্ব যার = পেট সর্বস্ব, আশীতে বিষ যার = আশিবিষ।
- **সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি :** পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। যেমন: দশ আনন যার = দশানন; বদমেজাজ যার = বদমেজাজি।
- **ব্যতিহার-বহুব্রীহি :** ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝালে এবং একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা যে বহুব্রীহি হয়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলে। যেমন: লাঠিতে লাঠিতে লড়াই যেখানে = লাঠালাঠি, কানে কানে কথা যেখানে = কানাকানি।
- **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাস বাক্যস্থিত এক বা একাধিক পদ লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: চাঁদের মত সুন্দর মুখ যার = চাঁদমুখ; রসপূর্ণ যে গোল্লা = রসগোল্লা।
- **নঞর্থক বহুব্রীহি :** নাস্তি, অভাব, অপকৃষ্টতা প্রভৃতি অর্থে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: নেই হায়া যার = বেহায়া; নেই মমতা যার = নির্মম।
- **উপমাপ্রধান বহুব্রীহি :** উপমেয় ও উপমান সম্বন্ধবোধক দুটি বিশেষ্যের মধ্যে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে উপমাপ্রধান বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যার = মৃগনয়না।
- **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের শেষে আ, এ, ও প্রত্যয় থাকে, তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো, একদিকে চোখ যার = একচোখা।

- **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ।

যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা ব্যাসবাক্য করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে নিত্য সমাস বলে।

- **দ্বিগু বা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে সমাস হয়ে সমাহার অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন অর্থ বোঝালে তাকে দ্বিগু বা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: চার চাল আছে যার = চৌচাল, পাঁচ সের ওজন যার = পাঁচসেরী/পাঁচসেরি।

নিত্যসমাস

যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা ব্যাসবাক্য করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন: অন্য দেশ = দেশান্তর; ঈষৎ লাল= লালচে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাস কাকে বলে? কয় প্রকার? উদাহরণসহ লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সমাস কাকে বলে? সমাস কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
২. পূর্বপদ, উত্তরপদ, ব্যাসবাক্য, সমস্তপদ, কাকে বলে? সমস্যমান পদ বলতে কি বোঝেন?
৩. উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখুন : প্রাদি সমাস, একশেষ দ্বন্দ্ব, নঞ্ তৎপুরুষ, উপপদ তৎপুরুষ, নিত্য সমাস, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ব্যতিহার বহুব্রীহি।
৪. উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্নয় করুণ: প্রভাত, মনগড়া, চৌমাথা, গায়েহলুদ, জজসাহেব, ছেলেধরা, সেতার, মিশকাল, মনমাঝি, কাঁচামিঠা, নীলাকাশ, পথেঘাটে, নীলকন্ঠ, পদ্মনাভ, সহোদর, কমলাক্ষী, অবুঝ, সপ্তাহ, উপকূল, মুখচন্দ্র, বীণাপাণি, প্রতিদিন, হতভাগ্য, আলুসিদ্ধ, রাজর্ষি, পূর্ণচন্দ্র, ষোড়শ, পলান্ন স্নেহডোর, মহানদী, রাজপুত্র, অজানা, অসাধ্য, বিশ্ববিখ্যাত, ক্ষণস্থায়ী, রক্তাক্ত, পাঠশালা, দুর্দিন, অনুতাপ, প্রতিমূর্তি।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৫

কারক

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *কারকের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন*
- *কারক কত প্রকার ও কি কি তা জানতে পারবেন*
- *বিভিন্ন কারকের ভিন্ন ভিন্ন যে রূপ আছে, সে- সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।*

বাংলায় ‘কারক’ শব্দটি সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইংরেজি Case শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় এখন ‘কারক’ শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পাণিনির মতে ‘ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্’-ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক থাকে, তা-ই হলো কারক।

কারক [কৃ +ণক (অক)] শব্দটির অর্থ ‘ক্রিয়া সম্পাদন করে যা’ কোনও একটি বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে বিশেষ্য বা সর্বনামের নানা প্রকার অন্বয় বা সম্পর্ক থাকতে পারে। ক্রিয়া সম্পাদন করতে হলে ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল, উপকরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। সে-জন্য ব্যক্তি,বস্তু, স্থান, কাল, উপকরণ প্রভৃতির সঙ্গে ক্রিয়াপদের যে সম্পর্ক তা-ই কারক।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এবার একটি বাক্যের দিকে একটু নজর দিই। ‘সোমা, তুমি কি তোমার বাগান থেকে কয়েকটি কাঁঠাল লোক দিয়ে (দ্বারা) মিতাকে শৈলকুপায় পাঠিয়ে দেবে?’– এই বাক্যে ‘দেবে’ ক্রিয়ার সাথে যে সব অন্বয় বা সম্পর্ক আছে তা হলো : (১) কে দেবে? ‘তুমি’, (২) কি দেবে? ‘কাঁঠাল’, (৩) কিসের সাহায্যে দেবে? ‘লোক দিয়ে’, (৪) কাকে দান করবে? ‘মিতাকে’, (৫) কোথা থেকে দেবে? ‘বাগান থেকে’, (৬) কোথায় দেবে? ‘শৈলকুপায়’, তাহলে ‘দেবে’ ক্রিয়ার সঙ্গে ‘তুমি; কাঁঠাল; লোক; মিতা; বাগান; শৈলকুপা; এই ছয়টি পদের এক এক রকম অন্বয় বা সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং এগুলো কারক। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা এবার কারকের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: কোন বাক্যে ক্রিয়া পদের সঙ্গে অন্য পদের যে অন্বয় বা সম্পর্ক থাকে তাকে কারক বলে।

কোন বাক্যে ক্রিয়া পদের সঙ্গে অন্য পদের যে অন্বয় বা সম্পর্ক থাকে তাকে কারক বলে।

কারকের প্রকারভেদ

ক্রিয়াপদ বা বাক্যের সাথে যে অন্বয় বা সম্পর্ক থাকে তাকে কারক বলে। এই সংজ্ঞা দ্বারা সম্বন্ধ ও সম্বোধন কারক হতে পারে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখেছি ক্রিয়ার সাথে অন্বয় বা সম্পর্ক ছয় প্রকার হতে পারে। অতএব, কারক ছয় প্রকার। যথা:

১) কর্তৃ কারক (Nominative Case)
২) কর্ম কারক (Accusative Case)
৩) করণ কারক (Instrumental Case)
৪) সম্প্রদান কারক (Dative Case)
৫) অপাদান কারক (Ablative Case)
৬) অধিকরণ কারক (Locative Case)

কারক ছয় প্রকার। যথা: কর্তৃ কারক, কর্ম কারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নলিখিত বাক্যের দিকে আমরা আর একবার নজর দিই। 'সোমা, তুমি কি তোমার বাগান থেকে কয়েকটি কাঁঠাল লোক দ্বারা মিতাকে শৈলকুপায় পাঠিয়ে দেবে?'

কে দেবে? – তুমি। অতত্রব 'তুমি; কর্তৃকারক।

কি দেবে? – কাঁঠাল। অতত্রব 'কাঁঠাল; কর্মকারক।

কিসের দ্বারা বা কাকে দিয়ে দেবে? – লোকদ্বারা। অতত্রব 'লোকদ্বারা; করণ কারক।

কাকে দান করবে? – মিতাকে। অতত্রব 'মিতাকে; সম্প্রদান কারক।

কোথা থেকে দেবে? – বাগান থেকে। অতত্রব 'বাগান থেকে; অপাদান কারক।

কোথায় দেবে? – শৈলকুপায়। অতত্রব 'শৈলকুপায়; অধিকরণ কারক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'কে' প্রশ্নের উত্তরে কর্তৃকারক, 'কি' প্রশ্নের উত্তরে কর্মকারক 'কি দ্বারা' প্রশ্নের উত্তরে 'করণ কারক', 'কাকে' (স্বত্ব ত্যাগ করে দান) প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান কারক, 'কোথা থেকে' প্রশ্নের উত্তরে অপাদান কারক এবং 'কোথায়' প্রশ্নের উত্তরে অধিকরণ কারকের পরিচয় পাওয়া যায়। এ রকম প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে অতি সহজেই আমরা কারক নির্ণয় করতে পারি।

- পূর্বোক্ত বাক্যে 'তোমার' পদের সাথে 'দেবে' ক্রিয়ার কোন অন্বয় বা সম্পর্ক নেই; কিন্তু এই পদের সাথে বাগানের এক বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। এ জন্য 'তোমার' এই পদটিকে কারক বলে না। কিন্তু সম্বন্ধ পদ (চড়ংংবংংরাব) বলে। বাংলায় একে সম্বন্ধ কারক বলা যেতে পারে।
- পূর্বোক্ত বাক্যে সোমাকে সম্বোধন করে বা ডেকে বলা হয়েছে। কিন্তু 'সোমা' এই পদের সাথে 'দেবে' ক্রিয়া পদের কোন অন্বয় বা সম্পর্ক নেই। এ জন্য 'সোমা' এই পদকে কারক বলা যায় না, একে সম্বোধন পদ (ঠড়পধঃরাব) বলে। বাংলায় একে সম্বোধন কারক বলা যেতে পারে।
- পূর্বোক্ত বাক্যে 'ই', (তুমি পদে), 'র' ('তোমার' পদে), 'কে' ('মিতাকে' পদে), 'য়' ('শৈলকুপায়' পদে), এগুলি অর্থহীন হলেও বিভিন্ন শব্দে যুক্ত হয়ে শব্দগুলোকে বিভিন্ন কারক ও পদে বিভক্ত করেছে। এ জন্য এগুলোকে পদ বিভক্ত বলা হয়। তাহলে, কারক ও পদ বোঝাবার জন্য বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দের সাথে যে সব অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় সেগুলোকে পদবিভক্তি বলে।

'সোমা', 'কাঁঠাল'–এই দুই পদে বিভক্তি লোপ পেয়েছে। 'বাগান থেকে', 'লোক দ্বারা'– এখানে 'থেকে' এবং 'দ্বারা' কারক অব্যয়।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা বিভক্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের পদে রূপান্তরিত করার জন্য শব্দের সঙ্গে যা যোগ করতে হয় তাকে বলা হয় বিভক্তি। যথা: এ, তে, র, কে ইত্যাদি। সূচক+কে = সূচককে, সূচক+এর = সূচকের, পৃথিবী+তে= পৃথিবীতে, যা+ইব = যাব। বিভক্তি দুই প্রকার, যথা: (ক) শব্দ বভক্তি বা নাম বিভক্তি ও (খ) ক্রিয়া বিভক্তি বা ধাতু বিভক্তি।

ক. শব্দবিভক্তি : শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে বিভক্তি পদ তৈরি করে তাকে শব্দবিভক্তি বলা হয়। এ, য়ে, য়, তে, এতে, কে, রে, এরে, এর। এরকম অনেক শব্দবিভক্তি বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন: সূচি রুবিকে পড়াচ্ছে। বাক্যটিতে 'সূচি' পদের সাথে 'শূন্য (০)' বিভক্তি (সূচি + ০), রুবি পদের সাথে 'কে' বিভক্তি (রুবি+কে) যুক্ত হয়েছে। এরা শব্দ বিভক্তি। শব্দ বিভক্তি কারক সূচিত করে বলে এগুলো কারক বিভক্তি নামেও অভিহিত হয়।

বাংলায় অনেক সময়ে বিভক্তিহীন পদ পাওয়া যায়। এই অনুপস্থিত বিভক্তিকে শূন্যবিভক্তি বলা হয়।

খ. ক্রিয়া বিভক্তি : ক্রিয়াকে বাক্যে পদ হিসেবে বসানোর জন্য যে বিভক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে বলা হয় ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন: 'আমি বলি' : √বল্+ই = বলি, এই 'ই' হলো ক্রিয়া বিভক্তি।

শব্দ বিভক্তির সঙ্গে কারকের এবং ক্রিয়া বিভক্তির সঙ্গে কাল ও পুরুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। কারক ভেদে শব্দবিভক্তিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো: প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। বাংলায় অনেক সময়ে বিভক্তিহীন পদ পাওয়া যায়। এই অনুপস্থিত বিভক্তিকে শূন্যবিভক্তি বলা হয়। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিভক্তি ও অনুসর্গ পদগুলো একবচন ও বহুবচন সম্পন্ন পদের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একবচন ও বহুবচনে বিভক্তির রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	০, অ, এ, য়, (য়ে), তে, এতে	রা, এরা, গুলি, গুলো, সমূহ, গণ
দ্বিতীয়া	০, কে, রে, এ, য়ে, য়	দিগে, দিগের, দিগকে, দেরকে, দের
তৃতীয়া	০, এ, য়, তে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা, দিগ কর্তৃক, দের দিয়া, গুলি কর্তৃক
চতুর্থী	০, কে, রে, এতে, এ, য়, তে	দিগে, দিগের, দিগকে, দেরকে, দের
পঞ্চমী	০, হইতে, হতে. চেয়ে, থেকে, এ, য়, তে	দিগের হইতে, দের হইতে, দিগের থেকে, দের থেকে, দিগ হইতে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, দের হতে
ষষ্ঠী	র, কের, কার, এর	দের, দিগের
সপ্তমী	এ, য়, তে, (য়ে), এতে	দিগে, দিগেতে

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে পদ বিভক্তিকে নিম্নলিখিত রূপে অভিহিত করা হয়:

প্রথমা.-------------- কর্তৃ কারক --------------------বিভক্তি

দ্বিতীয়া ------------- কর্ম কারক --------------------বিভক্তি

তৃতীয়া-------------- করণ কারক -------------------বিভক্তি

চতুর্থী--------------- সম্প্রদান কারক ----------------বিভক্তি

পঞ্চমী -------------- অপাদান কারক ----------------বিভক্তি

ষষ্ঠী ---------------- সম্বন্ধপদ কারক ----------------বিভক্তি

সপ্তমী -------------- অধিকরণ কারক ---------------বিভক্তি

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে পদ বিভক্তির যে রূপটি রয়েছে, বাংলা কারকের জন্য তা সব সময় প্রযোজ্য নয়। বাংলা কারকের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। যেমন, প্রথমা বিভক্তি কর্তৃকারকের চিহ্ন হলেও কর্তৃকারকে অন্যান্য বিভক্তি অর্থাৎ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপদান এবং অধিকরণ কারকেও একাধিক বিভক্তি ব্যবহৃত হতে পারে। 'এ' বিভক্তি বাংলায় প্রতিটি কারকেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাংলা কারকের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। বিশেষ বিশেষ কারকে বিশেষ বিশেষ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কর্তৃকারক

বাক্যের ক্রিয়াপদটিকে যে সম্পন্ন করে বা চালায়, তাকে কর্তা বলা হয়; আর কর্তাপদের কারকের নাম কর্তৃকারক।

যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তৃকারক বলে।

এবার আসুন, শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কর্তৃকারকের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তৃকারক বলে।

কর্তৃকারক চার প্রকার হতে পারে। এগুলো হচ্ছে: মুখ্য কর্তা, প্রযোজক কর্তা, প্রযোজ্য কর্তা ও ব্যতিহার কর্তা।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

কর্তৃকারক চার প্রকার হতে পারে। এগুলো হচ্ছে: মুখ্য কর্তা, প্রযোজক কর্তা, প্রযোজ্য কর্তা ও ব্যতিহার কর্তা।

মুখ্যকর্তা : যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্য কর্তা বলে। যেমন: রুবি ফুল তোলে। আমিন বল খেলে। 'রুবি' ও 'আমিন' মুখ্যকর্তা।

প্রযোজক কর্তা : যে অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করায় তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন: মা ছেলেকে ভাত খাওয়ান। 'মা' প্রযোজক কর্তা।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন: মা ছেলেকে ভাত খাওয়ান। 'ছেলেকে' প্রযোজ্য কর্তা।

ব্যতিহার কর্তা : একাধিক কর্তা একই জাতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করলে তাকে ব্যতিহার কর্তা বলা হয়। যেমন: ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া করছে। এখানে 'ভাইয়ে-ভাইয়ে' ব্যতিহার কর্তা।

কর্মকারক

'শিমু ফুল তোলে।' শিমু কী তোলে? ফুল। 'শিমু বই পড়ে।' 'শিমু কী পড়ে? বই । 'তোলে' এবং 'পড়ে'– এই ক্রিয়া দুটির কর্তা যে কর্ম করে তা হলো 'ফুল' এবং 'বই'। এ জন্য এদের কর্মকারক বলে। যাকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদন বা সম্পন্ন করা হয় তাকে বলা হয় কর্ম। ক্রিয়াপদের সাথে কর্মপদের সম্পর্কই কর্মকারক। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা এবার কর্মকারকের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

কর্তা যা করে বা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে কর্মকারক বলে।

সংজ্ঞা: কর্তা যা করে বা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে কর্মকারক বলে।

কর্মকারক কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন: মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম, সমধাতুজ কর্ম ইত্যাদি।

মুখ্য ও গৌণ কর্ম: কোন কোন ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এদের মধ্যে সাধারণত ক্রিয়ার সাথে অপ্রাণিবাচক কর্মের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে বলে তাকে মুখ্য কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মের অপ্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে বলে তাকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন, মা আমাকে পাঁচশত টাকা দিয়েছিলেন। –এখানে 'টাকা' মুখ্য কর্ম এবং 'আমাকে' গৌণ কর্ম।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম: কখনও কখনও সমার্থক ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এদের মধ্যে একটিকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ করে অপরটির দ্বারা কিছু বলা হয়, বা অপরটিকে প্রথমটির উপরে আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রধান কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম এবং আরোপিত অন্য কর্মকে বিধেয় কর্ম বলে। যেমন, জাদুকর একটি বেগুনকে ডিম বানালো। এখানে, বেগুন'কে উদ্দেশ্য কর্ম এবং 'ডিম' বিধেয় কর্ম।

কর্তা যা করে বা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে কর্মকারক বলে।

সমধাতুজ কর্ম: একই ধাতু থেকে উৎপন্ন কর্মকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন: তুমি কি খেলা খেলেছ? এখানে 'খেলা' সমধাতুজ কর্ম।

করণ কারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন বা সম্পন্ন করে তাই হলো করণ কারক। যেমন: 'কলম দিয়ে লিখি।' লেখা কাজটি কী দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ? কলম দিয়ে। 'সে কানে শোনে না।' শোনা কাজটি কী দিয়ে সম্পন্ন হয় ? কান দিয়ে। এ দুটি উদাহরণে 'লেখা' এবং 'শোনা'–এই ক্রিয়া দুটি যথাক্রমে 'কলম' এবং 'কান' দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য এদের করণ কারক বলে।

যার দ্বারা বা যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন বা সম্পন্ন করা হয় তাকে করণ কারক বলে।

তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা করণ কারকের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা : যার দ্বারা বা যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন বা সম্পন্ন করা হয় তাকে করণ কারক বলে।

সম্প্রদান কারক

স্বত্ব ত্যাগ করে যাকে কিছু দান করা যায়, অথবা যার জন্য বা যার উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। কাকে, কার জন্য, কার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান কারক পাওয়া যায়। যেমন: ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। সৎপাত্রে মেয়ের বিয়ে দেয়া উচিত। –এখানে 'ভিক্ষুককে' এবং 'সৎপাত্রে' সম্প্রদান কারক।

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দান করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।

সংজ্ঞা : যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দান করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।

স্বত্ব ত্যাগ করে দান না করলে সম্প্রদান কারক না হয়ে কর্মকারক হয়। যেমন: ধোপাকে কাপড় দাও। এখানে 'ধোপা' কর্মকারক।

মনে রাখবেন

সম্প্রদান কারক মূলত দ্বিকর্মক ক্রিয়ার গৌণ কর্ম, তবে তার বৈশিষ্ট্য নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখন স্বত্ব ত্যাগ করে প্রদান করা বোঝায়, তখন দানের পাত্রকে সম্প্রদান কারক নামকরণ করা হয়। যদি স্বত্ব ত্যাগ করে প্রদান করা না বোঝায়, তা হলে সম্প্রদান কারক না হয়ে কর্মকারক হয়। কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অতি সামান্য, সে-জন্য আধুনিক বৈয়াকরণগণ সম্প্রদান কারককে পৃথক কারকরূপে গণ্য না করে কর্ম কারকের অর্ন্তভুক্ত করতে চেয়েছেন।

যখন স্বত্ব ত্যাগ করে প্রদান করা বোঝায়, তখন দানের পাত্রকে সম্প্রদান কারক নামকরণ করা হয়। যদি স্বত্ব ত্যাগ করে প্রদান করা না বোঝায়, তা হলে সম্প্রদান কারক না হয়ে কর্মকারক হয়।

অপাদান কারক

কোন ঘটনার উৎপত্তি-স্থান বা যা থেকে কোন বস্তু বা ব্যক্তি উৎপন্ন, চলিত, নির্গত, নিঃসৃত, উত্থিত, পতিত, প্রেরিত, গৃহীত, দৃষ্ট, শ্রুত, সূচিত, নির্ধারিত, অন্তর্হিত, রক্ষিত ইত্যাদি হয় তাকে অপাদান কারক বলে। 'কী বা কি হতে, কী থেকে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে অপাদান কারক পাওয়া যায়। যেমন- 'গাছ হতে ফল পড়ে।' ফল কোথা থেকে পড়ে ? গাছ থেকে। 'দুধ হতে ঘি হয়।' ঘি কোথা থেকে হয়? দুধ হতে। এখানে 'পড়ে' ও 'হয়' এই দুটি ক্রিয়া যথাক্রমে 'গাছ' এবং 'দুধ' হতে প্রকাশিত হয়। এগুলি অপাদান কারক।

সংজ্ঞা : বাক্যে যা হতে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে।

বাক্যে যা হতে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে।

অধিকরণ কারক

যে স্থান, বিষয়, অবস্থা, কিংবা কালকে আধার বা আশ্রয় অথবা অবলম্বন করে কোন কিছু ঘটনা ঘটে, অথবা কোন কিছু বিদ্যমান থাকে, তাকে অধিকরণ কারক বলে। 'কোথায়', 'কিসে', 'কখন', 'কবে' এ ধরনের পদ যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে অধিকরণ কারক পাওয়া যায়।

'নদীতে মাছ থাকে।' 'রাতে তারা দেখা যায়।' এখানে 'থাকে' এবং 'যায়' ক্রিয়া দুটি সম্পন্ন হচ্ছে 'নদীতে' এবং 'রাতে'। এ জন্য 'নদিতে' এবং 'রাতে' অধিকরণ কারক।

যাতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে।

সংজ্ঞা : যাতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণ কারক তিন প্রকার: আধারাধিকরণ (স্থান); কালাধিকরণ (সময়) এবং ভাবাধিকরণ (বিষয়)।

আধারাধিকরণ : যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে আধারাধিকরণ বলে। যেমন: ছেলেটি অংঙ্কে কাঁচা। ফুলে মধু আছে।

কালাধিকরণ : যে সময়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে কালাধিকরণ বলে। যেমন: বসন্তে নানা ফুল ফোটে। শুক্রবার ক্লাস হয়।

ভাবাধিকরণ : যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে বিষয় বা ভাবাধিকরণ বলে। যেমন: মেয়েটি ইংরেজিতে কাঁচা। শিমু রসায়নে ভাল।

তাছাড়া এক ক্রিয়ার কালের উপর অন্য ক্রিয়ার কাল নির্ভর করলেও ভাবাধিকরণ হয়। যেমন: সূর্যোদয়ে নলিনী ও চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয়।

সম্বন্ধ পদ

ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন পদের সাথে যার সম্বন্ধ বা সম্পর্ক থাকে তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বন্ধ পদ কারক নয়। সম্বন্ধ পদে সাধারণত 'র' কিংবা 'এর' বিভক্তি যোগ হয়। 'পাখির ডানা আছে'। ডানার সাথে পাখির সম্বন্ধ আছে। 'তার টাকা নেই।' এখানে টাকার সাথে 'তার' সম্বন্ধ আছে। এজন্য 'পাখির' এবং 'তার' সম্বন্ধ পদ।

যার অধিকারে কোন কিছু থাকে কিংবা যার সঙ্গে কোন কিছুর সম্বন্ধ আছে, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা সম্বন্ধ পদের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।
সংজ্ঞা: যার অধিকারে কোন কিছু থাকে কিংবা যার সঙ্গে কোন কিছুর সম্বন্ধ আছে, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

সম্বোধন পদ

যাকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়। 'শিমু এখানে এস।' এই বাক্যে শিমুকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। 'এই ছেলে, তোমার নাম কি?' 'তোমার নাম কি', এই বাক্যে ছেলেকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। এজন্য 'শিমু' এবং 'এই' সম্বোধন পদ।

বাক্যে যে পদের মাধ্যমে কাউকে ডাকা হয় তাই সম্বোধন পদ।

সংজ্ঞা: বাক্যে যে পদের মাধ্যমে কাউকে ডাকা হয় তাই সম্বোধন পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কারক কাকে বলে? কত প্রকার? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কি কি? কারক বিভক্তি বলতে কী বোঝেন?
২. সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদকে কারক বলা যায় কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
৩. সম্প্রদান কারক কাকে বলে? কর্ম কারক থেকে সম্প্রদান কারকের পৃথক করার কোন যুক্তি আছে কি?
৪. অধিকরণ কারক কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৬. টীকা লিখুন : মুখ্যকর্তা, ব্যতিহার কর্তা, প্রযোজ্য কর্তা, প্রযোজক কর্তা, মুখ্য ও গৌণ কর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম, সমধাতুজ কর্ম, আধারাধিকরণ, কালাধিকরণ, ভাবাধিকর।
৭. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন।
(ক) সুন্দরবনে বাঘ আছে। (খ) ছেলেরা বল খেলছে। (গ) পাতায়-পাতায় বৃষ্টি পড়ে। (ঘ) তিলে তৈল আছে। (ঙ) তিল হতে তৈল হয়। (চ) শুক্রবার ক্লাস হয়। (ছ) শোভা যায়। (জ) ধোপাকে কাপড় দাও। (ঝ) কলম দিয়ে লিখি। (ঞ) মা ছেলেকে ভাত খাওয়ান।
৮. সকল কারকের উদাহরণ দেয়া যায় এমন একটি বাক্য রচনা করুন এবং বাক্যটিতে কারক সনাক্ত করে দেখান।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৬

প্রচলিত ব্যাকরণে বাক্য রীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *বাক্য সম্পর্কে জানতে পারবেন*
- *বাক্য রচনার লক্ষণীয় দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন*
- *বাক্য রচনার প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন*
- *বাক্যে পদেরক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।*

বাক্যের বিভিন্ন দিক যেমন, বাক্যের গঠন, বাক্যের উপাদান, বাক্যের শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত প্রচলিত ব্যাকরণেই হয়েছিল। একটি ভাষা অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি। বাক্যগুলো গঠিত হয় শব্দের দ্বারা। বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো শব্দের দ্বারা বাক্য গঠিত হয় না। শব্দগুলোর থাকতে হয় অর্থ এবং একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের থাকতে হয় সম্পর্ক, তবেই বাক্য গঠিত হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, শব্দ যখন বাক্যে বসে, তখন তাকে পদ বলা হয়। তাহলে পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক অন্বয়যুক্ত বা সম্পর্কযুক্ত পদসমষ্টির নাম বাক্য।

যে পদ সমষ্টির দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবার বাক্যের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: যে পদ সমষ্টির দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে।

বাক্যের গঠন

প্রচলিত ব্যাকরণে বাক্যকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়: উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

প্রচলিত ব্যাকরণে বাক্যকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়: উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate)। যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং যা বলা হয় তা বিধেয়। যেমন: শিমু বাড়ি যায়–এই বাক্যে 'শিমু' উদ্দেশ্য এবং 'বাড়ি যায়' বিধেয়। উদ্দেশ্য অংশে একটি বিশেষ্য কিংবা সর্বনাম কিংবা নামপদস্থানীয় কিছু থাকে। বিধেয় অংশে অবশ্যই একটি ক্রিয়াপদ থাকে। কোন কোন বাক্যে ক্রিয়া পদ উহ্য থাকতে পারে। যেমন, শিমু ভালো মেয়ে। – এই বাক্যে 'হয়' ক্রিয়া পদটি উহ্য আছে।

বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

প্রচলিত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ১. সরল বাক্য ২. মিশ্র বা জটিল বাক্য ও ৩. যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য।

প্রচলিত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ১. সরল বাক্য (Simple Sentence), ২. মিশ্র বা জটিল বাক্য (Complex Sentence) ও ৩. যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compound Sentence)।

১. **সরল বাক্য :** যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন : ছাত্রীরা পড়ে, বৃষ্টি পড়ে।

সরল বাক্যে একের অধিক উদ্দেশ্য-পদ থাকতে পারে কিন্তু বিধেয়-পদ একটি থাকে। যদি একটি সমাপিকা-ক্রিয়ার একাধিক কর্তা থাকে তাহলে সবকটি কর্তা মিলিয়ে একটি মাত্র উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করা হয়। যেমন, 'ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছেন'। (- রবীন্দ্রনাথ)

২. **মিশ্র বা জটিল বাক্য:** যে বাক্যে একটি প্রধান উপবাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বা আশ্রিত উপবাক্য থাকে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন, ছাত্রটি যদি পড়ে তাহলেই সে পাস করবে। এখানে ছাত্রের পাস করাই বক্তার মূল বক্তব্য। সুতরাং 'সে পাস করবে' হলো প্রধান বাক্য, আর 'যদি ছাত্রটি পড়ে' হচ্ছে পাস করার শর্ত, এটি হচ্ছে অপ্রধান বাক্য।

জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রধান ও অপ্রধান দুটি বাক্যকেই খন্ডবাক্য বা উপবাক্য (Clause) বলা হয়। খন্ডবাক্য বা উপবাক্য দুরকমের: প্রধান বা স্বাধীন উপবাক্য (Main or Principal clause) এবং অপ্রধান উপবাক্য বা আশ্রিত উপবাক্য (Dependent clause)।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আসুন আমরা বাক্যাংশের বা পদগুচ্ছের (Phrase) সাথে উপবাক্যের পার্থক্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। যেমন: 'যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন তিনি পথের পাঁচালী লিখতে পেরেছেন।' এই বাক্যে 'যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন', হলো আশ্রিত বা অধীন উপবাক্য (Dependent clause), আর 'তিনি পথের পাঁচালি লিখতে পেরেছেন'; হলো প্রধান উপবাক্য (Main clause), আর 'প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ' হলো একটা পদগুচ্ছ।

উপবাক্য বাক্যের সমগ্র অংশ হলেও তাতে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটি বিধেয় (একটি ক্রিয়া) অবশ্যই থাকে। কিন্তু পদগুচ্ছের এ রকম উদ্দেশ্য ও বিধেয় সব সময় থাকে না।

৩. **যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য:** যে বাক্য একের অধিক প্রধান উপবাক্য সংযুক্ত হয়ে গঠিত হয় তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলে। একের বেশি সরল বা মিশ্রবাক্যকে সংযোজক অব্যয় ('এবং', 'ও', 'আর' প্রভৃতি) বা বিয়োজক অব্যয় ('অথবা, বা, কিংবা, প্রভৃতি) দিয়ে যুক্ত করে যে বাক্য গঠিত হয়, তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলে।

যেমন: শিমু রাতের গাড়িতে আসবে এবং এখানেই থাকবে। সে না আসলে তুমি যাবে না কিন্তু সে বলেছে যে তার আসতে দেরী হবে।

শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠনের শর্ত

প্রথাগত ব্যাকরণবিদরা শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন। এগুলো হলো: (১) আকাঙ্ক্ষা (২) যোগ্যতা (৩) আসত্তি বা নৈকট্য।

আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেছিলেন, বাক্য হলো যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি যুক্ত পদ-সমুচ্চয় ('বাক্যং সাৎ যোগ্যতা- আকাঙ্ক্ষা-আসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ)।' বিশ্বনাথের সূত্রটি প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে একটি মূলসূত্ররূপে গৃহীত হয়েছে। প্রথাগত ব্যাকরণবিদরা শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন। এগুলো হলো: (১) আকাঙ্ক্ষা (Expectancy) (২) যোগ্যতা (Compatibility) (৩) আসত্তি বা নৈকট্য (Proximity)।

১. আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের পদগুলি যদি বাক্যটি বিষয়ে বক্তা বা শ্রোতার চাহিদা অথবা কৌতূহল সম্পূর্ণ মেটাতে পারে, তাহলে পদগুলিকে পূর্ণাকাঙ্ক্ষা পদ বলা হয়। যেমন: 'আমি গিয়ে দেখলাম' বললে শ্রোতার মনে 'কী দেখলাম' তা জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। শ্রোতার এই না মেটা কৌতূহলকেই আকাঙ্ক্ষা বলা হয়। আবার, 'আমি গিয়ে দেখলাম যে তার সব কাজ করা হয়ে গেছে'- এই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা সবটাই মিটে গেছে এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয়েছে।

তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আকাঙ্ক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো, কোন বাক্যের বক্তব্য পূর্ণরূপে জানার জন্য শ্রোতার মনে যে আকাঙ্ক্ষা বা কৌতূহল থাকে তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

২. যোগ্যতা: যে পদসমষ্টি সংগত ও অর্থবহ বাক্য গঠনের উপযোগী, তাদের যোগ্যতা আছে বলে ধরা হয়। যেমন, 'গরুগুলো উড়ছে', 'কুকুরগুলো ঘাস খাচ্ছে।' – এই দুটো বাক্যে, গরুর উড়বার যোগ্যতা নেই এবং কুকুর ঘাস খেতে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং, এগুলো বাক্য নয়। কারণ এদের মধ্যে অর্থসংগতি নেই।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরের আলোচনার আলোকে আসুন এবার আমরা যোগ্যতার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: বাক্যের অর্থ অর্থাৎ বক্তার বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার বা বৃহত্তর কিংবা গভীরতর সত্যের যে সংগতি থাকে, তাকে যোগ্যতা বলা হয়।

৩. **আসত্তি বা নৈকট্য** : আসত্তি বলতে বোঝায় বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে সংগতি ও বিন্যাসের নৈকট্য বা ক্রম। যেমন: 'আমি ঢাকা যাই' বাক্যে 'আমি' কথাটি উত্তম পুরুষের বলে 'যাই' ক্রিয়াটিও উত্তম পুরুষের হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বলি 'আমি ঢাকা যান' তাহলে উত্তম পুরুষের কর্তার সঙ্গে প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার সংগতি থাকে না।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আসুন আমরা উপরের আলোচনার আলোকে আসত্তির একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: বাক্যের পদগুলিকে ঠিকঠিক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করার নামকে আসত্তি বা নৈকট্য বলা হয়।

বাক্যের পদের ক্রম (Order of words in the sentence)

বাক্যে পদক্রম আধুনিক বাক্যতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আধুনিক বর্ণনামূলক ও রূপান্তরমূলক-সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠার আগে কোন-কোন প্রথাগত ব্যাকরণবিদ বাংলা বাক্যের পদক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। বিশেষ করে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে' এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, তাতে বাংলা বাক্যে পদবিন্যাসের মূলসূত্র পাওয়া যায়। তাঁর সূত্রগুলি অনুসরণে বাংলা বাক্যে পদক্রম আলোচনা করা হলো।

- বাংলা বাক্যের দুটি মূল উপাদান: উদ্দেশ্য ও বিধেয়। সাধারণত বাক্যে দুটি উপাদানই উপস্থিত থাকে। কিন্তু বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় অংশ উহ্য থাকতে পারে। যেমন: 'যাও', 'দূর হও'– এই বাক্যে 'তুমি' বা তোমরা উদ্দেশ্য উহ্য আছে। তেমনি, মালা কে নেবে? - 'আমি'। এখানে দ্বিতীয় বাক্যটিতে আপাতদৃষ্টিতে একটি মাত্র শব্দ নিয়ে গঠিত 'আমি'। কিন্তু এখানে এই বাক্যের একটি বিধেয় আছে 'নেবো', সেটি উহ্য।
- উদ্দেশ্য সাধারণত বিধেয়ের আগে বসে। তবে বিশেষ আবেগ প্রকাশ করার জন্য বা বাক্যের কোন অংশে জোর দেবার জন্য বা কবিতার ছন্দের প্রয়োজনে উদ্দেশ্যটি বিধেয়ের পরে বসতে পারে। যেমন: সে কাল আসবে। এক ছিল রাজা।
- বাংলা বাক্যে পদের স্বাভাবিক ক্রম হলো : কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া। যেমন: শিমু শাওনকে বলল। এই ক্রম বিশেষ্য শব্দের উপর জোর দেয়ার জন্য নানাভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন: শাওনকে বলল শিমু। শিমু বলল শাওনকে। শাওনকে শিমু বলল।
- বিশেষ শব্দের উপর জোর দেয়ার দরকার না হলে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যে পদক্রমের সংক্ষিপ্ত সূত্র হলো: কর্তার পরে কর্ম এবং কর্মের পরে ক্রিয়া।
- বাংলা বাক্যে বিশেষণ সাধারণত বিশেষের আগে বসে। যেমন: 'সুন্দর মেয়ে'। 'ভাল ছেলে'। কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলায় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসেছে মনে হতে পারে। যেমন, 'ছেলে ভাল'। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিশেষণটি বিধেয় বিশেষণ, কারণ 'ছেলে ভাল' প্রকৃত পক্ষে একটি বাক্য। এই বাক্যে ক্রিয়াটি উহ্য আছে। পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি হলো 'ছেলে (হলো) ভাল।' এখানে 'ভাল' বিশেষণটি বিধেয়ের অন্তর্গত। বাংলায় সাধারণত বিধেয় বিশেষণ বিধেয় অংশেই বসে এবং বিধেয় উদ্দেশ্যের পরে বসে।
- বাংলা বাক্যে সাধারণত উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দেশ্যের আগে বসে আর বিধেয়ের প্রসারক বিধেয়ের আগে বসে, এবং সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসে। যেমন, 'শিমুর দূরসম্পর্কীয় বোন ইরানি সকাল বেলা ঘরের দরজায় বসে গমের রুটির নাস্তা খাচ্ছে।' এই বাক্যে উদ্দেশ্যের প্রসারক 'শিমুর দূরসম্পর্কীয় বোন; বিধেয়ের প্রসারক 'সকাল বেলা ঘরের দরজায় বসে; সমাপিকা ক্রিয়া 'খাচ্ছে'।

- বিধেয়ের প্রসারক বিধেয়ের আগে না বসে উদ্দেশ্যের আগেও বসতে পারে। যেমন, 'প্রচন্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল'। আবার বিধেয়ের প্রসারক সমাপিকা ক্রিয়ার পরেও বসতে পারে। যেমন: 'সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পেছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে'।
- বাংলা বাক্যে কর্তার যে পুরুষ হয়, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হয়ে থাকে। যেমন: 'আমি যাই'– কর্তা ও ক্রিয়া দুই-ই উত্তম পুরুষের। 'তুমি যাও'– এখানে কর্তা ও ক্রিয়া দুটোই মধ্যম পুরুষের। 'সে যায়'– এখানেও কর্তা ও ক্রিয়া দুটোই প্রথম পুরুষের। বাংলা মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিন ধরনের রূপ লক্ষ করা যায়। ঘনিষ্ঠতা বা তুচ্ছতা-জ্ঞাপক (Prejorative) তুই, তোরা। সাধারণ (Ordinary) তুমি, তোমরা। সম্মানজনক (Honorific) আপনি, আপনারা। বাংলা বাক্যে সর্বনামের ভিন্নতা অনুসারে ক্রিয়া রূপের সংগতি রাখা হয়। যেমন: তুই যাস, তুমি যাও, আপনি যান, সে যায়, তিনি যান। কিন্তু সমস্যা দেখা যায় যখন ক্রিয়া একটা কিন্তু তার বিভিন্ন পুরুষের একাধিক কর্তা থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, একাধিক কর্তার মধ্যে যদি উত্তম পুরুষের কর্তা থাকে তাহলে ক্রিয়ার রূপ উত্তম পুরুষ অনুযায়ী হয়; আর যদি উত্তম পুরুষ না থাকে তাহলে ক্রিয়ার রূপ মধ্যম পুরুষ অনুযায়ী হয়।

  যেমন: আমি, তুমি আর ভাই শৈলকুপা যাবো। তুমি আর ভাই যাও।
- জটিল বাক্যের অন্তর্গত আশ্রিত উপবাক্য (Dependent clause) অনেক সময় প্রধান বাক্যের আগে বসে। যেমন: 'দেশের মঙ্গলের জন্য তুমি রাজনীতি করতে চাও তাহলে আগে তোমাকে খাঁটি মানুষ হতে হবে।' এখানে 'যদি তুমি দেশের মঙ্গলের জন্য রাজনীতি করতে চাও' অংশটি আশ্রিত উপবাক্য, এটি আগে বসেছে।
- বাংলায় একটি বাক্যে দুয়ের বেশি উদ্দেশ্য বা দুয়ের অধিক বিধেয় থাকলে শেষ উদ্দেশ্য বা শেষ বিধেয়ের পূর্ববর্তী উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের পরে সংযোজক অব্যয় বসে। অন্য উদ্দেশ্য ও বিধেয়গুলির পরে কমা (,) বসে। যেমন: 'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলার তিন মহান সাহিত্যিক।'
- বাংলায় একই বাক্যে একই ভূমিকায় ব্যবহৃত একাধিক পদ কমাচিহ্ন ও সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হলে শেষেরটির সঙ্গেই কারক-বিভক্তির চিহ্ন বা বহুবচনের প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: 'আমি শিমু, শাওন, শিপনকে– নিয়ে এসেছি।' এখানে শিমু, শাওন ও শিপন এই তিনটি উদ্দেশ্য বাক্যে ক্রিয়ার কর্মের ভূমিকা পালন করেছে। শেষ পদটির সাথে কর্ম কারকের বিভক্তি যোগ করা হয়েছে।
- কোন ঘটনার ক্রমিক বিবৃতিতে পরপর যতগুলি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় বাংলায় তাদের কালগত সংগতি (Sequence of Tense) থাকে না। যেমন: 'দশ-বার বছর আগের কথা। এম.এ. পাস করে ঢাকায় বসে আছি। অনেক জায়গায় ঘুরেও একটা চাকরি মিলল না।' এখানে দশ-বার বছর আগের ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বাক্যে বর্তমান কালের ক্রিয়া 'আছি' ব্যবহৃত হয়েছে এবং তৃতীয় বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোন কালগত সংগতি নেই; সেখানে অতীত কালের ক্রিয়া 'মিলল' ব্যবহৃত হয়েছে।
- প্রত্যক্ষ উক্তির (Direct Narration) বাক্যকে যখন পরোক্ষ উক্তিতে (Indirect Narration) পরিবর্তিত করা হয়, তখন বাংলায় প্রধান বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে গৌণ বাক্যের ক্রিয়ার কালগত সংগতি রক্ষা করা হয়। যেমন: প্রত্যক্ষ উক্তি : সীতা রামকে বললেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাব।' পরোক্ষ উক্তি : সীতা রামকে বললেন যে তিনিও তাঁর (রামের) সঙ্গে বনে যাবেন। এখানে প্রধান বাক্যের ক্রিয়া 'বললেন' অতীত কালের ক্রিয়া, কিন্তু গৌণ বাক্যের ক্রিয়া 'যাবেন' ভবিষ্যৎ কালের।
- বাংলা বাক্যে সম্পর্কসূচক নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্মের (Correlatives) মধ্যে একটি ব্যবহৃত হলে অন্যটিও সাধারণত ব্যবহার করতে হয়। যেমন: যে-সে, যিনি-তিনি, যখন-তখন, যেমন-তেমন ইত্যাদি। 'যে পড়াশোনা করে সে পাস করে।' কিন্তু চলিত ভাষায় এই রকম পদগযুগ্মের মধ্যে একটিই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: 'যতদূর চোখ যায়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে একটানা হলদে-ফুল-

তোলা একখানা সুবিশাল গালিচা কে যেন পাতিয়া গিয়াছেন।' (–আরণ্যক: বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়)। এখানে 'সামনে' শব্দের পরে 'ততদূর' শব্দটি উহ্য আছে।

- বাংলা বাক্যে নির্দেশকভাবে (Indicative Mood) নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নি' ইত্যাদি সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন: 'বাঙালিরা আলু খায় না'। এখানে 'না' বসেছে সমাপিকা ক্রিয়া 'খায়'-এর পরে। কিন্তু 'বাঙালিরা আলু না খেয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। –এখানে 'না' বসেছে অসমাপিকা ক্রিয়া 'খেয়ে'-এর আগে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাক্য বলতে কী বোঝেন? বাক্য কয় প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লিখুন।
২. বাক্য গঠনের শর্ত কি? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাক্যে পদক্রম কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রচলিত ব্যাককরণে বাক্যকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়? কি কি?
২. প্রচলিত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? কি কি?
৩. সরল বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
৪. আকাঙ্ক্ষা বলতে কি বোঝেন?
৫. আসত্তি কি?

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৭

উপসর্গ ও অনুসর্গ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *উপসর্গ কী তা বলতে পারবেন*
- *উপসর্গের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন*
- *অনুসর্গ কী তা বলতে পারবেন*
- *অনুসর্গের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন*

কতকগুলো অব্যয় নামবাচক বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে ও অর্থের পরিবর্তন সাধন করে। এ ধরনের অব্যয়কে উপসর্গ বলা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন প্রথমে আমরা উপসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করি। কিছু অব্যয় আছে যেগুলি ধাতু অথবা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে ধাতু বা শব্দের অর্থ বদলিয়ে দেয়– এ জাতীয় অব্যয়গুলোই হচ্ছে উপসর্গ। উপসর্গের নিজের কোন অর্থ নেই। কিন্তু তা অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে। এ জন্য বলা হয় উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই; অর্থ দ্যোতকতা আছে। একই উপসর্গ একাধিক অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে; যেমন: অ, সু, প্র, প্রতি ইত্যাদি। 'কাজ' শব্দের আগে, 'অ' যুক্ত করলে হয়, 'অকাজ' এবং 'সু' যুক্ত করলে হয় 'সুকাজ'। তেমনি 'ক্রিয়া' শব্দের আগে 'প্র' উপসর্গ লাগালে হয় 'প্রক্রিয়া' এবং 'প্রতি' লাগালে হয় 'প্রতিক্রিয়া'।

উপরের আলোচনার আলোকে আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপসর্গের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: কতকগুলো অব্যয় নামবাচক বা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে ও অর্থের পরিবর্তন সাধন করে। এ ধরনের অব্যয়কে উপসর্গ বলা হয়।

উপসর্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) দেশী বা বাংলা উপসর্গ, (২) সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ এবং (৩) বিদেশী উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) দেশী বা বাংলা উপসর্গ, (২) সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ এবং (৩) বিদেশী উপসর্গ।

১. দেশী বা বাংলা উপসর্গ : বাংলায় আর্যদের আসার পূর্বে যে সব জাতি বাস করতো, তাদের ভাষা থেকে যে সব উপসর্গ এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সে সব উপসর্গকে দেশী বা বাংলা উপসর্গ বলে। এগুলো হলো: অ, আ, অনা, না, কু, দর, নির, নিশ, পাতি, পাত, বি, বে, ভর, ভরা, স, সু, হা, আড়, অজ, অঘা।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাংলা উপসর্গের অর্থ ও তার প্রয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

- আ, অনা, অ উপসর্গগুলির অর্থ যখন 'না' অথবা 'মন্দ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: আলুনি, আকাল, অনামুখী, অনাসৃষ্টি, অবেলা, অজানা।
- 'আ', 'অ' উপসর্গ যখন 'প্রকৃষ্ট' 'স্বার্থ' ও 'সাদৃশ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: অঘোর, অরঙ্গা, আকাঠ, আভাজা, অকুমারী।
- 'কু' নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: কুকাজ, কুনজর, কুখবর।
- 'দর' (অত্ম বা ঈষৎ অর্থে) যেমন: দর-পাকা, দরপোক্ত, দর-কাঁচা।
- 'নি', নিশ, নির্' না অর্থে (আগে ছিল বর্তমান নেই) যেমন: নিখোঁজ, নির্ভরসা, নিবারণ, নিশ্ছিপি বোতল।

- 'পাতি, পাতা' (ক্ষুদ্র অর্থে) যেমনঃ পাতি-হাঁস, পাতকুয়া।
- 'বি, বে' (নিন্দা অথবা না অর্থে) : বিরূপ, বিভুঁই, বে-টাইম, বে-হেড।
- 'ভর, ভরা' (পূর্ণ অর্থে): ভরদিন, ভরপেট, ভরা-যৌবন।
- 'স' (স্বার্থে অথবা সঙ্গে অর্থে): সক্ষম, সঠিক, সকাল, সজোর।
- 'সু' (শুভ অর্থে): সুনজর, সুনাম, সুদিন।
- 'হা' (অভাব অর্থে): হা-ভাতে, হাঘরে, হা-হুতাশ।
- 'আড়' (বিশিষ্ট, বাঁকা অথবা অর্ধেক অর্থে): আড়গড়া, আড়চোখ, আড়-পাগলা।
- অজ (সম্পূর্ণ অথবা খাঁটি অর্থে): অজ-পুকুর, অজ-পাড়াগাঁ।
- 'অঘা' (বোকা অথবা অপদার্থ অর্থে): অঘাচন্ডী, অঘামার্কা।

২. **সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ :** যে সব উপসর্গ সংস্কৃত ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সে সব উপসর্গকে সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ বলে। সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি। তবে 'অন্তর' অব্যয়টিকে উপসর্গ হিসেবে বিবেচনায় রাখলে সংস্কৃত উপসর্গ হয় একুশটি। নিচে সংস্কৃত উপসর্গ ও তার ব্যবহার দেয়া হলো।

- 'অনু' (কোন কিছুর দিকে বা পরে অর্থে ব্যবহৃত হয়): অনুজ, অনুরোধ, অনুগত, অনুসরণ।
- 'অতি' (অতিরিক্ত, অতিক্রমণ, অনুচিত ইত্যাদি অর্থে): অতিবৃষ্টি, অতীত, অত্যাচার, অতিদর্প, অতিভক্তি।
- 'অধি' (উপরে অথবা মধ্যে অর্থে): অধিকার, অধিগত, অধিপতি, অধিবাসী।
- 'অন্তর', 'অন্তঃ' (মধ্যে বা ভেতরে অর্থে): অন্তর্গত, অন্তর্ধান, অন্তঃপুর, অন্তঃপাতী।
- 'অপ' (দূরে, মধ্যে, হতে অর্থে): অপক্রান্ত, অপমান, অপশ্রুতি।
- 'অপি' (ভিতরে, উপরে, কাছে অর্থে): অপিনিহিত, অপ্রিনিধান।
- 'অভি' (উপরে, ভিতরে, দিকে, প্রতি, চতুর্দিকে অর্থে): অভিমান, অভিব্যক্তি, অভিভূত, অভিভাষণ, অভিসন্ধি।
- 'অব' (নিচে বা নিচের দিকে অর্থে): অবনয়ন, অবগাহন, অবরোধ।
- 'উপ' (প্রতি, দিকে, সন্নিকটে অর্থে): উপহার, উপবেশন, উপস্থিত, উপনিবেশ।
- 'দুর-, দুষ-, দুঃ'- (অভাব, কু বা মন্দ অর্থে) দুর্ভিক্ষ, দুষ্প্রাপ্য, দুঃসময়, দুর্নাম।
- 'নি'- (নিশ্চয়তা, ভিতরে, নিচে অর্থে): নিবাস, নিপাত, নিকৃষ্ট, নিবৃত্তি।
- 'নিঃ-, নির-, নিষ- (বহির্গত বা নেই অর্থে): নিষ্করুণ, নিঃসন্দেহে, নিবারণ, নিরপরাধ।
- 'পরা'- (বাইরে, দূরে অর্থে): পরাজিত, পরাভব, পরায়ণ।
- 'পরি'- (অতিশয়, সম্যক, চারদিক, শেষ অর্থে): পরিপূর্ণ, পরিভ্রমণ, পরিশ্রম, পরিসীমা।
- 'প্র'- (শ্রেষ্ঠ, পশ্চাৎগামিতা, নিরবচ্ছিন্নতা, সামনে অর্থে): প্রগতি, প্রণাম, প্রপৌত্র, প্রবাহ, প্রভাব, প্রকৃষ্ট।
- 'প্রতি'- (বিপরীতভাবে, বিরুদ্ধে, প্রত্যুত্তরে অর্থে): প্রতিদান, প্রতিরোধ, প্রতিশব্দ, প্রতিপক্ষ, প্রতিবাদ।
- 'বি'- (বিশেষ, গতি, নিন্দিত, বিহীন অর্থে): বিজ্ঞান, বিচরণ, বিরাগ, বিফল।
- 'সম-, স'- (এক বা সাথে অর্থে): সংহতি, সম্মোহন, সংলাপ, সংগতি।
- 'সু'- (মঙ্গল, উৎকৃষ্ট, ভদ্র অর্থে): সুনন্দা, সুকৃতি, সুবিচার, সুদৃঢ়।

৩. **বিদেশী উপসর্গ:** বিদেশীদের সাথে কথা বার্তা বলার ফলে বিদেশী ভাষা থেকে যে সব উপসর্গ বাংলা ভাষায় এসে প্রচলিত হয়ে গেছে, সে সব উপসর্গকে বিদেশী উপসর্গ বলে। নিচে বিদেশী উপসর্গ ও তার ব্যবহার দেয়া হলো।

আরবি উপসর্গ

- 'লা-' (না বোধক অর্থে): লা-পরওয়া, লা-জওয়াব।
- 'আম-' (সাধারণ অর্থে) : আম-মোক্তার, আম-দরবার।
- 'বাজে-' (নিকৃষ্ট, বিবিধ প্রকার, সীমা বহির্ভূত অর্থে): বাজে-কথা, বাজে-জমা, বাজে-আয়।
- 'খাস-' (নিজস্ব অর্থে): খাসদখল, খাসকামরা।

ফারসি উপসর্গ

- 'গর-' (না অর্থে): গর-মিল, গর-হাজির।
- 'দর-' (মধ্যস্থ অর্থে): দরপাকা, দরদালান।
- 'বদ-' (নিন্দা অর্থে): বদমেজাজী, বদলোক।
- 'হর-' (প্রত্যেক বা সব অর্থে): হর-রোজ, হরদম, হরবেলা।
- 'বে-' (না, নিন্দনীয় অর্থে): বে-রসিক, বেনামী, বে-বন্দোবস্ত।
- 'ফি-' (প্রত্যেক অর্থে): ফি-বছর, ফি-দিন।
- 'না-' (নঞর্থে): না-মিষ্টি, নাবালক, না-হক।
- 'নিম-' (অর্ধেক অর্থে): নিমরাজি, নিম-খাসি।
- 'বর-' (উপরে বা বাইরে অর্থে): বরখাস্ত, বরবাদ।
- 'কার-' (কার্য অর্থে): কারখানা, কারবার।

ইংরেজি উপসর্গ

ফুল (full)– (পুরো অর্থে): ফুলটিফিন, ফুলবাবু, ফুলহাতা।

হেড (head)– (প্রধান অর্থে): হেড-অফিস, হেড-মাস্টার।

হাফ (half)– (অর্ধেক অর্থে): হাফ-টিকিট, হাফ-শার্ট।

সাব (sub)– (অধীন অর্থে): সাব-অফিস, সাব-জজ।

অনুসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাক্যের কোন পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। এ সব শব্দকে উনুসর্গ বলা হয়। অনুসর্গকে 'বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত পদ' বলা যেতে পারে। দ্বারা, দিয়ে, মধ্যে, কর্তৃক, থেকে– ইত্যাদি শব্দ অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ঘরের মধ্যেই শত্রু। বাড়ি থেকে দেখলাম।

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাক্যের কোন পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। এ সব শব্দকে উনুসর্গ বলা হয়।

অনুসর্গ পদটি যে পদটিকে সম্পর্কিত করছে, সেটি বিভক্তিযুক্ত কিংবা বিভক্তিহীন– দু-রকমই হতে পারে:

- বিভক্তিযুক্ত পদের সাথে অনুসর্গ: নিজে থেকে বলল। আমার থেকে বড়।
- বিভক্তিহীন পদের সঙ্গে অনুসর্গ: সব থেকে আপন। ছাদ থেকে দেখছে।

বাংলা অনুসর্গগুলিকে কারক অনুযায়ী ভাগ করা যায়। যেমন:

করণ কারকে: দিয়া, দিয়ে, দ্বারা, কর্তৃক, করে।

অপাদান কারকে: উপর, নিচে, পাছে, উপরে, আগে, আগেতে, পিছে, ভেতরে, মাঝে, মাঝ, বাইরে, বাহিরে ইত্যাদি।

নিমিত্ত কারকে : জন্য, নিমিত্ত, তরে, কারণে, হেতু।

ব্যতীত অর্থে : বিনা, বিহনে, বই, ছাড়া, বেগর ইত্যাদি।

সাহচর্য অর্থে : সাথে, সহিত, সঙ্গে, সনে ইত্যাদি।

দিক বোঝানোর জন্য : পানে, পাশে, পেছনে ইত্যাদি।

অব্যয় হিসেবে : বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়াও অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত। যেমনঃ দিয়া, দিয়ে, করে, করিয়া, হতে, থেকে, হইতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপসর্গ বলতে কী বোঝেন? উপসর্গ কয় প্রকার? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলা উপসর্গ কাকে বলে? প্রতিটির তিনটি করে উদাহরণ দিন।
৩. বিদেশী উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সাধারণত কোন কোন বিদেশী উপসর্গের ব্যবহার রয়েছে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
৪. সংস্কৃত উপসর্গ কাকে বলে? সংস্কৃত উপসর্গগুলো উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।
৫. অনুসর্গ বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৬. বাংলা অনুসর্গগুলিকে কি কারণ অনুযায়ী ভাগ করা যায়? ভাগ করা গেলে ভাগগুলো উল্লেখ করুন।
৭. বিভক্তিযুক্ত ও বিভক্তিহীন পদের অনুসর্গের উদাহরণ দিন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উপসর্গ কাকে বলে?
২. তৎসম উপসর্গ কি? দুটি উদাহরণ দিন।
৩. সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি? তিনটি উদাহরণ দিন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৮

যতি বা বিরাম চিহ্ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *বিরাম কী তা জানতে পারবেন।*
- *যতিচিহ্ন, বিরাম চিহ্ন ও ছেদচিহ্নের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।*
- *বাক্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার কিভাবে করতে হয় তা জানতে পারবেন।*

একটি বাক্যের অর্থ ঠিক মত বোঝানোর জন্য বাক্যের মধ্যে এক কিংবা একাধিক জায়গায় কম বেশি থামার দরকার হয়। এ ছাড়া বাক্যের শেষে তো থামতেই হয়। এই থামার সাধারণ নাম বিরাম। বিরাম দুরকমের– (ক) ছেদ এবং (খ) যতি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন প্রথমেই আমরা বিরাম কি তা জেনে নিই।

বিরাম: একটি বাক্যের অর্থ ঠিক মত বোঝানোর জন্য বাক্যের মধ্যে এক কিংবা একাধিক জায়গায় কম বেশি থামার দরকার হয়। এ ছাড়া বাক্যের শেষে তো থামতেই হয়। এই থামার সাধারণ নাম বিরাম। বিরাম দুরকমের– (ক) ছেদ এবং (খ) যতি।

নিচে ছেদ ও যতির বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

ক. **ছেদ:** বাক্য বলার সময়, তার অর্থবোধ হওয়ার জন্য কতকগুলি পদের পর কম কিংবা বেশি বিরাম দেয়া হয়। এই বিরামকে ছেদ বলা হয়। লিখিত বাক্যে এই বিরাম বোঝানোর জন্য ছেদচিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খ. **যতি:** যতি অর্থ বিরাম বা ছেদ। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ছন্দের কারণে যে বিরাম তাকে বলা হয় যতি।

বিরাম চিহ্ন বা ছেদচিহ্ন: লিখিত বাক্যে ছেদ বা বিরাম বোঝানোর জন্য যে সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণ নাম ছেদ চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন। এ ছাড়া প্রশ্নসূচক কিংবা বিস্ময়সূচক বাক্যে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাও ছেদ চিহ্নের অন্তর্গত। বাংলায় প্রথমে দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥) ছাড়া অন্য কোন ছেদ চিহ্ন ছিল না। পরে ইংরেজি থেকে অনেক ছেদচিহ্ন বাংলায় নেয়া হয়েছে।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি-চিহ্নের নাম ও আকৃতি দেয় হলো:

যতিচহ্নের নাম	আকৃতি
কমা বা পাদচ্ছেদ	,
সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ	;
কোলন	:
দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	।
প্রশ্ন চিহ্ন	?
বিস্ময় চিহ্ন বা ভাবদ্যোতক চিহ্ন	!
ড্যাশ	–
হাইফেন বা পদসংযোগ বা পদবিশ্লেষ চিহ্ন	-
কোটেশন বা উদ্ধৃতি বা উদ্ধরণ চিহ্ন	“”
ব্র্যাকেট বা বন্ধনী	( ), {}, []
বিন্দু	.

ছেদ চিহ্নকে দুটো শ্রেণীতে ফেলা যায়:

ক. প্রান্তিক ছেদ চিহ্ন অর্থাৎ বাক্য যেখানে শেষ হয় সেখানে দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন, দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খ. বাক্যান্তর্গত ছেদচিহ্ন অর্থাৎ যেখানে বাক্য শেষ হয় না সেখানে কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ, কোলনড্যাশ, হাইফেন, উর্ধ্বকমা, উদ্ধৃতিচিহ্ন, বিকল্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করি।

১. কমা বা পদচ্ছেদ (,): বাক্যের যেখানে সামান্য বিরতি দরকার হয়, সেখানে কমা বসে। এক (১) সংখ্যাটি উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে, কমা-চিহ্ন থাকলে ততটুকু থামতে হয়।

   নিম্নলিখিত স্থানে সাধারণত কমা (,) ব্যবহৃত হয়।

   - এক জাতীয় কয়েকটি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ এক সাথে বসলে সর্বশেষটির পূর্বে 'এবং', 'বা', 'ও' বসে। শেষের দুটি ছাড়া সব কয়টির পরে কমা বসাতে হয়; যথা– বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপান, ইটালী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়া প্রধান।
   - বাক্যে কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে সব কয়টির পরে কমা বসাতে হয়; যথা– শাওন বাসায় এসে, আহার করে, খেলা করতে মাঠে গেছে।
   - জটিল ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে প্রত্যেক খন্ড বাক্যের পরে কমা বসে; যথা– যদি তুমি আস, তাহলে আমি যাব।
   - সম্বোধন পদের পরে কমা বসে; যথা– শাওন, এদিকে এস।
   - উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসে; যথা– শিমু বলল, "আজ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব না।"
   - ঠিকানা লিখতে কমা ব্যবহার করতে হয়; যথা– এস.এস.এইচ.এল, বাউবি, গাজীপুর-১৭০৫।
   - তারিখ লিখতে মাসের নামের পরে কমা বসাতে হয়; যথা– ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

২. সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ (;): যেখানে 'কমা' অপেক্ষা বেশি সময় বিরতির দরকার হয়, সেখানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি খন্ডবাক্যের মাঝখানে সেমিকোলন (;) বসে। যথা– শাপলার মত শিমুও ভাল চাত্রী। কিন্তু শিমুর ব্যবহার খারাপ; তাই লোকের নিকট তার আদর নেই।

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।): যেখানে বাক্য সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়, সেখানে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে; যথা– শীতকালে বাংলাদেশের আবাহওয়া শুষ্ক থাকে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?): কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হয়। যথা– তোমার নাম কি? সে কি খাবে?

৫. বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!): যেখানে ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ পায়, সেখানে বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার হয়। হায়, অহো, আহা, ছি প্রভৃতি অব্যয়ের পর এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা– আহা! কি চমৎকার দৃশ্য!

   ছি! ছি! এমন কাজ কেউ করে!

৬. কোলন (:): এক বিষয় থেকে অপর বিষয়ের প্রয়োগ, পূর্ব কথার নতুন অবস্থা ইত্যাদির জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যথা– সভায় সিদ্ধান্ত হলো ঃ এক মাস পর নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৭. ড্যাশ (–): যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথকভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের যোগাযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা– তোমরা অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করে তোল– এতে তোমাদের সম্মান যাবে না– বাড়বে।

৮. কোলন ড্যাশ (:-): উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করলে অথবা স্পষ্ট কোন কিছু নির্ধারণ করলে কোলন ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যথা– ইসলামের পঞ্চভিত্তি ঃ- কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব ও যাকাত।

৯. হাইফেন (-): দুই বা ততোধিক পদ সমাসবদ্ধভাবে একপদীরূপে একত্রে সংযোগের জন্য পদের মধ্যে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যথা– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মাতা-পিতা।

১০. কোটেশন বা উদ্ধৃতি (“ ”): কারও উক্তি প্রকাশ করতে অথবা উদ্ধৃতাংশ বোঝাতে কোটেশন বা উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়। যথা– সে বলল, “আমি আজ সিঙ্গাপুর যাচ্ছি।”

১১. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন (), {}, []: এই তিনটি চিহ্নই গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– নদীয়ায় (বর্তমানে কুষ্টিয়া) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১২. বিন্দু (.): ইংরেজি সংক্ষিপ্ত নামের বাংলা প্রতিবর্ণিতরূপে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যথা– স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ-এর ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপ (SSHL)-এর বাংলা প্রতিবর্ণিতরূপ (এসএসএইচএল)। এসএসএইচএল-এ বিন্দুর যে ব্যবহার তা হলো– এস.এস.এইচ.এল।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরের যতিচিহ্ন ছাড়াও ব্যাকরণিক চিহ্ন আছে। যেমন:

- ধাতু বোঝাতে (√) চিহ্ন : √যা=যা ধাতু।
- পরবর্তী শব্দ থকে উৎপন্ন বেঝাতে (<) চিহ্ন ঃ জাঁদরেল < জেনারেল।
- পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন ঃ রাঁধনা>রান্না।
- সমান বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন ঃ পিতা ও মাতা = পিতামাতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যতি বা বিরাম চিহ্ন বলতে কি বোঝেন? বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিরাম বলতে কি বোঝেন? কয় প্রকার ও কি কি? বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা কি?
২. ড্যাশ, হাইফেন ও কোলন ড্যাশ ব্যবহারের পার্থক্য কি?
৩. বিন্দু কেন ব্যবহৃত হয়? ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন মূলত কোন শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়? বাংলা ভাষায় ব্র্যাকেট চিহ্নের প্রয়োগ দেখান।
৪. কমা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. দাঁড়ি, বিস্ময়সূচক চিহ্ন, সেমিকোলন ও প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার লিখুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

২

বাংলা শব্দসম্ভার

শব্দ হলো ভাষার প্রাণ। ভাষার কেন্দ্রে শব্দ অবস্থান করে। শব্দ ছাড়া কোন ভাষা কল্পনা করা যায় না। আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য প্রতিদিন অজস্র বাক্য ব্যবহার করে থাকি। সে বাক্যের মূলে থাকে শব্দ। শব্দই হচ্ছে বাক্যের গঠনগত মূল উপাদান। শব্দ সম্পদে বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি শাখা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর পার হয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বস্তুনিষ্ঠ ধারণা দেয়ার জন্য বাংলা শব্দ সম্ভারের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ ১. বাংলা শব্দসম্ভার ভূমিকা ও শ্রেণীকরণ
- পাঠ ২. বাংলা শব্দের শ্রেণীকরণ
- পাঠ ৩. বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া
- পাঠ ৪. বাংলা সমার্থক শব্দ : তালিকা
- পাঠ ৫. বাংলা বিপরীতার্থক শব্দ : সংজ্ঞার্থ, তালিকা
- পাঠ ৬. বাংলা নানার্থক শব্দ : সংজ্ঞার্থ, তালিকা
- পাঠ ৭. জোড়াশব্দ : সংজ্ঞার্থ, তালিকা
- পাঠ ৮. বাংলা পদ-পরিবর্তন : তালিকা
- পাঠ ৯. বাংলা প্রবাদ ও বাগধারা

পাঠ - ১

বাংলা শব্দ সম্ভার : ভূমিকা ও শ্রেণীকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের ভূমিকা বলতে পারবেন;*
- *শব্দের টোটেম ও ট্যাবু কাকে বলে তা বলতে পারবেন;*
- *বাংলা শব্দ সম্ভার সম্পর্কে বলতে পারবেন;*
- *শব্দের শ্রেণীকরণ করতে পারবে।*

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ অনুসারে শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে শব্দকে তুলনা করা হয়েছে তীর-এর সঙ্গে; যা শক্তিশালী এবং লক্ষভেদী, সেখানে বলা হয়েছে শব্দ হচ্ছে ধনুকের ছিলায় সংযুক্ত তীর, লক্ষ্যভেদে যার রয়েছে অসীম ক্ষমতা।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ অনুসারে শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম অর্থাৎ বিপুল ক্ষমতাধর সৃষ্টিকারী দেবতা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে শব্দকে তুলনা করা হয়েছে তীর-এর সঙ্গে; যা শক্তিশালী এবং লক্ষভেদী, সেখানে বলা হয়েছে শব্দ হচ্ছে ধনুকের ছিলায় সংযুক্ত তীর, লক্ষ্যভেদে যার রয়েছে অসীম ক্ষমতা। কিন্তু সাবধান! একবার হাত থেকে চলে গেলে অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত হলে সে তীর আর নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না। সুতরাং শব্দ ব্যবহারে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। শব্দের দ্বারা মানুষের অন্তরে প্রীতি যেমন সৃষ্টি করা যায় তেমনি শব্দই পারে তার তীক্ষ্ণ অপপ্রয়োগের দ্বারা শ্রোতাকে মর্মাহত করতে।

আমরা প্রতিদিন মনের ভাব প্রকাশের জন্য অজস্র বাক্য ব্যবহার করি; আর সে বাক্যের মূলে থাকে শব্দ। অর্থাৎ শব্দই হচ্ছে বাক্যের গঠনগত মূল উপাদান। অন্যভাবে বলা যায়, শব্দই হচ্ছে ভাষার মূল উপাদান। কারণ শব্দগুলো সম্মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে বাক্য, আর অসংখ্য বাক্য সৃষ্টি করে ভাষা। মনোভাব প্রকাশের প্রধান বাহন যে ভাষা তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম।

শব্দ থাকে মানুষের চেতনায়। কারণ শব্দগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনে যে অসংখ্য ভাব রয়েছে এবং আমাদের চারপাশের জগতে যে অগণিত বস্তুর সমাবেশ রয়েছে, তাদের প্রতীক। সোজা কথায় শব্দ হচ্ছে ভাব ও বস্তুর প্রতীক। প্রত্যেক ভাষা ব্যবহারকারীরই রয়েছে শব্দ সম্পর্কে এক ধরনের বিশেষ বোধ বা চেতনা। কোন শব্দ শোনা মাত্রই ব্যবহারকারীর চেতনায় ধরা দেয় ঐ শব্দ সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রকৃতি। যেমন কোন বাঙালি যখন 'গাছ' এই শব্দটি শোনে তখন মুহূর্তেই তার চেতনা জগতে একটি গাছের ছবি ভেসে ওঠে। তখনও কিন্তু ঐ গাছটি বিশেষিত নয়– তা হতে পারে যে কোন গাছের ছবি। কিন্তু যদি বলা হয় 'বটগাছ' তবে শ্রোতার মনে মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে যায় অন্য সব গাছের ছবি। তখন সে অভিজ্ঞতার জগত থেকে নির্বাচন করে নেয় বটগাছের ছবিকে। তারপর সব গাছ হারিয়ে গিয়ে কেবল একটি 'বটগাছের' ছবি ভেসে ওঠে তার চেতনায়।

সব শব্দই কিন্তু ব্যবহারকারীর চেতনায় এভাবে ছবি তৈরি করে না; মাঝে মাঝে ভাবের প্রকাশক হয়েও দেখা দেয় শব্দ। যেমন 'দুঃখ' শব্দটি বললে এক ধরনের বোধ শ্রোতার মনে জেগে উঠে, কোন ছবি নয়। 'যন্ত্রণা' বললে আবার ঐ বোধটিই পাল্টে যায়, অন্য এক ধরনের বোধ সৃষ্টি হয় শ্রোতার মনে। যদিও 'দুঃখ' এবং 'যন্ত্রণা' প্রায় সমার্থবোধক শব্দ।

শব্দের এই যে বিশেষ যোগ্যতা অর্থাৎ শব্দ শোনামাত্রই শ্রোতার মনে এক ধরনের ছবির সৃষ্টি বা ভাবের উদয় হয়, একে বলা হয় শব্দের আনুভূতিক উপাদান। শব্দ মানুষের মনে নানা অনুভূতি জাগাতে ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে পালন করে শক্তিশালী ভূমিকা। সুতরাং আমরা যখন শব্দ ব্যবহার করি, তখন কিন্তু শ্রোতার মনে কতকগুলো ছবি বা ভাবের সৃষ্টি করি, যা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করে।

শব্দের আবার কিছু টোটেম বা ট্যাবু থাকে। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর মনে আগে থেকেই কোন শব্দ সম্পর্কে থাকতে পারে বিশেষ বোধ, যা তাকে ঐ শব্দ ব্যবহারে লজ্জিত বা ভীত করতে পারে। যেমন, মানবদেহের বিশেষ কিছু প্রত্যঙ্গের নাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ ভাষা ব্যবহারকারীর মনে এক ধরনের লজ্জা বা দ্বিধা সৃষ্টি করতে পারে; যদিও 'হাত' ,'পা' ইত্যাদির মত ওগুলোও শারীরিক প্রত্যঙ্গের নাম। কিন্তু ব্যবহারকারীরা সচরাচর প্রকাশ্যে সেগুলো উচ্চারণ করেন না; কিংবা করলেও তা গালাগাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আবার কোন কোন শব্দের সঙ্গে অপশক্তির সম্পর্ক থাকে বলে এক ধরনের লোক– বিশ্বাস থাকে ব্যবহারকারীদের মনে। যেমন কোন এলাকায় বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে সাধারণ লোকেরা 'বসন্ত' না বলে বলে 'শেতলা দেবী' এসেছে। একই রকমভাবে 'কলেরা'কে বলে 'ওলাবিবি'। কারণ তাদের ধারণা বসন্ত বা কলেরা বললে রোগের প্রকোপ আরো বেড়ে যাবে বা অমঙ্গল হবে। এই মঙ্গল অমঙ্গলের ধারণার কারণেই অনেকে 'যাই' না বলে 'আসি' বলে; রাতের বেলায় 'সাপ'কে বলে 'পোকা', 'বাঘ'কে বলে 'বড় মিয়া', 'ঘরে চাল নেই' না বলে বলা হয় 'ঘরে চাল বাড়ন্ত'। শব্দের এ ধরনের টোটেম বা ট্যাবু পৃথিবীর সব ভাষাতেই লক্ষ করা যায়। তবে যাদের মধ্যে আদিম সংস্কার বেশি তাদের ভাষাতেই শব্দ ব্যবহারে টোটেম বা ট্যাবুর পরিমাণ বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যাকরণে শব্দ বলতে বোঝানো হয় এক অথবা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "বিশেষ বা স্বতন্ত্র পদার্থ বা ভাবকে প্রকাশ করে, মানব-মুখ নিঃসৃত এমন একটি ধ্বনিকে বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিকে (কিংবা তদ্রূপ ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টির লিখিত রূপকে) শব্দ (word) বলে;" যথা- এ; ও; কে; মা; ভাই; চাঁদ; হাত; পা; গাছ; গরু; সুখ; দুঃখ; জমি ইত্যাদি।

শব্দ গেঁথে গেঁথেই তৈরি হয় আমাদের কথার মালা। আবার অন্যভাবে বলা যায়, শব্দই হচ্ছে আমাদের চিন্তার বাহন। মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর এখানেই পার্থক্য, মানুষ চিন্তা করতে পারে, পরিকল্পনা করতে পারে এবং সে চিন্তা ও পরিকল্পনা অন্যকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু অন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রে তা হয় না। অনুভূতির জগতে মানুষ হয়তো সাধারণ বিবেচনায় অন্য প্রাণীর তুলনায় খুব বেশি স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু ভাষার শক্তির দ্বারাই মানুষ অন্য প্রাণীর ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং অক্ষুণ্ন রেখেছে। সুতরাং শব্দের জগতে মানুষ একচ্ছত্র ও স্বয়ম্ভূ।

বিশেষ বা স্বতন্ত্র পদার্থ বা ভাবকে প্রকাশ করে, মানব-মুখ নিঃসৃত এমন একটি ধ্বনিকে বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিকে (কিংবা তদ্রূপ ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টির লিখিত রূপকে) শব্দ বলে; যথা- এ; ও; কে; মা; ভাই; চাঁদ; হাত; পা; গাছ; গরু; সুখ; দুঃখ; জমি ইত্যাদি।

শব্দ সম্পদে আজ বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। এ অবস্থা কিন্তু এক দিনে হয় নি কিংবা বলা যায় সহজে হয় নি। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মাধ্যমে বাংলা ভাষা আজকের অবস্থায় পৌঁচছে। বাংলা ভাষার এ যাত্রাপথে সংযোগ ঘটেছে বহুভাষার, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এবং নানা পর্যায়ে আদান প্রদানের মাধ্যমে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই ভাষা সমৃদ্ধ হয়, পৃথিবীর সব ভাষা সম্পর্কেই এ কথা সমান সত্য। উদাহরণ হিসেবে ইংরেজি ভাষার শব্দ সম্ভারের কথা বলা যায়। ইংরেজি ভাষা শব্দ সম্পদের প্রাচুর্যে এবং ভাবপ্রকাশের সামর্থ্যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে একটি। কিন্তু ইংরেজি ভাষার শব্দ সম্ভারের দিকে তাকালে দেখা যাবে গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, জর্মন ইত্যাদি ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ ঋণ করে ও আত্তীকরণ করে আজ সে ধনী ভাষাগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে আমরা প্রধানত পাঁচভাগে বিভাজন করে থাকি। সেগুলো হচ্ছে ক. তৎসম খ. তদ্ভব গ. অর্ধ-তৎসম ঘ. দেশী ঙ. বিদেশী। বাংলা শব্দের এ ধরনের বিভাজনকে বলা হয় উৎসগত শ্রেণী বিভাগ।

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার প্রধানত পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা- ক. তৎসম খ. তদ্ভব গ. অর্ধ-তৎসম ঘ. দেশী ঙ. বিদেশী। বাংলা শব্দের এ ধরনের বিভাজনকে বলা হয় উৎসগত শ্রেণী বিভাগ।

বাংলা ভাষাতে যে বিচিত্র শব্দ রয়েছে তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। বাংলা ভাষার আদি উৎস হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা; অর্থাৎ ঐ ভাষা বংশের অন্তর্গত হচ্ছে বাংলা ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার একটি শাখা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর পার হয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আদিরূপ বা নমুনা দেখতে পাওয়া যায় বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায়। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার পর্যায় অতিক্রমের সময় বাংলা ভাষা প্রচুর শব্দ সংস্কৃত থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে নিয়ে এসেছে এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছে। ঐ সব সংস্কৃত শব্দকে তৎসব শব্দ বলা হয়।

আবার সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষা লাভ করেছে প্রাকৃতের মাধ্যমে, পরিবর্তিত রূপে। এ ধরনের শব্দকে বলে তদ্ভব শব্দ। যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে তাদেরকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। এদেশে আর্যদের আগমনের আগে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বসবাস করতো আর্যদের প্রভাব পৃথিবী থেকে তাদের অনেক কিছুকেই মুছে দিল। কিন্তু কিছু কিছু শব্দ বিলুপ্ত না হয়ে ঢুকে পড়ল বাংলা ভাষায়। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় দেশী শব্দ।

আর্যরা ছাড়াও এক সময় এদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল এবং দীর্ঘকাল এদেশে মুসলিম শাসনও প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম শাসকদের আনুকূল্যে এদেশে ইসলাম ধর্মমতের প্রভাব বিস্তার ঘটে। ফলে আরবি, পারসি, তুর্কি ভাষা থেকে ধর্মীয় কারণে এবং ব্যবসায়িক কারণে বাংলাভাষায় প্রচুর পরিমাণ শব্দ ঢুকে পড়ে। এ ধরনের শব্দগুলোকে আমরা বলি বিদেশী শব্দ। এর বাইরেও অনেক ভাষা, যেমন বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা থেকেও বাংলা ভাষায় প্রচুর শব্দ ঢুকে পড়েছে। বাংলা ভাষায় এখন এমন অনেক শব্দই আছে যেগুলোকে আজ আর বিদেশী শব্দ বলে মনেই হয় না, মনে হলেই বরং খটকা লাগে।

উৎসগত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আরো কয়েকভাবে বাংলা শব্দ সম্ভারকে বিভাজন করা যায়। বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য প্রকার শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আমরা বিস্তৃতভাবে পরবর্তী পাঠে আলোচনা করবো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের ভূমিকা কি? বাংলা ভাষার শব্দ কিভাবে গড়ে উঠেছে বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের ভূমিকা কী?
২. শব্দের টোটেম ও ট্যাবু সম্পর্কে আপনি কী জানেন? টোটেম বা ট্যাবুর ফলে যে সব শব্দ উচ্চারণে আমরা ভীত হই তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করুন।
৩. বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার কীভাবে গড়ে উঠেছে তা লিখুন।
৪. উৎসগত দিক থেকে বাংলা শব্দসম্ভারকে বিভাজন করুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ২

বাংলা শব্দের শ্রেণীকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *শব্দের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন;*
- *শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ বলতে পারবেন;*
- *শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন;*
- *শব্দের উৎসগত শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।*

বাংলা শব্দের নানা রকম শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। তবে প্রধানত শব্দকে তিনভাগে শ্রেণীবিভাগ করা হয়:

ক. গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ

খ. অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ

গ. উৎসগত শ্রেণীবিভাগ

বাংলা শব্দের নানা রকম শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। তবে প্রধানত শব্দকে তিনভাগে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যথা- গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ, অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ এবং উৎসগত শ্রেণীবিভাগ।

এবার আসুন উপর্যুক্ত তিন রকমের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি।

শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ

একটি শব্দ কীভাবে তৈরি হচ্ছে বা গঠিত হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে শব্দের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাকে বলা হয় শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ। নিচের রেখা চিত্রটি লক্ষ করুন–

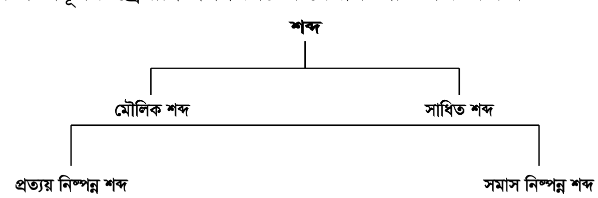

ওপরের রেখাচিত্রটি থেকে বোঝা যায় যে গঠনগত দিক থেকে শব্দকে দুইভাগে ভাগ করা যায় (ক) মৌলিক শব্দ (খ) সাধিত শব্দ। সাধিত শব্দ আবার গঠিত হতে পারে প্রত্যয়ের সাহায্যে, যেগুলোকে বলা হয় প্রত্যয় নিষ্পন্ন সাধিত শব্দ এবং সমাসের সাহায্যে, যাকে বলা হয় সমাস নিষ্পন্ন সাধিত শব্দ।

মৌলিক শব্দ ঃ যে সব শব্দকে খন্ডিত বা বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন– মা, নাক, ঘোড়া, বই, কলম, তিন ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ ঃ মৌলিক শব্দগুলো ছাড়া অন্য সব শব্দকে সাধিত শব্দ বলে। এ ধরনের শব্দের বিশ্লেষণ সম্ভব। আগেই বলেছি সাধিত শব্দ গঠিত হতে পারে প্রত্যয় ও সমাসের সাহায্যে। নিচে প্রত্যয় ও সমাসের সাহায্যে গঠিত সাধিত শব্দের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল–

প্রত্যয় নিষ্পন্ন সাধিত শব্দ

নাম প্রকৃতি	প্রত্যয়	সাধিত শব্দ
বোন	+আই	বোনাই
ডাক্তার	+ঈ	ডাক্তারী
বড়	+আই	বড়াই
বাঘ	+আ	বাঘা
মেঘ	+লা	মেঘলা

ক্রিয়া প্রকৃতি	প্রত্যয়	সাধিত শব্দ
কাঁদ্	+অন	কাঁদন
চাল্	+আন	চালান/চালানো
ঘাট্	+তি	ঘাটতি
রাঁধ্	+না	রাঁধনা > রান্না
ঝল্	+অক	ঝলক

সমাসনিষ্পন্ন সাধিত শব্দ

ব্যাসবাক্য	সাধিত শব্দ
রাত ও দিন	রাতদিন
যা কাঁচা তাই মিঠা	কাঁচামিঠা
মুখ চন্দ্রের ন্যায়	চন্দ্রমুখ
চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	চিরসুখী
মহান আত্মা যার	মহাত্মা

অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ

সাধিত শব্দের প্রচলিত অর্থ এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে মাঝে মাঝেই পার্থক্য দেখা যায়। এ ধরনের পার্থক্য হচ্ছে কিনা, এবং হলেও কীভাবে হচ্ছে, এই বিচারে শব্দকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শব্দের এ ধরনের বিভাগকে বলা হয় শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ। নিচের রেখাচিত্রটি লক্ষ করুন :

শব্দের প্রচলিত ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পার্থক্যের বিবেচনায় শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

ক. যৌগিক শব্দ খ. রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ গ. যোগরূঢ় শব্দ

এবার আসুন শব্দের এ তিন ধরনের বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করি এবং কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করি।

যৌগিক শব্দ ঃ যৌগিক শব্দগুলোর প্রচলিত ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। অর্থাৎ তাদের অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সুতরাং যে সব শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ীই হয়ে থাকে, তাদেরকে যৌগিক শব্দ বলা হয়। যেমন ঃ

যৌগিক শব্দ		প্রকৃতি+প্রত্যয়		অর্থ
বাবুয়ানা	=	বাবু + আনা	:	বাবুর ভাব
দৌহিত্র	=	দুহিতা + ষ্ণ্য	:	কন্যার পুত্র, নাতি
রাখাল	=	রাখ+আল	:	রক্ষা বা পালনকারী
চাঁদপানা	=	চাঁদ+পানা	:	চাঁদের মত
করণীয়	=	কৃ+অনীয়	:	যা করা উচিত
পাঠতব্য	=	পঠ্+তব্য	:	যা পড়া উচিত
বাঁদরামি	=	বাঁদর+আমি	:	বাঁদরের ভাব

এছাড়া মিতালি; অন্ডজ; মালগাড়ি; বৃক্ষ শাখা; জলজ; দক্ষতা ইত্যাদি।

এ সব শব্দে প্রকৃতি ও প্রত্যয় অনুযায়ীই নবগঠিত শব্দের অর্থ তৈরি হয়েছে তাই এগুলোকে যৌগিক শব্দ বলা হয়।

রূঢ়/রূঢ়ি শব্দঃ যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের কোন সম্পর্ক নেই, থাকলেও তা অতিদূরাগত, তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দে মূল শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ করার পর সাধারণত তা বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে। যেমন 'মন্ডপ' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'দেবালয়; অথবা 'ছাউনি' কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে মন্ড পান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সব শব্দকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলা হচ্ছে তার প্রকৃত অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের অনেক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নিচে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দের কিছু উদাহরণ দেয়া হল।

শব্দ		প্রকৃত অর্থ		প্রচলিত অর্থ
হরিণ	:	যে হরণ করে	:	পশু বিশেষ
মহাজন	:	মহান যে জন	:	পাওনাদার
বাঁশি	:	বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোন বস্তু	:	বিশেষ বাদ্যযন্ত্র
সন্দেশ	:	সংবাদ, খবর	:	মিষ্টান্ন বিশেষ
কুশল	:	যে কুশ আনে	:	মঙ্গল
ঝি	:	কন্যা	:	পরিচারিকা
প্রবীণ	:	বীণা বাজাতে পটু	:	বয়স্ক

এছাড়া তৈল, পাঞ্জাবী, প্রভৃতি শব্দকে রূঢ়/রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

যোগরূঢ় শব্দঃ অনেক সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একাধিক জিনিসকে বোঝাতে পারে, কিন্তু শব্দটি প্রচলিত অর্থের দ্বারা যদি তার মধ্যে কেবল একটিকেই বোঝায়, তবে তাকে বলে যোগরূঢ় শব্দ। সাধারণভাবে যোগরূঢ় শব্দগুলো সমাস নিষ্পন্ন শব্দ হয়ে থাকে এবং তা সমস্যমান পদগুলোর অনুগামী না হয়ে বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে থাকে। যেমন–'পঙ্কজ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পঙ্ক বা পাঁকে যা জন্মায়। পাঁকে অনেক কিছুই জন্মায়, পদ্ম তার মধ্যে একটি। কিন্তু পঙ্কজ বলতে এখন শুধু পদ্মকেই বোঝায়। তাই 'পঙ্কজ' একটি যোগরূঢ় শব্দ।

নিচে যোগরূঢ় শব্দের কিছু উদাহরণ দেয়া হলঃ

শব্দ		ব্যুৎপত্তিগত অর্থ		বিশিষ্টার্থক অর্থ
জলদ	:	যা জল দেয়	:	মেঘ
তুরঙ্গম	:	যা তাড়াতাড়ি যায়	:	ঘোড়া
আদিত্য	:	অদিতির পুত্র বা সব দেবতা	:	সূর্য
রাজপুত	:	রাজার পুত্র	:	জাতি বিশেষ
মহাযাত্রা	:	মহা সমারোহে যাত্রা	:	মৃত্যু
মন্দির	:	যে কোন গৃহ	:	দেবালয়
অন্ন	:	যা খাওয়া হয়	:	ভাত
সম্বন্ধী	:	সম্পর্কিত	:	স্ত্রীর বড় ভাই

একইভাবে নীরদ, জলধি, বাউল প্রভৃতি শব্দকে যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

উৎসগত শ্রেণীবিভাগঃ পৃথিবীর সব প্রকার ঋণেই মর্যাদা বিনষ্ট হয়, একমাত্র ভাষার ঋণে ভাষা সমৃদ্ধ হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে যত ভাষা প্রচলিত রয়েছে তার সবগুলোই তার প্রাথমিক অবস্থায় হয়তো অত্ম সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। কালক্রমে ঐ ভাষা ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন বেড়েছে, বলবার কথা বেড়েছে, অনুভূতির জগত সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে নিজের ভাষার শব্দে যখন তার প্রয়োজন মেটে নি তখন সে মুক্ত হাতে, মুক্ত মনে অন্য ভাষার শব্দ থেকে অকুণ্ঠ ঋণ গ্রহণ করেছে। বেড়ে উঠেছে ঐ ভাষার শব্দ সঞ্চয়, গড়ে উঠেছে নতুন সম্ভার। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারও গড়ে উঠেছে ঐ একই নিয়ম অনুসরণ করে। বাংলা ভাষার গোড়াপত্তনের যুগে যে শব্দগুলো নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা

প্রয়োজনে, বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে এর সংস্পর্শের ফলে বাংলা শব্দ সম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কিদের আগমন ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ আরবি ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন নিয়ে বসেছে। মুসলিম শাসন অবসানের পর ইংরেজ আগমন এবং দীর্ঘ প্রায় দু'শো বছর বাংলাদেশ ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকায় নানা প্রয়োজনে প্রচুর ইংরেজি শব্দও বাংলা ভাষাতে ঢুকে পড়েছে। আর এভাবেই কয়েক হাজার শব্দ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার। ভাষা বিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষার বিপুল বিশাল শব্দ সম্ভারকে তাদের উৎস অনুযায়ী প্রধানত ৫ (পাঁচ) ভাগে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে:

১. তৎসম শব্দ
২. তদ্ভব শব্দ
৩. দেশী শব্দ
৪. অর্ধ-তৎসম শব্দ
৫. বিদেশী শব্দ।

এবারে আসুন উপর্যুক্ত শ্রেণীভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

তৎসম শব্দ: যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে এবং যাদের বানান রূপ বাংলা ভাষায় অপরিবর্তিত রয়েছে তাকে তৎসম শব্দ বলে। 'তৎসম' একটি পারিভাষিক শব্দ এর অর্থ হচ্ছে ,'তৎ' অর্থাৎ 'তার'+সম অর্থাৎ 'সমান'= তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত। বাংলা ভাষায় অসংখ্য তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা অভিধানে শতকরা ৪৪টি তৎসম শব্দ পাওয়া যায় বলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Origin and Development of Bengali Language (ODBL)-এ দেখিয়েছেন। তবে চলিত ভাষায় কিংবা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে তৎসম শব্দের সংখ্যা অতো বেশি নয়। নিচে কতিপয় তৎসম শব্দ উদাহরণ হিসেবে দেখানো হলো–

যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে এবং যাদের বানান রূপ বাংলা ভাষায় অপরিবর্তিত রয়েছে তাকে তৎসম শব্দ বলে।

ব্যাঘ্র; গুণী; ধর্ম; অংশু; নদী; দুর্গা; পুষ্প; সূর্য; চন্দ্র; নক্ষত্র; মেঘ; পত্র; পল্লব; যন্ত্র, সন্ধ্যা; মধ্যাহ্ন; অপরাহ্ন; স্নেহ; প্রেম প্রভৃতি।

তদ্ভব শব্দ: যে সব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তনের ধারায় এক সময় প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরে আবারও পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব শব্দগুলো বাংলা ভাষার জন্মকাল থেকেই এর সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এসেছে। সেই জন্মকালেই এদেরকে সংস্কৃতের সন্তান বলে চেনা যেত না, তাদের চেহারা এতোটাই বদলে গিয়েছিল। যেমন সংস্কৃতে যদি পাওয়া যায় 'মধ্য' তবে প্রাকৃতে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেই সেটা হয়ে গিয়েছিল 'মজঝ', আর বাংলাতে সেই কবেই হয়ে গিয়েছিল 'মাঝ'। 'তদ্ভব' শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে অন্তত দু'বার বদলানো শব্দ– একবার প্রাকৃতে, পরে বাংলায়। নিচে তদ্ভব শব্দের কতিপয় উদাহরণ দেয়া হল:

যে সব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তনের ধারায় এক সময় প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরে আবারও পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ।

<u>সংস্কৃত রূপ</u>	<u>প্রাকৃত রূপ</u>	<u>বাংলা রূপ</u>
কৃষ্ণ	কন্হ	কানু (কান+উ), কানাই (কান+আই)
রাধিকা	রাহিআ	রাই
চন্দ্র	চান্দ	চাঁদ
বধূ	বহু	বউ
হস্ত	হত্থ	হাত
চর্মকার	চম্মআর	চামার

দেশী শব্দ: বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলা ভাষায় রক্ষিত হয়েছে। এদেশের সংস্কৃতির মত বাংলা ভাষাও তাদের সম্পদে সমৃদ্ধ ও গর্বিত। বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো এদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী কোল, ভিল, শবর, সাঁওতালদের ভাষা থেকে

এসেছে, কিংবা এমন অনেক শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় যাদের মূল উৎস জানা যায় না, এমন শব্দগুলোকে বলে দেশী শব্দ। মূল উৎস জানা যায় না বলে এদেরকে কেউ কেউ অজ্ঞাতমূল শব্দও বলে থাকেন। মূল উৎস জানা না গেলেও কোন কোন শব্দ কোন আদিম অধিবাসীদের ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে তা মাঝে মাঝে জানা যায়। যেমন:

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলা ভাষায় রক্ষিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো এদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী কোল, ভিল, শবর, সাঁওতালদের ভাষা থেকে এসেছে, কিংবা এমন অনেক শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় যাদের মূল উৎস জানা যায় না, এমন শব্দগুলোকে বলে দেশী শব্দ।

শব্দ		কোন ভাষা থেকে এসেছে
কুড়ি (বিশ)	:	কোল ভাষা
পেট (উদর)	:	তামিল ভাষা
চুলা (উনুন)	:	মুন্ডারী ভাষা

এছাড়া কুলা; খোকা; গাড়ি; চিংড়ি; ছানা; ঝাঁটা; ডবকা; ডাহা; ঢেঁকি; ঢেউ; পাঁঠা; বাদুর; বিটকেল; মুড়ি; ডাব; টোপর; চোঙ্গা ইত্যাদি দেশী শব্দ বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত হয়।

অর্ধ-তৎসম শব্দ: অর্ধ-তৎসম শব্দ হচ্ছে সেই সব শব্দ যেগুলোর মূল সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলাতে রক্ষিত হয় নি এবং তাদের বানানও লেখা হয় পরিবর্তিত উচ্চারণ অনুযায়ী। এ ধরনের শব্দ সংস্কৃত থেকে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় ব্যবহৃত হয় বলে তাকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন সংস্কৃত শব্দ 'প্রীতি' বাংলায় 'পিরিতি'; সংস্কৃত শব্দ 'বর্ষণ' বাংলায় 'বরষণ'; সংস্কৃত শব্দ 'অব্যঢ়' বাংলায় 'আইবুড়ো' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ-তৎসম শব্দের ব্যবহার মুখের কথা এবং কাব্যেই বেশি দেখা যায়। নিচে আরো কিছু অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ দেয়া হল:

অর্ধ-তৎসম শব্দ হচ্ছে সেই সব শব্দ যেগুলোর মূল সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলাতে রক্ষিত হয় নি এবং তাদের বানানও লেখা হয় পরিবর্তিত উচ্চারণ অনুযায়ী।

সংস্কৃত	অর্ধ-তৎসম
জোৎস্না	জোছনা
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ
গৃহিণী	গিন্নী
কুৎসিত	কুচ্ছিত
ভক্তি	ভকতি
রৌদ্র	রোদ, রোদ্দুর
ত্রাস	তরাস
দর্শন	দরশন
জন্ম	জনম
স্বস্তি	সোয়াস্তি

বিদেশী শব্দ: ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা কারণে, গড়ে উঠেছিল বিদেশী ও বিভাষীদের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক। তবে প্রধানত রাজনীতি, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই ঐ সব সম্পর্কের সূত্রপাত ও বিকাশ। পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলা ভাষাতে চলে এসেছে নানা ভাষার অনেক শব্দ এবং বাংলা শব্দ সম্ভারে একটি জায়গা তারা করে নিয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ঐসব শব্দকে বলা হয় বিদেশী শব্দ। বাংলা ভাষায় যে সব বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয় নমুনা হিসেবে নিচে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হল:

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা কারণে, গড়ে উঠেছিল বিদেশী ও বিভাষীদের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক। পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলা ভাষাতে চলে এসেছে নানা ভাষার অনেক শব্দ এবং বাংলা শব্দ সম্ভারে একটি জায়গা তারা করে নিয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ঐসব শব্দকে বলা হয় বিদেশী শব্দ।

ক. আরবি শব্দ : অছি; আক্কেল; ইমারত; ইশারা; খালি; জলসা; ফোয়ারা; মক্কেল; রাজি; শহীদ; হজম; হিসাব; খারিজ; নগদ; বাকি; ঈদ; উকিল; হারাম; হালাল; তসবিহ ইত্যাদি।

খ. ফারসি শব্দ : নামাজ; খোদা; ফেরেশতা; কারখানা; চশমা; তারিখ; দস্তখত; দফতর; বেগম; অজুহাত; অন্দর; আপস; কারবার; খরচ; চাবুক; চেহারা; দাবী; পোশাক; বরফ; হরদম ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ : অফিস; ইস্কুল; চেয়ার; কমা; ফুটবল; লাইব্রেরি; পাউডার; গারদ; গেলাস; টাইপ; টেবিল; ডাক্তার; নম্বর; বাক্স; হাসপাতাল; ইউনিভার্সিটি; কলেজ; বোতল ইত্যাদি।

ঘ.	পর্তুগিজ শব্দ	:	আচার; আতা; ইস্পাত; কামরা; গামলা; গির্জা; তামাক; তোয়ালে; পাউরুটি; পেরেক; বালতি; বেহালা; মিস্ত্রি; সাবান ইত্যাদি।
ঙ.	ফরাসি শব্দ	:	কার্তুজ; কুপন; রেস্তরাঁ, ডিপো ইত্যাদি।
চ.	জর্মন শব্দ	:	নাৎসি; কিন্ডারগার্টেন।
ছ.	স্পেনীয়	:	ডেঙ্গু।
জ.	ওলন্দাজ	:	ইসকাপন; টেক্কা; তুরুপ; রুইতন; হরতন ইত্যাদি।
ঝ.	রুশ	:	বলশেভিক; স্পুটনিক।
ঞ.	জাপানি	:	টাইফুন; হাসনুহানা; রিক্সা; হারিকিরি ইত্যাদি।
ত.	চৈনিক	:	চা; চিনি; লিচু।
থ.	মালয়ি	:	কাকাতুয়া।
দ.	সিংহলি	:	বেরিবেরি।
ধ.	বর্মি	:	লুঙ্গি।
ন.	হিন্দি	:	আলাল; ইস্তক; কচুরি; কাহিনী; চাহিদা; ঝান্ডা; বন্ধ; লোটা ইত্যাদি।
ট.	গুজরাতি	:	গরবা; তকলি; হরতাল।
ঠ.	মারাঠি	:	বর্গি।
ড.	তামিল	:	চুরুট।
ঢ.	তেলুগু	:	প্যান্ডেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
২. শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দিন।
৩. শব্দের উৎসগত শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শব্দের কত রকম শ্রেণীবিভাগ হতে পারে? সেগুলো কী কী?
২. তৎসম শব্দ বলতে কি বোঝেন?
৩. তদ্ভব শব্দ বলতে কি বোঝেন?

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *প্রত্যয়ের সাহায্যে কীভাবে শব্দ গঠন করা হয় তা বলতে পারবেন;*
- *সমাসের সাহায্যে নতুন শব্দ কীভাবে সৃষ্টি হয় তা দেখাতে পারবেন;*
- *উপসর্গের সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

বাংলা ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো মৌলিক শব্দ অথবা সাধিত শব্দ। মৌলিক শব্দগুলোকে কোনভাবেই আর বিভাজন করা যায় না। কারণ সেগুলোই হচ্ছে শব্দের আদি অবস্থা। কিন্তু শব্দ সাধিত হতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে। শব্দ গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাতে প্রধানত প্রত্যয়ের মাধ্যমে, সমাসের মাধ্যমে এবং উপসর্গের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। উপসর্গ ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। প্রত্যয় ধাতু বা প্রকৃতির পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। আর সমাস একাধিক শব্দের মিলন ঘটিয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। নিচে শব্দ গঠনের ঐ প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠনের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রত্যয়; প্রত্যয়ের সাহায্য নিয়ে একটি শব্দকে নতুন নতুন চেহারা দেয়া যায় আর সে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে তার অর্থেরও। প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠনের একটি সাধারণ সূত্র হচ্ছে: (উপসর্গ) + ধাতু/ প্রকৃতি + প্রত্যয় = নতুন শব্দ।

প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দ গঠন: ধাতুর সঙ্গে যা যোগ করে শব্দ অথবা ক্রিয়ার কাল রূপে, এবং শব্দের সঙ্গে যা যোগ করে অন্য পৃথক শব্দ হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যয়। বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠনের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রত্যয়; প্রত্যয়ের সাহায্য নিয়ে একটি শব্দকে নতুন নতুন চেহারা দেয়া যায় আর সে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে তার অর্থেরও। প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠনের একটি সাধারণ সূত্র হচ্ছে:

(উপসর্গ) + ধাতু/ প্রকৃতি + প্রত্যয় = নতুন শব্দ।

কোন একটি শব্দ গঠন করতে গিয়ে তার সঙ্গে উপসর্গ যোগ করার প্রয়োজন হলে করতে হবে, অন্যথায় তা অদরকারী। এ কারণে উপসর্গকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু নতুন শব্দ গঠন করতে হলে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধাতু এবং অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে প্রকৃতি হবে মূল অংশ এবং অত্যাবশ্যকীয়। যেমন:

কৃ+অন = করণ (ধাতু + প্রত্যয়)

বি-কৃ+অন = বিকরণ (উপসর্গ+ধাতু+প্রত্যয়)

যশস্+বিন=যশস্বী (প্রকৃতি+প্রত্যয়)

এক অর্থে উপসর্গ প্রত্যয়ের কাজই করে থাকে; তবে উপসর্গ ব্যবহৃত হয় মূল শব্দের পূর্বে আর প্রত্যয় মূল শব্দের পরে। কখনও কখনও একাধিক প্রত্যয় যুক্ত হয়েও একটি নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে। যেমন–

দৃশ্+ইন্ = দর্শী, এখানে দৃশ্ ধাতুর সঙ্গে ইন্ প্রত্যয় যোগ করে একটি শব্দ 'দর্শী' তৈরি হয়েছে। এবার 'দর্শী'-এর সঙ্গে নতুন আরেকটি প্রত্যয় যোগ করে আমরা পেতে পারি আরেকটি শব্দ:

দর্শী+তা = দর্শিতা (দৃশ্+ইন্+তা)

সুতরাং 'দর্শিতা' শব্দটি পাওয়া গেছে 'দৃশ' ধাতুর সঙ্গে 'ইন' ও 'তা' প্রত্যয় দুটো যোগ করে।

প্রত্যয় কত ভাবে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে 'ধাতু' ও 'প্রকৃতি' সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নিয়ে নেয়া যাক।

ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু।

ধাতু : একটি ক্রিয়াপদকে বিভাজন করলে তার দুটো অংশ পাওয়া যায়। যথা- (ক) ক্রিয়ামূল বা ধাতু (খ) ক্রিয়াবিভক্তি। সোজা কথায় ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু। যেমন:

করি (ক্রিয়াপদ)

কর (ক্রিয়ামূল/ধাতু) **ই (ক্রিয়াবিভক্তি)**

ধাতু বা ক্রিয়ামূল চেনার একটি সহজ উপায় হচ্ছে বর্তমানকালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ আর ধাতুর রূপ এক। যেমন 'তুই' এই সর্বনামটি মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপ। এর সঙ্গে বর্তমান কালে ক্রিয়ার যে রূপ ব্যবহৃত হবে তাকেই বলা হয় ধাতু। 'তুই' এর সঙ্গে বর্তমান কালে কর্, খা, যা, ডাক্, দেখ্, লেখ্ প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এসব ক্রিয়ারূপকে আমরা ধাতু বলতে পারি।

মৌলিক শব্দের যে অংশকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয় প্রকৃতি। 'শব্দ' অথবা 'পদ' থেকে বিভক্তি সরিয়ে নিলে প্রকৃতি অংশ পাওয়া যায়।

প্রকৃতি : মৌলিক শব্দের যে অংশকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয় প্রকৃতি। 'শব্দ' অথবা 'পদ' থেকে বিভক্তি সরিয়ে নিলে প্রকৃতি অংশ পাওয়া যায়। নিচের বাক্যগুলো লক্ষ্য করুন।

তিনি <u>ডাক্তারি</u> ভালই জানেন।

<u>ঢাকাই</u> শাড়ির কোন তুলনা নেই।

এসব <u>সেকেলে</u> কথা।

বাক্য তিনটির তিনটি দাগ দেয়া শব্দের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; ডাক্তারি; ঢাকাই; সেকেলে। শব্দগুলো তৈরি হয়েছে এভাবে :

		ডাক্তার	+	ই	
প্রকৃতি	→	ঢাকা	+	আই	← প্রত্যয়
		সেকাল	+	এ	

এখানে ডাক্তার; ঢাকা; সেকাল শব্দ তিনটিকে আর কোনভাবেই বিভাজন করা সম্ভব নয় অর্থাৎ বিভাজন করলে মূল অর্থ রক্ষিত থাকবে না। সে কারণে এগুলোকে প্রকৃতি বলা হয়।

সাধারণভাবে ধাতু ও প্রকৃতির সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় ও সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়। ধাতুর সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ তৈরি করা হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। আর কৃৎ প্রত্যয়যোগে তৈরি শব্দকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ। আর শব্দের সঙ্গে যা যোগ করে অন্য শব্দ তৈরি করা যায়, তাকে বলা হয় তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎ-প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : বাংলা

১. অন্-প্রত্যয় : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন √কাঁদ+অন = কাঁদন, √নাচ্+অন=নাচন। একই ভাবে বাড়ন, ঝুলন, দোলন ইত্যাদি।

২. অনা-প্রত্যয় : √ দুল্+অনা = দুল্না > দোলনা; √খেল+অনা = খেলনা।

৩. অন্ত-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে সাধারণত 'অন্ত' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন– √চিল্+অন্ত= চলন্ত; √ডুব+অন্ত = ডুবন্ত।

৪. আই-প্রত্যয় : ভাব বাচক বিশেষ্য গঠনে 'আই' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন– √চড়+আই= চড়াই; √মিল+আই = মিলাই।

৫. আনি-প্রত্যয় : বিশেষ গঠনে আনি প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন– √শুন্+আনি = শুনানি; উড়্+আনি=উড়ানি।

একইভাবে আও (√চড়+আও=চড়াও); আন (√মান+আন=মানান) আরি (√ডুব+আরি=ডুবারি/ ডুবুরি); আল (√মাত্+আল= মাতাল); ই(√ভাজ্+ই=ভাজি); তি (√ঘাট্+তি = ঘাটতি); তা (√ ফির্+তা = ফিরতা>ফেরতা) প্রভৃতি বাংলা প্রত্যয় যোগ করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করা হয়।

কৃৎ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : সংস্কৃত

১. ক্ত-প্রত্যয় : √ মুচ্+ক্ত = মুক্ত; √সিচ্+ক্ত = সিক্ত; √পিঠ্+ক্ত = পঠিত; √ভুজ্+ক্ত=ভুক্ত ইত্যাদি।
২. ক্তি-প্রত্যয় : √গম্+ক্তি = গতি; √মন+ক্তি=মতি।
৩. তৃচ্-প্রত্যয় : √দা+তৃচ্=দাতা; √মা+তৃচ্ = মাতা।
৪. ণক-প্রত্যয় : √পঠ্+ণক = পাঠক; √গৈ+ণক = গায়ক।
৫. ইন প্রত্যয় : √শ্রম্+ইন্ = শ্রমী।

একইভাবে তব্য (√কৃ+তব্য = কর্তব্য); য (√হা+য = হেয়); অচ্ (√জি+অচ্=জয়); ইষ্ণু (√চল+ইষ্ণু=চলিষ্ণু); শানচ (দীপ+শানচ্ = দীপ্যমান) প্রভৃতি সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে বাংলাতে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ : বাংলা

১. আ-প্রত্যয় : চোর+আ = চোরা; বাঘ+আ=বাঘা; জল+আ=জলা। একইভাবে কেষ্টা; হাতা; রোগা; চোখা; হাজিরা প্রভৃতি।
২. আই-প্রত্যয় : বড়+আই = বড়াই; কান+আই = কানাই; মিঠা+আই = মিঠাই। একইভাবে নিমাই; বোনাই; পাবনাই; মোগলাই; চোরাই প্রভৃতি।
৩. আমি/আম/আমো/মি প্রত্যয় : ইতর+আমি = ইতরামি; ঠক+আমো=ঠকামো; জেঠা+মি= জেঠামি। একইভাবে ফাজলামো; ঘরামি; ছেলেমি প্রভৃতি।
৪. ই/ঈ প্রত্যয় : ডাক্তার+ঈ = ডাক্তারী; জমিদার+ই= জমিদারি; রেশম+ঈ = রেশমী। একইভাবে পোদ্দারী; ব্যাপারী; মাদ্রাজী; সরকারী প্রভৃতি।
৫. উক প্রত্যয় : লাজ+উক = লাজুক; মিশ+উক = মিশুক; মিথ্যা+উক = মিথ্যুক।

এছাড়াও ইয়া (পাথর+ইয়া = পাথরিয়া > পাথুরে); উয়া (বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো); উ (ঢাল+উ = ঢালু); আরি (ভিখ+আরি = ভিখারি); লা (মেঘ + লা = মেঘলা) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ : সংস্কৃত

ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ইত, ইমন্, ইল, ইষ্ঠ, ঈন, তর, তম, তা, ত্ব, নীন, নীয়, বতুপ, বিন্, র, ল প্রভৃতি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যে সকল শব্দ গঠিত হয় সেগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এখানে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে গঠিত কিছু শব্দের উদাহরণ দেয়া হল।

১. ষ্ণ-প্রত্যয় : নগর+ষ্ণ = নাগর; মধুর+ষ্ণ = মাধুর্য; সর্বভূমি+ষ্ণ = সার্বভৌম; মনু+ষ্ণ = মানব ইত্যাদি।
২. ইত-প্রত্যয় : কুসুম+ইত = কুসুমিত; কন্টক+ইত = কন্টাকিত; তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত ইত্যাদি।
৩. ইমন্-প্রত্যয় : নীল+ইমন্ = নীলিমা; মহৎ+ইমন্ = মহিমা।
৪. তা ও ত্ব-প্রত্যয় : বন্ধু+তা = বন্ধুতা; শত্রু+তা = শত্রুতা; বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব; শত্রু+ত্ব = শত্রুত্ব।
৫. ষ্ণিক-প্রত্যয় : সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক; বেদ+ষ্ণিক=বৈদিক; নগর+ষ্ণিক = নাগরিক; আকস্মাৎ + ষ্ণিক = আকস্মিক ইত্যাদি।
৬. নীন্(ঈন্) প্রত্যয় : সর্বজন+নীন্ = সর্বজনীন; কুল+নীন্=কুলীন; নব+নীন্=নবীন ইত্যাদি।

সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন

ধাতু ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়। একাধিক শব্দ একসঙ্গে যোগ করে একটি শব্দ সৃষ্টি করাকে বলা হয় সমাস। সুতরাং বাংলাতে সমাসের সাহায্যেও নতুন শব্দ গঠিত হয়।

ধাতু ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়। একাধিক শব্দ একসঙ্গে যোগ করে একটি শব্দ সৃষ্টি করাকে বলা হয় সমাস। সুতরাং বাংলাতে সমাসের সাহায্যেও নতুন শব্দ গঠিত হয়।

সমাস কীভাবে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে সমাস সম্পর্কিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিভাষা জেনে নেয়া দরকার। নিচের রেখাচিত্রটি লক্ষ করুন:

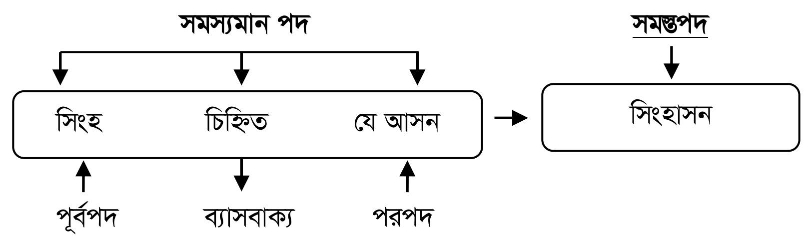

সমস্যমান পদ : যে সব পদ একত্রিত হয়ে সমাস তৈরি করে তাকে বলা হয় সমস্যমান পদ। এখানে সিংহ, চিহ্নিত ও আসন সমস্যমান পদ।

ব্যাসবাক্য : যে বাক্য অথবা বাক্যাংশ দিয়ে সমস্যমান পদগুলোর পরস্পর সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে বলে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য। এখানে 'সিংহ চিহ্নিত যে আসন' হচ্ছে ব্যাসবাক্য।

পূর্বপদ ও পরপদ : সমস্তপদের প্রথম পদটিকে বলা হয় পূর্বপদ ও পরেরটিকে পরপদ। এখানে 'সিংহ' পূর্বপদ এবং 'আসন' পরপদ।

সমস্তপদ : সমাস হতে সৃষ্ট নতুন শব্দকে সমস্তপদ বলে।

সমাসের গঠন, এবং পূর্ব ও উত্তরপদের পরস্পর সম্পর্ক ও সমস্তপদের অর্থ অনুযায়ী সমাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে– ১. দ্বন্দ্ব সমাস ২. তৎপুরুষ সমাস ৩. কর্মধারয় সমাস ৪. দ্বিগু সমাস ৫. বহুব্রীহি সমাস ৬. অব্যয়ীভাব সমাস।

সমাসের এ ধরনের বিভাজন করা হয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে। তবে বাংলা ব্যাকরণে এ শ্রেণীবিভাগই মেনে চলা হয়।

বাংলা ভাষার একটি বড় সুবিধা হচ্ছে সব প্রকার শব্দের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগের দ্বারা সমস্তপদের সৃষ্টি হতে পারে। প্রাকৃতজ, দেশী, তৎসম, অর্ধতৎসম এমন কী বিদেশী শব্দের সঙ্গেও বাংলা শব্দের সমাস সাধিত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী অবশ্য এ ধরনের সংযোগ অশুদ্ধ বলে অনেকেই তা পছন্দ করেন না এবং ব্যঙ্গ করে 'মড়া-দাহ, শব-পোড়া' বলে ব্যঙ্গ করে থাকেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী অশুদ্ধ হলেও চাঁদ-মুখ (প্রাকৃতজ+সংস্কৃত); শ্বশুরবাড়ি (তৎসম+প্রাকৃতজ); গিন্নী-মা (অর্ধ-তৎসম+প্রাকৃতজ); হাট বাজার, বড় লাট (প্রাকৃতজ+বিদেশী) এ ধরনের সমাস সাধিত শব্দ বাংলা ভাষা গ্রহণ করে নিয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার সমাসের মাধ্যমে গঠিত নতুন শব্দের নমুনা

দ্বন্দ্ব সমাস: 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ 'জোড়া'। দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের প্রাধান্য যে সমাসে অক্ষুণ্ন থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসের সাহায্যে গঠিত শব্দের কতিপয় নমুনা: মা-বাবা, ভাই-বোন; বৌ-ঝি; সকাল-সন্ধ্যা; ইট-কাঠ; পাপ-পুণ্য; চরাচর; গুরুশিষ্য; ভালমন্দ; দাস-দাসী; রুই-কাতলা; রাঘব-বোয়াল; আসা-যাওয়া; আইন-কানুন; লোক-লস্কর;পাইক-পেয়াদা; আগে-পিছে; বুকে-পিঠে; চুরি-চামারি; আসল-নকল ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাসঃ তৎপুরুষ সমাসে পরস্পর সম্পর্কিত দুটি পদ থাকে; দুটি পদই বিশেষ্য হতে পারে; তার মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির অর্থ-সীমাবদ্ধ করে দেয়। তাছাড়া এ সমাসে দ্বিতীয় পদটির অর্থই প্রাধান্য পায় এবং দ্বিতীয় থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোন বিভক্তি লোপ পেয়ে সমস্ত পদের সৃষ্টি হয়। তৎপুরুষ সমাসের সাহায্যে গঠিত কয়েকটি শব্দের নমুনা:

ঘর-পোড়া; গা-টেপা; গা-ধোয়া; গাঁট-কাটা; বাসন-মাজা; রথ-দেখা; কলা-বেচা; ভুঁই-ফোঁড়; মন-গড়া; জ্ঞানশূন্য; রান্নাঘর; পাগলাগারদ; বিলাতফেরত; শ্বশুরবাড়ি; বিশ্বখ্যাত; বস্তাপচা; অকাতর; নাতিদীর্ঘ; অমানুষ; জলচর ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাসঃ এ শ্রেণীর সমাসে, প্রথম পদটি দ্বিতীয়টির বিশেষণ রূপে অবস্থান করে এবং দ্বিতীয় পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। কর্মধারয় সমাসের সাহায্যে গঠিত কয়েকটি শব্দের নমুনা :

রক্তকমল; চালাকচতুর; মহাকীর্তি; মহানবী; কদর্থ; কদাচার; টাটকা-ভাজা; হৃষ্টপুষ্ট; নীল-লোহিত; ঠাকুর-দাদা; রাজা-বাহাদুর; পিতৃদেব; বিদ্যাসর্বস্ব; কালকূট; তেল-পোড়া; হলুদ-বাটা; তুষারশীতল; বিষাদসিন্ধু; প্রাণপাখি; করপল্লব ইত্যাদি।

দ্বিগুসমাসঃ যে সমাসে প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হয় এবং সমস্ত পদটি সমাহার বা সমষ্টি অর্থ-প্রকাশ করে তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বি(দুই) গো(গরু)'র সমাহার= দ্বিগু। এই শব্দটি থেকে এই সমাসের নাম হয়েছে। দ্বিগু সমাসের সাহায্যে গঠিত কয়েকটি শব্দের নমুনা:

পঞ্চবটী; নবান্ন; ত্রি-জগৎ; ত্রি-মূর্তি; চৌমুহনী; চার-চোখ; পাঁচজন; ষড়ঋতু; সপ্তাহ; ত্রিভুবন; চতুরঙ্গ; শতাব্দী; পঞ্চনদ; চৌ-রাস্তা; অষ্টধাতু; চতুর্ভুজ; ত্রি-ফলা; দশচক্র; নবরত্ন; সাতসমুদ্র ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্যকোন তৃতীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। বহুব্রীহি সমাসের সাহায্যে গঠিত শব্দের কতিপয় নমুনা:

হতভাগা; লালপেড়ে; সুবুদ্ধি; পিছপা; নাক-কাটা; নাম-কাটা; ধামাধরা; চুলাচুলি; গালাগালি; অজ্ঞান; নিরুপায়; অনন্ত; হাতেখড়ি; গায়েহলুদ; বিড়ালাক্ষী; ফুল-তোলা; দোটানা; মুখে-ভাত; চৌচালা; নরপশু ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাসঃ পূর্বপদে অব্যয় যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাবে সমাস বলে। অব্যয়ীভাবে সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। অব্যয়ীভাব সমাসের সাহায্যে গঠিত শব্দের কতিপয় নমুনা:

উপকূল; প্রত্যক্ষ; প্রতিদিন; অণুক্ষণ; আজন্ম; আসমুদ্র; আশৈশব; দুর্ভিক্ষ; অনুগমন; প্রতিমূর্তি; হররোজ; জনপ্রতি; উদ্বেল; উপবন; আনত; যথাবিধি; যথাযোগ্য; প্রত্যুত্তর; প্রতিপক্ষ; যথারীতি ইত্যাদি।

উপসর্গের সাহায্যে শব্দগঠন

আগেই বলেছি বাংলা ভাষায় প্রধানত প্রত্যয় এবং সমাসের সাহায্যেই শব্দ গঠন করা হয়ে থাকে। তবে উপসর্গও কখনো কখনো নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। মনে রাখা দরকার উপসর্গ এবং প্রত্যয়ের ভূমিকার মধ্যে খুব বেশি তারতম্য নেই। এজন্য কেউ কেউ উপসর্গকে "শব্দের আদিতে অবস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়" হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

বাংলা ভাষায় প্রধানত প্রত্যয় এবং সমাসের সাহায্যেই শব্দ গঠন করা হয়ে থাকে। তবে উপসর্গও কখনো কখনো নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে যেগুলো স্বাধীনপদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, অর্থের পূর্ণতা দেয়, অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়, অর্থের সংকোচন ঘটায় এবং নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে তাকে উপসর্গ বলে। উপসর্গ যখন নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে তখনই তা বাংলা শব্দ গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে দেখা দেয়।

বাংলা ভাষায় সাধারণত তিন প্রকার উপসর্গ ব্যবহৃত হয়– (ক) খাঁটি বাংলা (খ) তৎসম (সংস্কৃত) এবং (গ) বিদেশী।

খাঁটি বাংলা উপসর্গের সংখ্যা মোট একুশটি : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

খাঁটি বাংলা উপসর্গের সাহায্যে গঠিত কতিপয় শব্দের নমুনা : অ(অজানা, অবাঙালি); অনা (অনাসৃষ্টি, অনাবৃষ্টি); আ (আকাল, আধোয়া); নি (নিভাঁজ; নিখরচা); পাতি (পাতিকাক, পাতিলেবু); ইতি (ইতিকথা, ইতিকর্তব্য); রাম (রাম দা, রাম ছাগল); ভর (ভরদুপুর, ভরপেট); বি(বিভূঁই, বিপথ); স(সলাজ, সরব) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় যেমন অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ এসেছে তেমনি এসেছে সংস্কৃত উপসর্গও। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা বিশটি। সেগুলো হচ্ছেঃ প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

সংস্কৃত উপসর্গের সাহায্যে গঠিত কতিপয় শব্দের নমুনা : প্র(প্রতাপ, প্রভাব); পরা(পরায়ণ, পরাভব); অপ(অপকার, অপসারণ); নি(নির্ণয়, নিদাঘ); অব(অবগত, অবসান); অনু(অনুবাদ, অনুকূল); নির(নির্ভর, নির্গত); দুর(দুর্মূল্য, দুর্দশা); অধি (অধিকার, অধিষ্ঠান); অভি (অভিযান, অভিসার) ইত্যাদি।

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। ফলে ঐ সব ভাষার বেশ কিছু উপসর্গ বাংলা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন 'নিম' একটি ফারসি উপসর্গ এর সঙ্গে 'রাজি' যুক্ত হয়ে 'নিমরাজি' শব্দটি বাংলায় গঠিত হয়েছে। তেমনি আরবি উপসর্গযোগে আমদরবার, খাসমহল, লাপাত্তা, বাজেখরচ, খয়ের খাঁ ইত্যাদি শব্দ তৈরি হয়েছে। আবার নানা ধরনের ইংরেজি উপসর্গ যোগে ফুলহাতা, হাফহাতা, হেডমাস্টার, সাব-জজ ইত্যাদি শব্দ বাংলাতে গঠিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।
২. উপসর্গ ও প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দ গঠন কিভাবে হয়? বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রত্যয় শব্দ গঠনে কী ভূমিকা রাখে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
২. বিভিন্ন প্রকার সমাস কীভাবে নতুন শব্দ গঠন করে তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
৩. উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? উপসর্গ দিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দিন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৪

বাংলা সমার্থক শব্দ : তালিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *সমার্থক শব্দ কী তা জানতে পারবেন*
- *সমার্থক শব্দ কেন জানার প্রয়োজন সে বিষয়ে ধারণা পাবেন*
- *বাক্যে সমার্থক শব্দের ব্যবহার করতে পারবেন*

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন প্রথমেই আমরা সমার্থক শব্দ কাকে বলে তা জেনে নিই। 'যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে বা যে সব শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদের বলা হয় সমার্থক শব্দ বা সমার্থশব্দ বা প্রতিশব্দ।' যেমন- 'গতি' এই শব্দটির সমার্থক শব্দ হলোঃ জঙ্গমতা, জঙ্গমত্ব, সৃতি, অস্থিতি, অস্থৈবিরতা, অস্থিরতা, রীতি, ঋতি। আবার 'ঘোড়া' শব্দটি দ্বারা একটি চতুষ্পদ জন্তুকে বোঝায়। কিন্তু এই চতুষ্পদ জন্তুকে বোঝাতে 'অশ্ব', 'ঘোটক', 'হয়' প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করা হয়। সমার্থক শব্দ ভালভাবে জানা থাকলে ভাষায় শব্দের পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটে না। সমার্থক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষায় শ্রুতিমধুরতা রক্ষা করে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। নিচে সমার্থক শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলোঃ

যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে বা যে সব শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদের বলা হয় সমার্থক শব্দ বা সমার্থশব্দ বা প্রতিশব্দ।

আকাশঃ অম্বর, ব্যোম, নভঃ, গগন, অন্তরীক্ষ, শূন্য, অনন্ত।

অশ্বঃ ঘোড়া, ঘোটক, হয়, বাজী, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, তুরগ।

অগ্নিঃ আগুন, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, দহন, বৈশ্বানর, কৃশানু।

অতিশয়ঃ অতি, অধিক, অতীব, অতিমাত্র, অত্যন্ত, একান্ত, নিতান্ত, পরম, সাতিশয়।

অন্ধকারঃ আঁধার, তিমির, তমঃ, তম, তমিস্র।

ইচ্ছাঃ অভিলাষ, অভিপ্রায়, বাঞ্ছা, বাসনা, স্পৃহা, কামনা, আকা–ক্ষা, অভিরুচি।

ঈশ্বরঃ বিধাতা, স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, খোদা, আল্লাহ্, ভগবান, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, ধাতা, জগদ্বন্ধু, বিধি, পরমাত্মা, বিভু।

কেশঃ চুল, অলক, চিকুর, কুন্তল।

কর্ণঃ শ্রুতি, শ্রবণ, কান, শ্রবণেন্দ্রিয়।

কিরণঃ কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, রশ্মি, আলো, অংশু।

কোকিলঃ পিক, বসন্তদূত, কলকণ্ঠ, পরভৃত, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট।

গৃহঃ আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, সদন, আগার, ঘর, বাড়ি, আবাস।

গরুঃ ধেনু, গো, পয়স্বিনী, গাভী।

চন্দ্রঃ সুধাকর, শশধর, শশাঙ্ক, বিধু, সোম, চন্দ্রমা, নিশাকর, সুধানিধি, হিমাংশু, শীতাংশু, সুধাংশু, চাঁদ।

চক্ষুঃ দর্শন, লোচন, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, চোখ।

জলঃ পানি, জীবন, সলিল, পয়, তোয়, বারি, অম্বু, নীর।

তীরঃ তট, পুলিন, সৈকত, কূল।

দিবাঃ দিবস, দিন, দিনমান।

দেহঃ শরীর, গা, গাত্র, তনু, কলেবর, কায়া।

দেবতা: দেব, অমর, অজর, ত্রিদস, সুর।
ধন: অর্থ, সম্পদ, বিত্ত, বিভব।
ধনী: তটিনী, প্রবাহিনী, তরঙ্গিনী, শৈবালিনী, স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, নির্ঝরিণী।
নারী: রমণী, রামা, বামা, অবলা, মহিলা, স্ত্রী, স্ত্রীলোক, কামিনী, ভামিনী।
পিতা: বাবা, বাপ, জন্মদাতা, জনক।
পুত্র: ছেলে, তনয়, দুলাল, নন্দন, সুত, আত্মজ।
পদ্ম: শতদল, উৎপল, নলিনী, অরবিন্দ, সরসিজ, পঙ্কজ, সরোজ, কমল।
পক্ষী: পাখি, বিহঙ্গম, বিহগ, খেচর, দ্বিজ, খগ, অন্ডজ।
পর্বত: গিরি, শৈল, পাহাড়, অদ্রি, ভূধর, মহীধর, নগ, অচল, শৃঙ্গধর।
পৃথিবী: ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, বসুমতি, বসুধা, ভূ, জগৎ, ভূবন, অবনী, মহী, মেদিনী, ক্ষিতি।
পাপ: কলুষ, দুষ্কৃতি, দুষ্কর্ম, পাতক।
ভার্যা: স্ত্রী, পত্নী, সহধর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনী, দার, কলত্র, অঙ্গনা, বনিতা।
ভ্রমর: মধুকর, ষটপদ, মধুপ, অলি, ভৃঙ্গ, শিলীমুখ।
বৃক্ষ: তরু, দ্রুম, শাখী, পাদপ, মহীরূহ, উদ্ভিদ।
বন: জঙ্গল, অরণ্য, কান্তার, বিপিন, গহন, অটবী।
বায়ু: পবন, হাওয়া, বাতাস, সমীর, সমীরণ, অনিল, মরুৎ, গন্ধবহ, প্রভঞ্জন।
বন্ধু: মিত্র, সুহৃদ, বান্ধব, সখা।
বস্ত্র: বসন, পোশাক, কাপড়, পরিচ্ছদ, অম্বর, বাস, পরিধেয়।
বিদ্যুৎ: তড়িৎ, চপল, চঞ্চলা, অশনি, ক্ষণপ্রভা, অচির, প্রভা, দামিনী, সৌদামিনী।
মাতা: মা, জননী, গর্ভধারিণী, প্রসূতি।
ময়ূর: কলাপী, কেকা, শিখী, শিখন্ডী।
মেঘ: জলদ, বারিদ, জলধর, নীরদ, ঘন, অভ্র, জীমূত।
মৃত্যু: ইন্তেকাল, অন্ত, বিনাশ, মরণ, নাশ, নিধন, নিপাত, পরলোকগমন, স্বর্গলাভ, দেহত্যাগ, লোকান্তরপ্রাপ্তি, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ, ইহলীলা সংবরণ, চিরবিদায়।
যুদ্ধ: সংগ্রাম, রণ, সমর, আহব, বিগ্রহ।
রাজা: নৃপেন্দ্র, নৃপতি, নরেশ, ভূপতি, ভূপ, নরপতি, ভূপাল, মহীপাল, দন্ডধর।
সূর্য: রবি, সবিতা, প্রভাকর, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, দিনেশ, কিরণমালী, দিনমণি, ভানু, আদিত্য, মার্তন্ড, অংশুমালী, দিননাথ।
স্বর্গ: বেহেশ্‌ত, দ্যুলোক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, দেবলোক, দেববাস, সুরলোক, দেবায়তন।
সমুদ্র: বারিধি, জলধি, সিন্ধু, অর্ণব, পারাবার, সাগর, রত্নাকর, জলনিধি, পাথার, নীলাম্বু, অম্বুধি, অম্বুপতি।
সমূহ: গণ, বৃন্দ, চয়, নিচয়, সমুদয়, পটল, বর্গ, মালা, রাজি, সকল।
সর্প: অহি, উরগ, নাগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, ভুজগ, আশীবিষ, ফণী, ফণাধর।
সিংহ: পশুরাজ, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র, কেশরী।
হস্তী: হাতি, গজ, করী, কুঞ্জর, বারণ, দ্বিপ, মাতঙ্গ।
হস্ত: হাত, কর, ভুজ, বাহু।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা সমার্থক শব্দ বলতে কি বোঝেন? নিম্নলিখিত শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন:
অগ্নি, ভার্যা, সিংহ, বিদ্যুৎ, পুত্র, ধনী, বন্ধু, বস্ত্র, যুদ্ধ, ঈশ্বর, চক্ষু, অশ্ব, আকাশ, কিরণ, দেহ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বাংলা সমার্থক শব্দ কাকে বলে?
২। বাংলা সমার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৫

বাংলা বিপরীতার্থক শব্দ : সংজ্ঞার্থ, তালিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *বিপরীতার্থক শব্দ কাকে বলে তা জানতে পারবেন*
- *বিপরীতার্থক শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন*
- *বিপরীতার্থক শব্দ কিভাবে গঠিত হয় তা জানতে পারবেন*
- *বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহারের বিষয়ে ধারণা পাবেন*

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

শব্দের একটি বিশেষ অর্থ থাকে। অর্থ ছাড়া শব্দ হয় না। যখন একটি শব্দের অর্থের ভিন্ন অর্থ বোঝানোর জন্য অন্য একটি শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাকে বিপরীতার্থক শব্দ বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন উপরের আলোচনার আলোকে বিপরীতার্থক শব্দের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি।

সংজ্ঞা: একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

বিপরীতার্থক শব্দ বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে, যথা:

ক. ভিন্ন শব্দ দ্বারা বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে।

খ. শব্দের পূর্বে অ, অন, অজ, অনা, অপ, নির, ন, না, নি, দূর ইত্যাদি উপসর্গ যোগ করে বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে।

গ. হারা, হীন, বিহীন, শূন্য ইত্যাদি শব্দ যোগ করে বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে।

নিচে বিপরীতার্থক শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো:

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক
অর্থ	অনর্থ	অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অনুরাগ	বিরাগ
অগ্র	পশ্চাৎ	অচল	সচল
অনুকূল	প্রতিকূল	অন্তর	বাহির
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অত্ম	বেশি	অলস	পরিশ্রমী
অর্পণ	গ্রহণ	অনশন	ভোজন
অধম	উত্তম	অবনত	উন্নত
অলীক	সত্য	আদর	অনাদর
আত্মীয়	অনাত্মীয়	আবিল	অনাবিল
আবশ্যক	অনাবশ্যক	আসল	নকল
আস্থা	অনাস্থা	আশা	নিরাশা
আস্তিক	নাস্তিক	আকুঞ্চন	প্রসারণ
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আপদ	সম্পদ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক
আগে	পিছে	আদান	প্রদান
আপন	পর	এই	ওই
শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক
আদি	অন্ত	আবির্ভাব	তিরোভাব
আমদানি	রপ্তানি	আয়	ব্যয়
আরম্ভ	শেষ	আবশ্যক	অনাবশ্যক
আবৃত	অনাবৃত	আকাশ	পাতাল
আর্দ্র	শুষ্ক	আদি	অন্ত
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ইষ্ট	অনিষ্ট
ইতর	ভদ্র	ইদানিং	তদানিং
ইহলোক	পরলোক	ইহা	উহা
ইতি	শুরু	ঈদৃশ	তদৃশ
ঈষৎ	প্রচুর	উপচয়	অপচয়
ওঠা	নামা	ওস্তাদ	সাগরেদ
ঔদার্য	কার্পণ্য	ঔদ্ধত্য	বিনয়
একতা	বিচ্ছিন্ন	ঐক্য	অনৈক্য
এলোমেলো	গোছালো	উন্নত	অবনত
উপকার	অপকার	উৎসাহ	নিরুৎসাহ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	ঐহিক	পারিত্রিক
উচ্চ	নিচ	উত্থান	পতন
উদয়	অস্ত	উন্নতি	অবনতি
ঊর্ধ্ব	অধ	উষ্ণ	শীতল
উদার	সংকীর্ণ	উজান	ভাটি
উপস্থিত	অনুপস্থিত	উচিত	অনুচিত
কাজ	অকাজ	কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
কেজো	অকেজো	কৃত্রিম	স্বাভাবিক
কোমল	কর্কশ	ক্রয়	বিক্রয়
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	ক্রন্দন	হাসি
কুৎসিত	সুন্দর	ক্রোধ	ক্ষমা
খুঁত	নিখুঁত	খোঁজ	নিখোঁজ
খাঁটি	ভেজাল	খাতক	মহাজন
খুচরা	পাইকারি	খোলা	বন্ধ
খল	সরল	ক্ষতি	লাভ, বৃদ্ধি
ক্ষয়	বৃদ্ধি	ক্ষমতা	অক্ষমতা
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গুরু	লঘু	গৃহী	সন্ন্যাসী
গ্রহণ	বর্জন	গৌণ	মূখ্য
গ্রহীতা	দাতা	গোপন	প্রকাশ্য
ঘাটতি	বাড়তি	ঘাত	প্রতিঘাত
ঘন	তরল	ঘৃণা	শ্রদ্ধা
চেতন	অচেতন	চেনা	অচেনা
চতুর	বোকা	চঞ্চল	স্থির

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক
চোখা	ভোঁতা	ছোট	বড়
ছেলে	মেয়ে	জন্ম	মৃত্যু
জয়	পরাজয়	জড়	চেতন
জাগরিত	নিদ্রিত	জীবন	মরন
জোয়ার	ভাটা	জ্বলন	নির্বাপণ
জ্ঞানী	অজ্ঞান	ঝলমলে	মিটমিটে
ঝুনা	কাঁচা	টাটকা	বাসি
টক	মিষ্ট	ঠকা	জেতা
ঠান্ডা	গরম	তৃপ্ত	অতৃপ্ত
ডোবা	ভাসা	তাল	বেতাল
তেজী	নিস্তেজ	ত্যাগ	গ্রহণ
তিক্ত	মধুর	তফাৎ	নিকট
তিমির	আলোক	তিরস্কার	পুরস্কার
থাকা	যাওয়া	দাতা	গ্রহীতা
দিন	রাত	পাকা	কাঁচা
প্রকৃত	অপ্রকৃত	প্রাচীন	নবীন, নব্য
প্রসন্ন	বিষন্ন	ফলবান	ফলহীন
ফরসা	ময়লা, কাল	বিরত	নিরত
বাদী	বিবাদী	বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু	বর	বৌ
বর্ধমান	ক্ষীয়মান	বড়	ছোট
বাচাল	স্বল্পভাষী	বিরহ	মিলন
বেহেশ্‌ত	দোজখ	বোকা	চালাক
ব্যর্থ	সার্থক	বিদ্বান	মূর্খ
বেশি	কম, অল্প	বিরল	বহুল
বিজ্ঞ	অজ্ঞ	বিনীত	দুর্বিনীত, অবিনীত
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	ভয়	সাহস
ভিতর	বাহির	ভীতু	সাহসী
ভীরু	নির্ভীক	ভূত	ভবিষ্যৎ
ভোঁতা	ধারালো	ভেজাল	খাঁটি
ভদ্র	অভদ্র, ইতর	মান	অপমান
তরুণ	প্রবীণ	মৃদু	প্রবল
মিত্র	শত্রু	যশ	অপযশ
যত্ন	অযত্ন	যোগ	বিয়োগ
যুক্ত	বিযুক্ত	রোগ	নীরোগ
রাজা	প্রজা	রুগ্ন	সুস্থ, সবল
বুদ্ধ	মুক্ত	লঘু	গুরু
লাভ	ক্ষতি, লোকসান	লায়েক	নালায়েক
লাল	কালো	লাজুক	নির্লজ্জ
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	শান্ত	অশান্ত
শিষ্ট	অশিষ্ট	শুভ	অশুভ
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা	শীঘ্র	বিলম্ব

শব্দ	**বিপরীতার্থক শব্দ**	**শব্দ**	**বিপরীতার্থক**
শ্রম	বিশ্রাম	শোক	হর্ষ
সান্ত	অনন্ত	স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গম
সঞ্চয়	অপচয়	সবল	দুর্বল
সুকৃত	দুষ্কৃত	সুশীল	দুঃশীল
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট	সদয়	নির্দয়
সম্বল	নিঃসম্বল	সরস	নীরস
সাকার	নিরাকার	সফল	বিফল
সুশ্রী	বিশ্রী	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সত্য	মিথ্যা	সমষ্টি	ব্যষ্টি
সার্থক	ব্যর্থ	সুন্দর	কুৎসিত
সৃষ্টি	ধ্বংস	স্থির	অস্থির
স্মৃতি	বিস্মৃতি	স্বকীয়	পরকীয়
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	স্বর্গ	নরক
স্বাধীন	পরাধীন	সুশীল	দুঃশীল
স্পষ্ট	অস্পষ্ট	স্তুতি	নিন্দা
সুধা	বিষ, হলাহল	সুগম	দুর্গম
সন্ধি	বিগ্রহ	সুখ্যাতি	নিন্দা, কুখ্যাতি
স্মরণ	বিস্মরণ	হাল	বেহাল
হুঁশ	বেহুঁশ	হার	জিত
হরণ	পূরণ	হালকা	ভারি
হাসি	কান্না	হ্রাস	বৃদ্ধি
হিংসা	অহিংসা	হৃদ্য	ঘৃণ্য, কটু
দীর্ঘ	হ্রস্ব	দুষ্ট	শিষ্ট
দূর	নিকট	দেওয়া	নেওয়া
দেনা	পাওনা	দুর্লভ	সুলভ
দু:খ	সুখ	দৃঢ়	শিথিল
ধার্মিক	পাপিষ্ট, পূণ্যবান	ধনী	গরিব, নির্ধন
ধনিক	নি:স্ব	নতুন	পুরাতন
নিন্দা	প্রশংসা	নিদ্রিত	জাগ্রত
নরম	শক্ত	নৈসর্গিক	কৃত্রিম
নশ্বর	অবিনশ্বর	নির্মল	পঙ্কিল
নীরস	সরস	নকল	আসল
প্রভু	ভৃত্য	পাপ	পুণ্য

বিপরীতার্থক শব্দ বাক্যে প্রয়োগ

- সুখ-দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে।
- খেলায় হার-জিত আছে।
- আদান-প্রদান ছাড়া ব্যবসা করা যায় না।
- অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করে কাজ করা ভাল।
- সামজে বাস করতে হলে আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার সাথেই ভাল ব্যবহার করতে হয়।

উপরের বাক্যগুলোতে সুখ-দুঃখ, হার-জিত, আদান-প্রদান, অগ্র-পশ্চাৎ, আত্মীয়-অনাত্মীয় শব্দ-যুগলের দ্বিতীয়টির অর্থ প্রথমটির সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ধরনের বিপরীত অর্থবোধ শব্দকে বিপরিতার্থক শব্দ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দের বিপরীত শব্দ লিখুন

ভোজন, উহা, ইতি, পর, অবনত, উত্তম, অগ্র, আদি, উষ্ণ, গৃহী, একতা, খল, জড়, চঞ্চল, ঘাটতি, দুষ্ট, দুর্লভ, বিরত, বর্ধমান, বাচান, ভীরু, যশ, সম্বল, লাজুক, সরস, সুগম, স্বকীয়, হরণ, হিংসা, সদয়, মিত্র, ভূত, মৃদু, বন্ধন, প্রভু, ধনিক, ধার্মিক, তেজী, দুষ্ট, উপচয়, আকুঞ্চণ, অন্তর, অনুরক্ত, অলীক, অতিবৃষ্টি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বিপরীতার্থক শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২। পাঁচটি বিপরীতার্থক শব্দের বাক্যে প্রয়োগ দেখান।

পাঠ - ৬

বাংলা নানার্থক শব্দ: সংজ্ঞার্থ, তালিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *বাংলা নানার্থক শব্দ বিষয়ে জানতে পারবেন*
- *বাংলা নানার্থক শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন*
- *বাক্যে নানার্থক শব্দের ব্যবহার করতে পারবেন*

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দ আছে যেগুলো ব্যবহারভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, 'অঙ্ক' একটি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো 'গণিত'। কিন্তু যদি বলা হয় 'নাটকটির শেষ অঙ্ক বড়ই করুণ'। তখন 'অঙ্ক' অর্থে অধ্যায় বা ভাগকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলা ভাষার অনেক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়। যে সব শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয় সে সব শব্দকে নানার্থক শব্দ বলা হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষার অনেক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়। যে সব শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয় সে সব শব্দকে নানার্থক শব্দ বলা হয়ে থাকে।

নিচে নানার্থক শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো:

অঙ্ক

নাটকের অধ্যায়: নাটকটির প্রথম অঙ্ক বড়ই মর্মস্পর্শী।
গণিত: সোমা অঙ্কে কাঁচা।
কোল: মাতৃ অঙ্কে শিশুটি হাসছে।

অর্থ

টাকা পয়সা: অর্থই অনর্থের মূল।
মানে: তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।
উদ্দেশ্য: ওদিকে তাকানোর অর্থ কি?
ভাব: পন্ডিত ব্যক্তির কথার অর্থ বোঝা কঠিন।

উত্তর

দিক বিশেষ: বাড়ির উত্তরে একটি বড় তালগাছ আছে।
জবাব: চিঠির উত্তর দিও।
ভবিষ্যৎ: ছেলেটি উত্তরকালে পন্ডিত হবে।
পরবর্তী: গদ্য কবিতা রচনা শুরু হয় যুদ্ধোত্তর যুগে।

কর্ম

পেশা: সে তার কুলকর্ম ধরেই রেখেছে।
কাজ: কর্ম করলে ফল পাওয়া যায়।
কর্তব্য: কর্মই হলো ধর্ম।
সক্ষম: ছেলেটি কোন কর্মের নয়, খুব অলস।
প্রাক্তন: কর্মের ভোগ ভুগতেই হয়।

কথা

প্রতিশ্রুতি: এ কাজটি করবে বলে সে কথা দিয়েছে।
গল্প: শিমু অনেক কথা জানে।

তর্ক: তার সঙ্গে কথায় পারা যায় না।
অনুরোধ: আমার কথা রাখ।
পরামর্শ: তার সাথে জরুরী কথা আছে।

কাল

সময়: কালের গর্ভে সবই হারিয়ে যায়।
মৃত্যু: তাকে কালে ধরেছে, আর বেশিদিন বাঁচবে না।
রং: ছেলেটি কাল।
আগামী দিন: কাল একবার দেখা করো।

কান্ড

ঘটনা: কী কান্ড ঘটেছে বল তো?
সাধারণ বুদ্ধি: তোমার কোনদিনও কান্ডজ্ঞান হবে না।
গাছের গুঁড়ি: শিমু বৃক্ষের কান্ডের উপর বসে আছে।
অধ্যায়: বইটি পাঁচ খন্ডে বিভক্ত।

জাল

ফাঁদ: ছলনাময়ীর জালে পা দিয়ো না।
মাছ ধরবার জাল: জেলেরা নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে।
নকল: জাল দলিল।

তাল

ফলবিশেষ: ভাদ্র মাসে তাল পাকে।
সময় পরিমাপ: তালজ্ঞান না থাকলে গায়ক হওয়া যায় না।
পিন্ড: শিমু একতাল রূপা নিয়ে এলো।
আঘাত: অন্যায় না করলেও তাল পড়ে আমার মাথায়।

ধারা

বর্ষণ: এ ধারা সন্ধ্যায় মন মানে না।
স্বভাব: আলম কেমন ধারার ছেলে বোঝা যায় না।
রীতি: সব দেশের সংস্কৃতি এক ধারার হয় না।
প্রবাহ: পদ্মা ও যমুনা দুই ধারায় বিভক্ত।
আইনের বিভাগ: ৩২০ ধারা অনুযায়ী তার বিচার হয়েছে।
আচরণ: ফাহিমের লেখা-পড়ার কোন ধারা নেই।

চাল

ব্যবহার: জমিদারি চাল বর্তমানে চলে না।
চাউল: চালের দাম এবার খুব একটা বাড়ে নি।
ছাদ: ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে গেছে।
ফন্দি: সবার সঙ্গে চাল চালতে নেই।
আশ্রয়: চাল চুলো না থাকলে লোকে দাম দেয় না।
খেলা: তার দাবার চাল বোঝা মুস্কিল।

ছল

প্রসঙ্গ: ঠাট্টাচ্ছলে কথাটি বলেছি।
ছলনা: ছল করে মন জয় করা তার স্বভাব।

কপট: দুষ্ট লোকের ছল-চাতুরি সবাই বোঝে না।
দোষ: পরের কথার ছল ধরা তোমার অভ্যাস।
উদ্দেশ্য: ছল করে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

সুর
ধ্বনি: নজরুল গীতির সুর ভেসে আসছে।
উদ্দেশ্য: এমপি হওয়ার পরই তার কথার সুর বদলে গেছে।
দেবতা: সুর ও অসুরের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।
কণ্ঠস্বর: খসখসে সুরের গান ভাল লাগে না।

লোক
জন: ভাল লোক সব সমাজেই আছে।
ভৃত্য: লোক দিয়ে কাজ করানো ছাড়া উপায় নেই।
স্থান: পরলোকের খবর কেউ জানে না।
জন্ম: ইহলোকে সুখ মিলল না।

বর্ণ
অক্ষর: সব ভাষাতেই স্বর ও ব্যঞ্জন- এই দুধরনের বর্ণ আছে।
জাতি: বর্ণভেদ সমাজই সৃষ্টি করেছে।
রং: বসন্তে নানা বর্ণের ফুল ফোটে।

রূপ
মূর্তি: সৃষ্টি কর্তার কোন রূপ নেই, তিনি নিরাকার।
সৌন্দর্য: প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করা যায় না।
রকম: তোমার ব্যবহারের যা রূপ না?
সজ্জা: বৈশাখের খর তাপেও রাধাচূড়ার রূপ অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত।

মুখ
ভাষা: মধুমাখা মুখের দ্বারা করেছ আপন।
মুখমন্ডল: মেয়েটির মুখ আমার বোনের মুখের মত।
সম্মান: ছেলে-মেয়ে অমানুষ হলে বাবা-মায়ের মুখ থাকে না।
ক্ষমতা: যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।
ঝগড়া: তুমি অত মুখ কর কেন?

কাঁচা
অপক্ব: আমটি কাঁচা।
অসিদ্ধ: মাংস ঠিক মত রান্না হয় নি, কাঁচা রয়ে গেছে।
অনিপুণ: বোঝাই যাচ্ছে এটা কাঁচা হাতের লেখা।
অস্থায়ী: শাড়িটির রং কাঁচা।

হাত
হস্ত: শিমুর বাম হাত ভাঙা।
সহায়ক: সিরাজ সাহেব ছিলেন আমার ডান হাত।
অধিকার: ঐ ঘটনায় আমার কোন হাত ছিল না।
বশীভূত করা: লোকটিকে অনেক চেষ্টায় হাত করেছি।
নিপুণতা: ডাক্তারি বিদ্যায় সাত্তারের হাত যশ আছে।

পাকা
অভিজ্ঞ: সিরাজ পাকা লোক।
পরিপক্ব: আমটি পাকা।
দক্ষ: আমিন সাহেব পাকা ব্যবসায়ী।
সাদা: পাকা চুলে কলপ নিলে লাভ হয় না।
খাঁটি: শাড়িটির রং পাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলা নানার্থক শব্দ বলতে কি বোঝেন? নিম্নলিখিত শব্দগুলো নানার্থক হিসেবে ব্যবহার দেখান: কর্ম, অর্থ, চাল, মুখ ও পাকা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বাংলা নানার্থক শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৭

জোড়া শব্দ : সংজ্ঞার্থ ও তালিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *জোড়া শব্দ কী তা জানতে পারবেন।*
- *জোড়া শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।*
- *জোড়া শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।*

বাংলা ভাষায় বহু জোড়া শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই জোড়া শব্দগুলোকে যুগ্মশব্দ বা শব্দযুগল বা পদদ্বৈত বা শব্দদ্বৈত নামে অভিহিত করা হয়।

সমার্থক, বিপরীতার্থক ও ভিন্নার্থক দুটি শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে যখন এক শব্দে পরিণত হয়, তখন তাকে জোড়া শব্দ বলে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন জোড়া শব্দ সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। সমার্থক, বিপরীতার্থক ও ভিন্নার্থক দুটি শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে যখন এক শব্দে পরিণত হয়, তখন তাকে জোড়া শব্দ বলে।

জোড়া শব্দের দুটি পদই অর্থবিশিষ্ট হয়ে থাকে। জোড়া শব্দগুলোকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলোর উল্লেখ করা হলো:

- সমার্থক জোড়া শব্দ
- বিপরীতার্থক জোড়া শব্দ
- ভিন্নার্থক জোড়া শব্দ

বিভিন্ন প্রকার জোড়া শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেয়া হলো:

সমার্থক জোড়া শব্দ

অভাব-অভিযোগ	চালাক-চতুর	দয়া-দাক্ষিণ্য	মুটে-মজুর
অনুনয়-বিনয়	ছেলে-পুলে	দাস-দাসী	মাপ-জোক
আপদ-বিপদ	ছেলে-ছোকরা	দয়া-মায়া	মনি-মুক্তা
আমোদ-প্রমোদ	ছাই-ভস্ম	ধন-দৌলত	মাল-মসলা
আত্মীয়-স্বজন	জাঁক-জমক	ধর-পাকড়	যান-বাহন
আশা-ভরসা	জোক-জমা	নাম-ধাম	যুদ্ধ-বিগ্রহ
আলাপ-পরিচয়	জীর্ণ-শীর্ণ	পাহাড়-পর্বত	রীতি-নীতি
আদর-যত্ন	জ্বালা-যন্ত্রণা	পোশাক-পরিচ্ছদ	রস-কস
উঁকি-ঝুঁকি	জীব-জন্তু	বলা-কওয়া	লোক-লস্কর
ওপর-আপত্তি	ঝড়-ঝাপ্‌টা	বাধা-বিঘ্ন	লোক-জন
কাঙাল-গরিব	টাকা-পয়সা	বৃষ্টি-বাদল	লোহা-লক্কড়
কথা-বার্তা	ঠাকুর-দেবতা	ব্যবসা-বাণিজ্য	শক্ত-সমর্থ
কাজ-কর্ম	ঠাট্টা-তামাসা	বন-জঙ্গল	শান্ত-শিষ্ট
কূল-কিনারা	ঢাক-ঢোল	বিধি-ব্যবস্থা	সুখ-শান্তি
গল্প-গুজব	তর্ক-বিতর্ক	ভুল-ভ্রান্তি	সাধু-সজ্জন
ঘর-দোর	তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য	মাথা-মুন্ডু	হাট-বাজার
চাল-চলন	দোকান-পাট	মান-সম্মান	হৃষ্ট-পুষ্ট

বিপরীতার্থক জোড়া শব্দ

আদান-প্রদান	ক্রয়-বিক্রয়	শুভ-অশুভ	দেনা-পাওনা
আগা-গোড়া	ভাল-মন্দ	সুখ-দুঃখ	জন্ম-মৃত্যু
আলো-আঁধার	মান-অপমান	দিন-রাত	বেহেশ্‌ত-দোযখ
আয়-ব্যয়	যোগ-বিয়োগ	দোষ-গুণ	ধর্ম-অধর্ম
আদর-অনাদর	রোদ-বৃষ্টি	হাসি-কান্না	ওঠা-নামা
আকাশ-পাতল	লাভ-লোকসান	ন্যায়-অন্যায়	উঁচু-নিচু
আস্তিক-নাস্তিক	বেচা-কেনা	জল-স্থল	ন্যায়-অন্যায়
ইতর-ভদ্র	শীত-বসন্ত	পাপ-পুণ্য	
ইচ্ছা-অনিচ্ছা	শীত-গ্রীষ্ম	সত্য-মিথ্যা	

ভিন্নার্থক শব্দের প্রত্যেক অংশে পৃথক অর্থ হয়ে থাকে। সমার্থবোধক শব্দের মত দুই অংশ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

ভিন্নার্থক বা বিভিন্নার্থক জোড়া শব্দ

অন্ন-বস্ত্র	চন্দ্র-সূর্য	জিনিস-পত্র	নাম-ধাম
আসবাব-পত্র	ধোপা-নাপিত	ধুয়ে-মুছে	ক্ষুধা-তৃষ্ণা
ঔষধ-পথ্য	জল-বায়ু	দয়া-মায়া	খরচ-পত্র
কাঠ-খড়	শীত-বসন্ত	অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	
খাতা-পত্র	আগে-ভাগে	আগা-গোড়া	

মনে রাখবেন, ভিন্নার্থক শব্দের প্রত্যেক অংশে পৃথক অর্থ হয়ে থাকে। সমার্থবোধক শব্দের মত দুই অংশ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিম্নলিখিত জোড়াশব্দগুলির ব্যবহার দেখান।
গল্প-গুজব, বাধা-বিঘ্ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, জোত-জমা, অভাব-অভিযোগ, আশা-ভরসা, উঁকি-ঝুঁকি, রস-কস, লজ্জা-সরম, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আয়-ব্যয়, দিন-রাত, সত্য-মিথ্যা, জন্ম-মৃত্যু, আলো-ছায়া, উঁচু-নিচু, অন্ন-বস্ত্র, জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আগা-গোড়া, দয়া-ময়া।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জোড়া শব্দ বলতে কি বোঝেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

নির্দেশ	নিজে উত্তর মালা তৈরি করুন।

পাঠ - ৮

বাংলা পদ-পরিবর্তন : তালিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *পদ যে রূপান্তর হয় তা জানতে পারবেন*
- *এক পদ হতে অন্য পদের রূপ কি তা জানতে পারবেন*

শিক্ষার্থী বন্ধুরা পদ পরিবর্তনের তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অণু	আণবিক	গোলাপ	গোলাপি
অগ্র	অগ্রিম	গাঁ	গেঁয়ো
অভিধা	অভিহিত	চক্ষু	চাক্ষুষ
অনুগমন	অনুগত	চোর	চোরাই
অনুপ্রবেশ	অনুপ্রবিষ্ট	জন্ম	জাত
অংশ	আংশিক	জন্তু	জান্তব
আঘাত	আহত	জঙ্গল	জংলি, জঙ্গলে
আলোড়ন	আলোড়িত	জয়	জিত, জের
আদি	আদ্য	জীবন	জীবিত
আমোদ	আমোদিত	জল	জলীয়
আরোহণ	আরূঢ়	ঝগড়া	ঝগড়াটে
আহ্বান	আহূত	ঢাকা	ঢাকাই
আস্তরণ	আস্তীর্ণ	দিন	দৈনিক
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক	দেহ	দৈহিক
ইতিহাস	ঐতিহাসিক	দেঁতো	দাঁতান
ঈশ্বর	ঐশ্বরিক	দেব	দৈব
উদ্যম	উদ্যত	দরদ	দরদি
উপদ্রব	উপদ্রুত	ধাতু	ধাতব
উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	ধার	ধারালো
কাবুল	কাবুলী	ধৈর্য	ধীর
কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	নিশা	নৈশ
কূল	কূলীয়	ন্যায়	ন্যায্য
কোণ	কুণো	পেট	পেটুক
ক্ষোভ	ক্ষুব্ধ	পুর	পৌর
কর্ম	কর্মঠ, কর্মী	পঙ্ক	পঙ্কিল
খেদ	খিন্ন	পৃথিবী	পার্থিব
গ্রাস	গ্রস্ত	পুষ্টি	পুষ্ট

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
গা	গব্য	পশ্চিম	পশ্চিমা
পান	পেয়	শ্রম	শ্রমী
পাহাড়	পাহাড়ি	শ্রবণ	শ্রুত
পশম	পশমি	শোক	শোকার্ত
পুষ্প	পুষ্পিত	সংখ্যা	সাংখ্য
পাথর	পাথুরে	সোনা	সোনালি
ফল	ফলিত, ফলবান	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
ব্যাঘাত	ব্যাহত	সভা	সভ্য
বরণ	বরণীয়	সাহেব	সাহেবি
বপন	উপ্ত	সেচন	সিক্ত
বিধান	বিহিত	হরণ	হৃত
বিমান	বৈমানিক	মাছ	মেছো
বিস্ময়	বিস্মিত	হেমন্ত	হৈমন্তিক
বিপ্লব	বৈপ্লবিক, বিপ্লবী	ঝড়	ঝড়ো
বিপদ	বিপন্ন	লাজ	লাজুক
বেনারস	বেনারসি	পরিবার	পারিবারিক
বিশ্বজন	বিশ্বজনীন	মানস	মানসিক
বাক	বাগীশ্	প্রাচী	প্রাচ্য
বন	বুনো, বন্য	পা	পেয়ে
বিষাদ	বিষণ্ণ	দর্শন	দৃষ্ট
বেগুন	বেগুনি	উপদ্রব	উপদ্রুত
বিশ্রাম	বিশ্রান্ত	স্মরণ	স্মরণীয়
বিধি	বৈধ	সমুদ্র	সামুদ্রিক
ভাত	ভেতো	ন্যায়	নায্য
ভেদ	ভিন্ন	স্নেহ	স্নিগ্ধ
ভোজন	ভুক্ত	ধর্ম	ধার্মিক
ভঙ্গ	ভগ্ন	দেহ	দৈহিক
ভ্রংশ	ভ্রষ্ট	বিশ্রাম	বিশ্রান্ত
ভূত	ভূতুড়ে, ভৌতিক	স্ত্রী	স্ত্রৈণ
মাদ্রাজ	মাদ্রাজি	তালু	তালব্য
মৌন	মৌনী	হুঁশ	হুঁশিয়ার
মন	মানবিক	রং	রঙীন
মুখ	মৌখিক	দর্শন	দর্শনীয়
মোহ	মুগ্ধ	প্রমান	প্রামাণ্য
মাটি	মেটে	বচন	বাচনিক
যশ	যশস্বী	সুতো	সুতি
রেশম	রেশমি	দেশ	দেশীয়
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	হৃদয়	হৃদ্য

বিশেষ্য	**বিশেষণ**	**বিশেষ্য**	**বিশেষণ**
শাস্ত্র	শাস্ত্রীয়	হাস্য	হাস্যকর
শহর	শহুরে		
অভিজাত	আভিজাত্য	বীর	বীর্য
অনুকূল	আনুকূল্য	দরিদ্র	দারিদ্র, দরিদ্রতা
অতিশয়	আতিশয্য	সুকুমার	সৌকুমার্য
অলস	আলস্য	সুস্থ	স্বাস্থ্য
আকুল	আকুলতা	সুষ্ঠু	সুষ্ঠুতা, সৌষ্ঠব
ইতর	ইতরামি	শূর	শৌর্য
উচিত	ঔচিত্য	বিচিত্র	বৈচিত্র্য
ঋজু	ঋজুতা	বেহায়া	বেহায়াপনা
কুলীন	কৌলিন্য	মাতাল	মাতলামি
কিশোর	কৈশোর	আকুল	আকুলতা
কুমার	কৌমার্য	ললিতা	লালিত্য
কৃপণ	কৃপণতা, কার্পণ্য	দৃঢ়	দৃঢ়তা
ক্ষেপা	ক্ষেপামি	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
কুঁড়ে	কুঁড়েমি	ধূর্ত	ধূর্তপনা
কপট	কপটতা, কাপট্য	দুরাত্মা	দৌরাত্ম্য
গরিব	গরিবানা	দুরন্ত	দুরন্তপনা
গম্ভীর	গাম্ভীর্য	দ্বি	দ্বিত্ব
চেতন	চৈতন্য	বাবু	বাবুয়ানা, বাবুগিরি
চালাক	চালাকি	প্রচুর	প্রাচুর্য
চতুর	চতুরতা, চাতুর্য	দুষ্ট	দুষ্টামি
নীল	নীলিমা	সরল	সরলতা
ললিতা	লালিত্য	শিথিল	শিথিলতা, শৈথিল্য
ঘন	ঘনত্ব	সহায়	সাহায্য
এক	ঐক্য, একত্ব	মহৎ	মহত্ত্ব, মহিমা
লঘু	লাঘব	মূর্খ	মূর্খতা
নবীন	নবীনতা	মধুর	মাধুর্য
নত	নতি	ভণ্ড	ভণ্ডামি
নম্র	নম্রতা	সৎ	সততা
পাকা	পাকামি	সুজন	সৌজন্য
ন্যাকা	ন্যাকামি	হ্রস্ব	হ্রাস
প্রচুর	প্রাচুর্য		
পাগল	পাগলামি		
বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য		

বিশেষ্য হতে বিশেষ্য

বিশেষ্য	বিশেষ্য	বিশেষ্য	বিশেষ্য
অধিপতি	আধিপত্য		
আমির	আমিরি	গোলাম	গোলামি
বাদশাহ	বাদশাহি	গুরু	গুরুগিরি
ছেলে	ছেলেমি	কেরানি	কেরানিগিরি
প্রভু	প্রভুত্ব	সুহৃদ	সৌহার্দ্য, সৌহৃদ
পশু	পশুত্ব	জমিদার	জমিদারি
সখা	সখ্য	মুন্সী	মুন্সীগিরি
নবাব	নবাবি	শিক্ষক	শিক্ষকতা
ডাক্তার	ডাক্তারি	মাস্টার	মাস্টারি
মোড়ল	মোড়লি	রাজা	রাজত্ব
শয়তান	শয়তানি	দাস	দাসত্ব
গৃহিণী	গৃহিণীপনা	দনু	দানব
শীত	শৈত্য	পুত্র	পৌত্র
পন্ডিত	পান্ডিত্য	ভাগনী	ভাগিনেয়
শিশু	শৈশব	মনু	মানব
চোর	চুরি, চৌর্য	বিমাতা	বৈমাত্রেয়
দশরথ	দশরথি	দেব	দেবত্ব
উকিল	ওকালতি	দালাল	দালালি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশেষ্যকে বিশেষণ করুনঃ ঈশ্বর, উপদ্রব, কাঠ, কোণ, অণু, অনুগমন, অংশ, আরোহণ, ইচ্ছা, চক্ষু, উৎকর্ষ, জল, দেহ, বিপ্লব, বরণ, বিষাদ, ধৈর্য, ভাত, ভ্রংশ, পান, ফল, জন্ম, শ্রদ্ধা, শ্রবণ, সন্ধ্যা, হেমন্ত, দর্শন, স্নেহ, স্ত্রী, তালু, মধু, মন, দেশ, বচন, হাস্য।

২. বিশেষণকে বিশেষ্য করুনঃ অলস, উচিত, ঘন, নম্র, চেতন, কপন, গম্ভীর, অনুকূল, ইতর, কিশোর, কৃপণ, চালাক, এক, পাকা, বিচিত্র, দরিদ্র, দীর্ঘ, প্রচুর, সরল, মূর্খ, সৎ, সুজন, সুষ্ঠু, বীর, দুরন্ত।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিশেষ্যকে বিশেষ্যের পৃথক রূপ দেখানঃ শিক্ষক, পুত্র, দুহিতা, বিমাতা, দেব, পশু, প্রভু, সখা, কেরানি, শীত, শিশু, গৃহিণী, চোর, অধিপতি, উকিল, রাজা, মাস্টার, মনু, গুরু, সৃহৃদ।

নির্দেশ	মূল পাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৯

বাংলা প্রবাদ ও বাগধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *প্রবাদ কী তা জানতে পারবেন।*
- *প্রবাদের উদ্ভব সম্পর্কে ধারণা পারবেন।*
- *বাক্যে প্রবাদের ব্যবহার করতে পারবেন।*
- *বাগ্‌ধারা কী তা জানতে পারবেন।*
- *বাক্যে বাগ্‌ধারার ব্যবহার করতে পারবেন।*

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, বিভিন্নমূখী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের বহুপরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই প্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষায় যেমন প্রবাদ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষায়ও প্রবাদ আছে। প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। প্রবাদে উপদেশ ও সত্যতার প্রকাশ পাওয়া যায়। জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় ব্যক্ত হয় প্রবাদের মধ্য দিয়ে। তবে সব ক্ষেত্রে তা চিরসত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ জীবনের বহু অভিজ্ঞতার সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু প্রবাদের নিদর্শন মেলে।

বিভিন্নমূখী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের বহুপরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই প্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষায় যেমন প্রবাদ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষায়ও প্রবাদ আছে। প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি।

প্রবাদের উদ্ভব

প্রবাদের উদ্ভব নানা উৎস থেকে হয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, এগুলোর উদ্ভদ হয়েছে:

- মানুষের মুখ থেকে।
- প্রসিদ্ধ লেখকগণ, যেমনঃ ভারতচন্দ্র, টেকচাঁদ ঠাকুর, ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, দাশুরায়ের পাঁচালী, নিধুবাবুর টপ্‌পা প্রভৃতি রসরচনা হতে।
- জনশ্রুতি থেকে।
- মেয়েলী ছড়া হতে।
- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থাদি হতে।
- বিভিন্ন কাব্য ও লোক-সাহিত্য থেকে।
- খনা, ডাক প্রভৃতির বচন থেকে।
- দৈনিক কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, আচার, ব্যবহার, প্রভৃতি থেকে।

এ দেশীয় স্বকীয় চিন্তাধারা, রীতিনীতি, চাল-চলন, প্রাণসত্তা বাংলা প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শাশুড়ির বাক্যবাণ, ননদের খোঁটা, সতীনের কাঁটার জ্বালা, সপত্নী-বিদ্বেষ, ঘরজামাই, প্রভৃতি বাঙালি জীবনের বিশেষত্বগুলি বাংলা প্রবাদে ফুটে উঠেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার কমে এসেছে। বাঙালি জীবনে রুচির পরিবর্তনই সম্ভবত এর কারণ। প্রবাদের ভাষা সব সময়ে রুচিসম্মত বা মার্জিত হয় না। কিন্তু প্রবাদে বক্তব্যের দৃঢ়তা ও রসগর্ভ ভঙ্গী রসজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে সমাদৃত হয়। নিচে প্রবাদের কিছু উদাহরণ ও সেগুলোর অর্থ দেয়া হলোঃ

অতি আশ, সর্বনাশ – বেশি লোভের পরিণাম ভাল হয় না।

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর – অনেক সময় যোগ্য লোকও তার উপযুক্ত কাজ বা স্থান পায় না।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট – লোক বেশি হলে কাজ পন্ড হয়।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ – অকারণে বেশি আদর-যত্ন করলে নানা সন্দেহ জন্মে।

অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায় – যার অদৃষ্ট খারাপ সে সর্বত্রই নিরাশ হয়।

অভাবে স্বভাব নষ্ট – অভাবের কারণে সৎ লোকও অসৎ হয়।

আপন ঢাক আপনি বাজায় – নিজের প্রশংসা নিজেই করে।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম – আত্নরক্ষা করাই প্রধান কাজ।

আর কি নেড়া বেলতলা যায় – যে একবার ঠকেছে সে ভবিষ্যতে সাবধান হয়।

আল্লায় দিলেও মোল্লায় দেয় না – সৃষ্টিকর্তার দয়া থাকলে মানুষের দীর্ঘসূত্রতার জন্য তা নষ্ট হয়ে যায়।

আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি – যা নিশ্চিত তার তুলনায় অনিশ্চিত জিনিস বেশি আনন্দের কারণ হয়।

ইটে নেই ভিটে নেই বাহিরে মর্দানী – বেশ দরিদ্র কিন্তু বড় মানুষি ভাব আছে।

ইঁদুর মারতে ঘর পোড়ানো – তুচ্ছ শত্রুকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করা।

উঁচু হলে ঝড়ে ভাঙবে, নিচু হলে ছাগলে খাবে – খুব অহংকারী হতে নেই, আবার খুব ছোটও হতে নেই।

উজার বনে শিয়াল রাজা – উপযুক্ত লোক না থাকলে বাজে লোক প্রাধান্য পায়।

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে – একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

উলু বনে মুক্তা ছড়ানো – অযোগ্য পাত্রে উৎকৃষ্ট বস্তু দান।

ঊনা বর্ষায় দুনা শীত – যে বছর বৃষ্টি অত্ম হয় সে বছর শীত বেশি পড়ে।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা – এক সাথে দুই কাজ সম্পন্ন করা।

একমাঘে শীত যায় না – বিপদ একবারেই শেষ হয় না।

গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল – মূর্খ ও অযোগ্য লোকের আত্নশ্লাঘা।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – প্রাপ্তির আগে ভোগের আয়োজন।

ঘরের লক্ষী পায়ে ঠেলা – কাম্য বস্তুকে অনাদর করা।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া – যার অধীন তাকে না জানিয়ে স্বার্থ সাধনের বৃথা চেষ্টা।

চাপ পড়লেই বাপ – বিপদে পড়লে দোষ স্বীকার।

চেনা বামুনের পৈতে লাগে না – সুপরিচিত লোকের নতুন পরিচয়ের দরকার নেই।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই – অসৎ কাজের সঙ্গীদের মধ্যে সদ্ভাব।

চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্থকে বলে সজাগ থাকতে – দুই কুল বজায় রাখা।

চোরের মায়ের কান্না – এমন দুঃখ যা প্রকাশ করা যায় না।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো – সামান্য কাজের জন্য বাজে লোককে নিয়োগ করা।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা – পরকে আপন করবার চেষ্টা বৃথা।

ছেলের হাতের মোয়া – যা অতি সহজে পাওয়া যায়।

জাতও গেল, পেটও ভরল না – ক্ষতি স্বীকার করেও মঙ্গল হলো না।

জুতো মেরে গরু দান – প্রথমে অপমান করে পরে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায় – সমপ্রকৃতির লোক এক সাথে থাকতে ভালবাসে।

ঝিকে মেরে বউকে শেখানো – পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করে শিক্ষা দেয়া।

ঠেলার নাম বাবাজি – বিপদে পড়ে তোষামুদি।

পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা – বিনা পরিশ্রমে যা পাওয়া যায়।

পরের ধনে পোদ্দারি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী – পরের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করে বড় মানুষি দেখানো।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা – পরের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করা।

পাকা ধানে মই দেওয়া – কাজ সফল হওয়ার সময় বিঘ্ন ঘটানো।

পাঁচ আঙ্গুল সমান নয় – সব লোকের স্বভাব এক রকম হয় না।

পেট ভরে তো মন ভরে না – নিজের প্রয়োজন মিটলেও আকা–ক্ষা যায় না।

ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে – অপরকে ঠকাতে গেলে নিজেই ঠকতে হয়।

বড় হবে তো ছোট হও – বড় হতে গেলে খুব বিনয়ী হওয়া প্রয়োজন।

বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি – দুটি বিরুদ্ধ পক্ষের উভয়ের সাথেই যে সদ্ভারের ভান করে।

বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় – শাসনের দাপটে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।

বাড়া ভাতে ছাই – ফল প্রাপ্তির সময় বাধা-বিপত্তি।

বাবারও বাবা আছে – প্রবলের উপরও প্রবল আছে।

বামন হয়ে চাঁদে হাত – অযোগ্য লোকের দুর্লভ জিনিসের প্রতি লোভ।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত – প্রধান অপেক্ষা অপ্রধান দৃঢ়।

বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না – অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করার প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও বলা যায় না।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ – বৃদ্ধের যুবকের মত সাজসজ্জা।

বেল পাকলে কাকের কি? – পরের সুখে বা ঐশ্বর্যে নিজের কি লাভ বা সুখ?

ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না – জানা বিষয়ে অজানার ভান করা।

ভাগের মা গঙ্গায় পায় না – পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ না করলে কাজ সম্পন্ন করা যায় না।

ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো, যেদিন যায় সেদিন ভাল – দুঃখের সময় কষ্ট থাকবেই, তারমধ্যে দু-এক দিন যদি সুখে কাটে তা ভালো।

ভিক্ষার চাল, কাঁড়া আর আকাঁড়া – বিনা মূল্যে যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

মরা হাতি লাখ টাকা – গুণী লোক বিপদে পড়লেও তার গৌরব অক্ষুন্ন থাকে।

মশা মারতে কামান দাগা – সামান্য ব্যপারে বড় আয়োজন।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ – শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা পোষণ করা।

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেতুল – শঠের সঙ্গে শঠ ব্যবহার।

যে মেঘ গর্জায় সে মেঘ বর্ষায় না – বহু আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া হয়।

রাই কুড়িয়ে বেল – অত্ম অত্ম জমা করে অনেক জমানো।

ষোল কড়াই কানা – সবগুলিই ক্রুটিপূর্ণ।

সমুদ্রে শয্যা যার, শিশিরে ভয় কি তার – চারিদিকের নানা বিপদের মধ্যে অত্ম বিপদ তেমন কিছু না।

সস্তার তিন অবস্থা – সুলভ জিনিসের নানা দোষ।

সবুরে মেওয়া ফলে – ধৈর্য ধারণে সুফল লাভ করা যায়।

সাপ হয়ে কাটে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে – একই সাথে শত্রুতা সাধন ও মিত্রতা প্রদর্শন।

সূঁচ হয়ে ঢোকা ফাল হয়ে বেরুনো – কৌশলে ঢুকে সর্বনাশ করা।

সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না – সরল হলে কাজ হয় না, কূট কৌশল দরকার।

হাটের মাঝে হাড়ি ভাঙা – বহু লোকের সামনে গোপন কথা প্রকাশ করা।

হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে – বড়লোক বিপদে পড়লে সামান্য লোকও তাকে অপমান করে।

বাগ্‌ধারা

'বাক' শব্দের অর্থ কথা, শব্দ; আর 'ধারা' বলতে বোঝায় কোন বিশেষ রীতি বা ভঙ্গি। বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি ভাষা বিশেষের সৌন্দর্য ও শক্তির পরিচায়ক। এক বা একাধিক শব্দের মিলনে কোন লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করাই হলো বাগ্‌ধারার উদ্দেশ্য। এর দ্বারা অতি সহজে কোন নির্দিষ্ট ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়। বাগধারাকে 'বাকচাল' 'বাকভঙ্গি' 'বাগ্‌বিধি'ও বলা হয়ে থাকে।

'বাক' শব্দের অর্থ কথা, শব্দ; আর 'ধারা' বলতে বোঝায় কোন বিশেষ রীতি বা ভঙ্গি। বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি ভাষা বিশেষের সৌন্দর্য ও শক্তির পরিচায়ক। এক বা একাধিক শব্দের মিলনে কোন লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করাই হলো বাগ্‌ধারার উদ্দেশ্য। এর দ্বারা অতি সহজে কোন নির্দিষ্ট ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়। বাগধারাকে 'বাকচাল' 'বাকভঙ্গি' 'বাগ্‌বিধি'ও বলা হয়ে থাকে। নিচে কিছু বাগ্‌ধারার অর্থ প্রথম বন্ধনির মধ্যে উল্লেখ করে বাক্যে সেগুলির ব্যবহার দেখানো হলো:

অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়): কি শিমু! দেখাই যায় না যে, একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠলে নাকি?

অগাধ জলের মাছ (অতিরিক্ত চালাক): রিয়া অগাধ জলের মাছ তাকে চেনা অত সহজ নয়।

অগস্ত্য যাত্রা (চিরতরে প্রস্থান): মায়ের সাথে ঝগড়া করে ছেলেটি সেই যে অগস্ত্য যাত্রা করল আর ফিরে এল না।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া): কুখ্যাত সন্ত্রাসী শাওন সড়ক দুর্ঘটনায় অক্কা পেয়েছে।

অহি-নকুল সম্পর্ক (চিরশত্রুতা): স্বার্থের কারণে দুভায়ের মধ্যে এমন অহি-নকুল সম্পর্ক যে একজন আরেকজনের কথা শুনতেই পারে না।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (অনুমানের উপর নির্ভর করা): অন্ধকারে ঢিল না ছুঁড়ে আসল বিষয় জানার চেষ্টা করো।

আক্কেল সেলামি (বোকামির দন্ড): নিজের ভুলের জন্যই এতগুলো টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

আদা জল খেয়ে লাগা (উঠে পড়ে লাগা): পরীক্ষায় পাস করার জন্য হ্যাপি এবার আদা জল খেয়ে লেগেছে।

ইঁদুর কপালে (মন্দ ভাগ্য): মেয়েটি এমন ইঁদুর কপালে যে জন্মের পর মা হারিয়েছে, দুদিন হলো বাপও মারা গেছে।

উত্তম-মধ্যম (মার-ধোর): চোরটিকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দাও।

উড়ো চিঠি (বেনামি চিঠি): উড়ো চিঠি পেলেও সতর্ক হওয়া ভাল।

একচোখা (পক্ষপাতদুষ্ট): তোমার একচোখা নীতির জন্যই সবাই সমালোচনা করে।

একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্য): একই সাথে ছেলের চাকরি ও মেয়ের বিয়ে – তোমার তো এখন একাদশে বৃহস্পতি।

ওজন বুঝে চলা (আত্মসম্মান রক্ষা করা): নিজের ওজন বুঝে না চললে বিপদ তো হবেই।

ওষুধ ধরা (ফল লাভ): মায়ের আদেশে ছেলেটির চাল চলনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, মনে হয় ওষুধ ধরেছে।

কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা): গতকাল যে বিষয়ে বলেছিলাম, সে বিষয়ে কোন উদ্যোগ নিও না, ওটা ছিল কথার কথা।

কাঁচা পয়সা (নগদ টাকা): কিছু দিন আগেও সে গরিব ছিল, বর্তমানে কাঁচা পয়সার মানুষ হয়ে গরিবকে দেখতেই পারে না।

কেঁচে গন্ডুষ (নতুন করে আরম্ভ করা): সারা বছর লেখা পড়া করলেও পরীক্ষার আগে পুরাতন পাঠগুলো কেঁচে গুন্ডুষ না করলে ভাল ফল আসা করা যায় না।

খয়ের খাঁ (গুণগায়ক): বিচক্ষণ রাজনীতিবিদরা খয়ের খাঁদের পছন্দ করেন না।

খুঁটির জোর (পৃষ্ঠপোষকের সমর্থন): খুঁটির জোর ছাড়া দুর্নীতি করে রেহাই পাওয়া যায় না।

গলগ্রহ (পরের বোঝা হয়ে থাকা): লেখাপড়া করেছ, এখন আর বাবার গলগ্রহ না হয়ে একটা কিছু করো।

গড্ডালিকা প্রবাহ (অন্যের অন্ধ অনুকরণ): গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে নিজের বুদ্ধিমত চলা ভাল।

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা): গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে আসল কথা বলো।

গোবরে পদ্ম ফুল (নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি): অত্যন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারের ছেলে নিজ যোগ্যতার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন, এ যেন গোবরে পদ্মফুল।

ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ): সুন্দরী মেয়েটাকে মা টাকার লোভে ঘাটের মড়ার সাথে বিয়ে দিল?

ঘোড়া রোগ (অতিরিক্ত প্রত্যাশা): ঘোড়া রোগ থাকলে শান্তি পাওয়া যায় না।

চোখের বালি (বিরক্তির কারণ): কারো চোখের বালি না হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলা ভাল।

চিনির বলদ (যে খাটে অথচ ফল পায় না): সারা জীবন চিনির বলদের মত কাজ করেই গেলাম, সুখ-শান্তি কিছু বুঝলাম না।

চাঁদের হাট (আনন্দের প্রাচুর্য): ধনে-জনে হামিদ সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।

চক্ষুদান (চুরি করা): চক্ষুদান স্বভাবটা বাদ দিতে পারলে মিজানকে সবাই ভাল বলতো।

ছাই চাপা আগুন (অপ্রকাশিত প্রতিভা): শান্তনুর মধ্যে ছাই চাপা আগুন আছে, একদিন সে মানুষ হবেই।

ছ-কড়া ন-কড়া (সস্তা): এত সুন্দর বাড়িটা ছ-কড়া ন-কড়া করে বিক্রি করা ঠিক হয় নি।

ছিনিমিনি খেলা (অপব্যয় করা): টাকা পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেল না, সময়ে কাজ দেবে।

জিলাপির প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি): নয়নকে সহজ মনে হলেও ওর মধ্যে রয়েছে জিলাপির প্যাঁচ।

জগদ্দল পাথর (কঠিন বিষয়): দায়িত্বটা যেন আমার উপর জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে আছে।

ঝাঁকের কৈ (একই দলভুক্ত): পরীক্ষায় নকল চলে বলে সবাইকে ঝাঁকের কৈ ভাবা ঠিক নয়, ভাল ছেলে-মেয়েরা নকল করে না।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ): ঝোপ বুঝে কোপ মারার কৌশল চয়নের জানা আছে।

টনক নড়া (সচেতন হওয়া): ছেলে মেয়ের কোন খোঁজ রাখতো না ছেলে এখন সন্ত্রাসী আর মেয়ে প্রমোদবালা এবার বাবা-মায়ের টনক নড়েছে।

টক্কর দেওয়া (প্রতিযোগিতা করা): খান সাহেবের সাথে টক্কর দেয়া আমাদের ঠিক হবে না।

টাকার গরম (অর্থের অহংকার): টাকার গরমে মুরুব্বিদের অপমান করা মূর্খের কাজ।

ঠোঁট কাটা (স্পষ্ট বক্তা): ঠোঁট কাটা লোকদের মেকি সমাজে মূল্য নেই।

ঠাট বজায় রাখা (চাল চলন ঠিক রাখা): ঠাট বজায় রেখে লাভ নেই, নিজের সামর্থ অনুযায়ী চলো।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কাজ করা): মেহের যে ডুবে ডুবে জল খায়, সে খবর আমার জানা আছে।

ডুমুরের ফুল (যার দেখা পাওয়া যায় না): আগে এত আসতে, চাকরি পেয়ে যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ!

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (লুকোচুরি): ঢাক ঢাক গুড় গুড়ের কিছু নেই, বিষয়টি এখন সবাই জানে।

ঢাকের কাঠি (অকর্মণ্য সঙ্গী): সুবর্নের মতো ঢাকের কাঠির সাথে সম্পর্ক থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না।

তীর্থের কাক (দীর্ঘ প্রতীক্ষাকারী): সামান্য সাহায্যের জন্য গরীব মানুষগুলো সেই থেকে তীর্থের কাকের মত বসে আছে।

তুলসী বনের বাঘ (ভন্ড সাধু): তুলসী বনের বাঘেরাই ক্ষতি করে।

তুষের আগুন (দীর্ঘ স্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা): সন্তান হারানো তুষের আগুন সবাই এর জ্বালা বোঝে না।

থোতা মুখ ভোঁতা হওয়া (গর্ব চূর্ণ হওয়া): ছেলের জন্যই তার থোতা মুখ ভোঁতা হলো।

দহরম মহরম (অন্তরঙ্গ সম্পর্ক): তাদের দুজনের মধ্যে বেশ দহরম মহরম আছে।

দা-কুমড়া সম্পর্ক (শত্রুতা): দুই ভায়ের মধ্যে এখন দা-কুমড়া সম্পর্ক।

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু): নিজের অবস্থা ভাল হলে দুধের মাছির অভাব হয় না।

দাঁও মারা (লাভ করা): পিঁয়াজের ব্যবসায় এবার অনেকেই দাও মেরেছে।

ধামাধরা (তোষামোদকারী): ধামা ধরাদের জন্যই সমাজের আইন-শৃঙ্খলার এ দুর্দশা।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (কোন কিছুকে তুচ্ছ মনে করা): কটা টাকার মানুষ হয়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছ?

ধরি মাছ না ছুঁই পানি (এমনভাবে কাজ করা যাতে দায়িত্ব থাকে না): এ বিষয়ে আমার ভূমিকা ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

ননীর পুতুল (অত্যন্ত আদুরে): তোমার মত ননীর পুতুলকে দিয়ে কাজ হবে না।

নিজের কোলে ঝোল টানা (স্বার্থপর): সম্পার মা নিজের কোলে ঝোল টানা ছাড়া কিছু বোঝে না।

নাক উঁচু (অহংকারী): বিয়ের ব্যাপারে অত নাক উঁচু করো না নিজের দিকটা একটু ভাবো।

নেই আঁকড়া (না-ছোড় বান্দা): তার মতো নেই আঁকড়া লোকের সাথে তোমার কথা বলতে যাওয়া ঠিক হয় নি।

পায়াভারী (অহংকারী): পায়াভারী স্বভাব ভাল না।

পুকুর চুরি (বড় রকমের চুরি): কর্মচারীদের পুকুর চুরির জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ার পথে।

পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তি): পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে বড় কাজ করা যায় না।

পাকা ধানে মই দেওয়া (প্রায় সমাপ্ত কাজ পন্ড করে দেওয়া): সে আমার সাথে এমন ব্যবহার করল যেন আমি তার পাকা ধানে মই দিয়েছি।

ফেঁপে উঠা (ধনবান হওয়া): চাঁদাবাজি করে লোকটা ফেঁপে উঠেছিল, এবার ধরা পড়েছে।

ফাঁদে পা দেওয়া (চক্রান্ত না বুঝে বিপদে পড়া): আগে জানলে কি আর কেউ ফাঁদে পা দেয়?

বক ধার্মিক (ভন্ড): বক ধার্মিক লোকেরা মেকি মুখোশে আদর্শের কথা বলে বেড়ায়।

বালির বাঁধ (অল্পেই যা নষ্ট হয়ে যায়): ধনীর সাথে বন্ধুত্ব যেন বালির বাঁধ, দুদিনেই শেষ হয়ে যায়।

বিড়াল তপস্বী (ভন্ড লোক): সাধু সেজে থাকা বিড়াল তপস্বীদের বড় গুণ।

ভেজা বিড়াল (দায়ে পড়ে ভাল মানুষ): মৌটুসী আস্ত ভেজা বিড়াল তাকে বিশ্বাস করো না।

ভুঁই ফোঁড় (হঠাৎ আবির্ভূত): নির্বাচনের সময় অনেক ভুঁই ফোঁড় নেতা দেখা যায়।

মাছের মা (নিজের সন্তানের জন্য মায়া নেই এমন মা): দুটো সন্তান রেখে মহিলা অন্যের ঘরে চলে গেল, ঠিক যেন মাছের মা।

মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য): মীনা সুন্দরী কিন্তু কোন কাজের নয়, ঠিক যেন মাকাল ফল।

মগের মুল্লুক (অরাজকতা): জোর করে জমি দখল করে রাখবে মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি?

মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ): ডলির কথা যেন মিছরির ছুরি, শুনতে ভাললাগে কিন্তু অন্তরে গিয়ে ঘা লাগে।

যমের দোসর (ভয়ানক লোক): গ্রামের মাতব্বর যমের দোসর তার থেকে সবাই দূরে থাকতে চায়।

রগচটা (যে একটুতেই রেগে যায়): রগচটা লোক রাজনীতি করতে পারে না।

রাবণের চিতা (দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ): একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বৃদ্ধার অন্তর রাবণের চিতার মত জ্বলছে।

লেফাফা দুরস্ত (অতিরিক্ত বাবুভাব): লেফাফা দুরস্ত স্বভাব বাদ দিয়ে কাজে মন দাও।

লালবাতি জ্বলা (ব্যবসা গুটানো): বেহিসেবি হলে দোকানে তো লালবাতি জ্বলবেই।

শাপে বর (মন্দের বদলে ভাল হওয়া): বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তার শাপে বর হয়েছে, সে এখন একজন বড় অফিসার।

শাঁখের করাত (উভয় সংকট): একদিকে জামাই অন্যদিকে ছেলে, কেউ কাউকে দেখতে পারে না; এ যেন শাখের করাতের মধ্যে পড়েছি।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ): আমার এখন শিরে সংক্রান্তি আর তুমি রসিকতা করছো!

শনির দৃষ্টি (কুদৃষ্টি): শনির দৃষ্টির মধ্যে আছি যা করতে যাই তাতেই লোকসান।

ষোল আনা (সম্পূর্ণ): ষোল আনা সুখী লোক পাওয়া যায় না।

সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রীয় দর্শক): সাক্ষী গোপালের মত সবাই দাঁড়িয়ে দেখলো ছিনতাইকারী কিভাবে ছিনতাই করে।

সাপে নেউলে (প্রচন্ড শত্রুতা): সুস্মিতা ও সুমির মধ্যে এখন শাপে নেউলে সম্পর্ক দুদিন আগেও ছিল গলায় গলায় ভাব।

সরিষার ফুল দেখা (চোখে অন্ধকার দেখা): ঠিকমত লেখা পড়া না করলে পরীক্ষার সময় চোখে সরিষার ফুল দেখতে হবে।

সোনার পাথর বাটি (অসম্ভব বস্তু): তোমার গত্ম আমার কাছে সোনার পাথর বাটির মতো মনে হলো।

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল): পাঁচশ' টাকায় এখন আমার হাতের পাঁচ এ থেকে ধার দিতে পারবো না।

হ-য-ব-র-ল (বিশৃংক্মখলা): অঙ্কের উত্তর এমন হ-য-ব-র-ল করে লিখেছ কেন?

হাতটান (চুরির অভ্যাস): নয়নের হাতটানের অভ্যাস আছে।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা): আমার সাথে দুই নম্বরী করলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রবাদ ও বাগ্‌ধারা কাকে বলে? উদাহরণসহ প্রবাদের উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

২। নিচের বাগ্‌ধারাগুলোর অর্থসহ বাক্যে প্রয়োগ দেখান:

হাঁড় জুড়ানো, লম্বা দেওয়া, রক্তের টান, ভরাডুবি, পেটেভাতে, পটল তোলা, ডান হাতের কাজ, টইটুম্বর, তাসের ঘর, ছা-পোষা, চোরা বালি, চোখের পর্দা, কলির সন্ধ্যা, আদিখ্যেতা, ইঁচড়ে পাকা, আষাঢ়ের গল্প, অরণ্যে রোদন, অর্ধচন্দ্র দেওয়া, অগ্নি পরীক্ষা, অন্তরটিপুনি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রবাদ বলতে কী বোঝেন?

২. বাংলা ভাষায় প্রবাদের উদ্ভদ কিভাবে হয়েছে?

৩. বাগ্‌ধারার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

নির্দেশ	প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

৩

বাংলা ভাষার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

ভাষামাত্রেরই নিয়ম রয়েছে। নিয়ম বলতে ভাষার অন্তর্গত শৃঙ্খলাকে বোঝায়; আর শৃঙ্খলার বিষয়টি ভাষার প্রায়োগিক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাষা বাস্তব অর্থে অসংখ্য বাক্যেরই সমষ্টি। বাক্যের শব্দগুলিকে আবার বিশৃঙ্খল বা এলোমেলোভাবে ব্যবহার করলে চলে না; নির্দিষ্ট ক্রমানুসারেই সেগুলি ব্যবহৃত হতে হয়। ক্রমানুসারে শব্দ ব্যবহৃত না হলে বাক্যও গঠিত হয় না। কেননা তা কোন অর্থ প্রকাশ করে না। এ জন্য বাক্যে শব্দের প্রায়োগিক রীতির বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শব্দের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবে বানান রীতিও আসে। কেননা বানানের সাহায্যেই শব্দ লিখিত হয়।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ-১. বাংলা শব্দের প্রয়োগরীতি
- পাঠ-২. বাংলা বানানের নিয়ম
- পাঠ-৩. বাংলা শব্দের যথার্থ প্রয়োগ

পাঠ - ১

বাংলা শব্দের প্রয়োগরীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

- *শব্দের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;*
- *শব্দের গঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;*
- *রচনার বিষয় অনুসারে শব্দ প্রয়োগ করতে পারবেন।*

সাধারণভাবে শব্দ বলতে বাক্যের ক্ষুদ্রতম উপাদান বা একককে বোঝায়। কিন্তু শব্দের সংজ্ঞা দিতে গেলে এ জাতীয় সংক্ষিপ্ত উক্তিতে শব্দকে পরিপূর্ণভাবে ধরা যায় না। তখন আর একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, বলতে হয়: শব্দ হচ্ছে এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বিত রূপ যা উচ্চারণ করা যায় এবং যার অর্থ আছে ও ভাষায় ব্যবহৃত হয়। শেষের কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষায় শব্দের ব্যবহারের দিকটিই এর প্রয়োগগত দিক এবং এর গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণই হচ্ছে শব্দের প্রয়োগগত রীতির আলোচনা। এ ক্ষেত্রে আমরা দুটি মানদন্ড গ্রহণ এবং সে-অনুসারে শব্দের প্রয়োগরীতি বিশ্লেষণ করতে পারি: (এক) শব্দের সংগঠনের দিক, (দুই) শব্দের নির্বাচনের দিক।

শব্দ হচ্ছে এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বিত রূপ যা উচ্চারণ করা যায় এবং যার অর্থ আছে ও ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

শব্দের গঠন প্রক্রিয়া স্তরবাহিক। এ প্রক্রিয়াকে তুলনা করা যায় বৃক্ষের সঙ্গে। একটি গাছের নানা অংশ বা অঙ্গ থাকে। শিকড়, কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা–সব মিলিয়েই বৃক্ষ। শব্দেরও একটি অনিবার্য বা পরিণামী রূপ আছে। একে বলে বাক্য। শব্দের প্রয়োগ বাক্যেই ঘটে। কিন্তু শব্দ বাক্যে আশ্রিত হলে তাকে আর শব্দ বলা যায় না। তাকে বলা হয় পদ। পদের গঠন-প্রক্রিয়া সে হিসেবে হয়: শব্দ + বিভক্তি = পদ। তার আগে শব্দের আর একটি দিক তুলে ধরা প্রয়োজন, আর তা হলো শব্দের গঠন। শব্দমাত্রই দুই শ্রেণীর: মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ। মৌলিক শব্দগুলি হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। হাত, পা, মাথা, মুখ, সাগর– এগুলি মৌলিক শব্দের উদাহরণ। এ সব শব্দে কোন অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত হয় নি। কিন্তু সাধিত শব্দে কিছু ব্যাকরণিক উপাদান যুক্ত হয়। বাংলা সাধিত শব্দ গঠিত হয় তিন-ভাবে, প্রত্যয়ের সাহায্যে, উপসর্গের সাহায্যে ও সমাসের সাহায্যে। প্রত্যয় দুই ধরনের। কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। কৃৎ-প্রত্যয়ের কাজ হলো নতুন শব্দ তৈরি করা। যেমন; 'পড়ু' একটি ক্রিয়া। এর পর 'উয়া' প্রত্যয় যুক্ত হলে হয় 'পড়ুয়া'। এখানে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। মনে রাখবেন, নতুন শব্দ তৈরির ব্যাপারটি বোঝা যায় চারটি পরীক্ষার মাধ্যমে। এগুলি হলো ধ্বনির পরিবর্তন, রূপের পরিবর্তন, অর্থের পরিবর্তন ও পদের পরিবর্তন। এখানে এই চারটি পরিবর্তনই সাধিত হয়েছে। পড়ু ও 'পড়ুয়া'-র ধ্বনিসাম্য এক নয়, এ দুইয়ের রূপ বা দৃষ্টিগ্রাহ্য চেহারা পৃথক, দুটি শব্দের অর্থও ভিন্ন। 'পড়ু' ক্রিয়া কিন্তু 'পড়ুয়া' বিশেষ্য। বাংলা নতুন শব্দ উপসর্গ যোগেও তৈরি হয়। কিন্তু সব সময় তা হয় না। 'হার'-এর আগে 'উপ' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'উপরহার'। এটি নতুন শব্দ। এখানে আগের চারটি শর্তই পূরণ হয়েছে। কিন্তু 'গাছ' শব্দের পূর্বে 'আ' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'আগাছা'। 'গাছ' ও 'আগাছা' শব্দের অর্থগত পার্থক্য নেই এবং এ দুয়ের পদ-পরিচয় ও অভিন্ন, দুটি শব্দই বিশেষ্য। সমাসের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্যণীয়। বাংলা সমাসের মাধ্যমে কখনো নতুন শব্দ তৈরি হয় আবার কখনো শব্দের রূপের সম্প্রসারণ বা প্রসারণ ঘটে। শব্দ প্রয়োগ করতে হলে সাধিত শব্দের গঠন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হয়। এ প্রসঙ্গে দুটি শব্দের উল্লেখ করা যায়। আজ-কাল অনেকেই 'উৎকর্ষতা', 'দীর্ঘসূত্রিতা' বলেন ও লেখেন। কিন্তু গঠনের দিক থেকে দুটি শব্দই ভুল। 'উৎকর্ষ' বিশেষ্য একে নতুন করে তদ্ধিত প্রত্যয় 'তা' বসিয়ে বিশেষ্য করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে 'দীর্ঘসূত্র'-এর পর 'তা' প্রত্যয় বসালে শব্দটি হয়ে 'দীর্ঘসূত্রতা'।

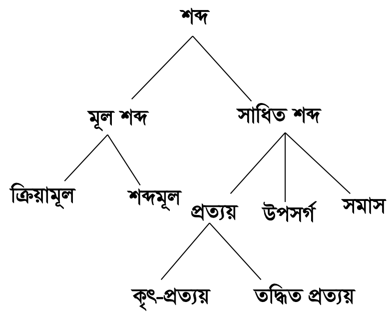

চিত্র-০২ : বাংলা শব্দের গঠন প্রক্রিয়া

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আবার আমরা বিভক্তিতে ফিরে আসি। বিভক্তি দুই প্রকার: শব্দ-বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি। কিছু বিভক্তি আছে যেগুলি কেবল শব্দের পরে বসে। এগুলিকে বলে শব্দবিভক্তি। এগুলির আবার এক-বচন ও বহু-বচন ভেদ আছে। বাক্যের পদগুলিতে বিভক্তি কীভাবে বসে তা বোঝা যায় কারকের মাধ্যমে। চলিত বাংলা ভাষায় বিভিন্ন কারকে বচন ভেদে শব্দ-বিভক্তি দেখানোর জন্যে একটি শব্দ, 'ছেলে' কে গ্রহণ করা যাক। এ শব্দে বিভক্তিগুলির প্রয়োগ নিচের সারণিতে দেখানো হলো (চলিত বাংলায় কর্ম ও সম্প্রদান কারকে শব্দ বিভক্তি রূপে কোন পার্থক্য নেই বলে তা দেখানো হয়নি)।

কারক	**এক-বচনের রূপ**	**বহু-বচনের রূপ**
কর্তৃ	ছেলে	ছেলেরা, ছেলেগুলি
কর্ম	ছেলেকে	ছেলেদের, ছেলেদেরকে
করণ	ছেলে দ্বারা, ছেলেকে দিয়ে, ছেলের দ্বারা	ছেলেদের দ্বারা, ছেলেদের দিয়ে
অপাদান	ছেলের থেকে, ছেলে হতে	ছেলেদের থেকে, ছেলেদের হতে
অধিকরণ	ছেলেকে, ছেলেতে, ছেলের মধ্যে	ছেলেদের মধ্যে

ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি কেবল ক্রিয়া-মূলের পরে বসে। এগুলি প্রয়োগ করতে হয় কাল-রূপ বোঝানোর জন্যে। বাংলায় মৌলিক কাল তিনটি, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। আমাদের ভাষায় মধ্যম পুরুষের এক-বচন ও বহু-বচনের দুটি রূপ আছে: একটি সাধারণ এবং অপরটি হলো গুরু বা সম্মানার্থক। বাংলা ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি প্রয়োগের একটি তালিকা নিচে সারণিতে দেখানো হলো।

	বর্তমান কাল	**অতীত কাল**	**ভবিষ্যৎ কাল**
আমি	-ই (পড়ি)	-লাম (পড়লাম)	-বো (পড়বো)
তুমি	-ও (পড়ো)	-এ (পড়েছিলে)	-বে (পড়বে)
তুই	-ইশ (পড়িশ)	-তিশ (পড়তিশ)	-বি (পড়বি)
সে	-এ (পড়ে)	-ল (পড়ল)	-বে (পড়বে)
আপনি	-এন (পড়েন)	-লেন (পড়লেন)	-বেন (পড়বেন)

বাংলা শব্দের যথার্থ প্রয়োগে পদগুলির গঠনের পরেই বিবেচ্য বিষয় এগুলির বিন্যাস। বাংলা বাক্য-গঠন রীতি অনুসারে কর্তার পরে থাকে কর্ম এবং সব শেষে আসে ক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া = বাক্য। যেমন: 'আমি ভাত খাই'। এটি একটি বাক্য। এ বাক্যে 'আমি' হচ্ছে কর্তা, 'ভাত' কর্ম আর 'খাই' হচ্ছে ক্রিয়া। উল্লেখ করা যায় যে, বাক্য সরল হতে পারে, যৌগিক হতে পারে, আবার জটিলও হতে পারে। কিন্তু সর্বত্রই বাক্যের এ ক্রম অনুসরিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ কালে কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। সৃষ্টিশীল

লেখকেরা অনেক সময় বাক্য গঠনের সাধারণ নিয়মে কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন। গদ্যকে স্বতন্ত্র, লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিচিত করাই এ প্রবণতার মূল লক্ষ্য। উদাহরণ দেওয়া যাক:

"এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়-বড় বট, সারি সারি তাল, তমাল, পাহাড় পর্বত আর ছিল ছোট নদী।"

উদাহরণের প্রথম বাক্যটি কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া আশ্রয়ী। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে সেই ক্রম অনুসরণ করা হয়নি। এখানে ক্রিয়া আছে কর্মের পূর্বে। এ ধরনের বৈচিত্র্যে বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে তা গ্রহণ করতে আমাদের দ্বিধা থাকে না।

এবার বিবেচনা করা যাক শব্দের নির্বাচনের দিকটি। কোন বক্তব্য বা রচনা বিষয় নিরপেক্ষ নয়। ফলে শব্দ নির্বাচন করতে হয় বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যম আছে। কোনটি উপন্যাস, কোনটি ছোটগল্প, কোনটি নাটক আবার কোনটি প্রবন্ধ। কবিতা ও একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য মাধ্যম। কিন্তু এ সবের মূলে আছে শব্দ প্রয়োগের রীতি বা কৌশল। কবিতা মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে স্পর্শ করে। ফলে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ নির্বাচনে কবিকে হতে হয় সচেতন। কবিতার শব্দ কবির অনুভূতিগ্রাহ্য শব্দ, তাঁর চেতনা প্রকাশের উপযোগী শব্দ। উপন্যাস কথাবিস্তার। জীবনের পরিপূর্ণ রূপকেই ঔপন্যাসিক ধরতে চান। তাই তাঁর অভিপ্রায় ভিন্ন। জীবনের পূর্ণ বাস্তবতাকে প্রকাশের উপযোগী শব্দই ঔপন্যাসিকের আশ্রয়। ছোটগল্প কথাসংক্ষেপ। উপন্যাসের মতো স্বাধীনতা ছোটগল্পকার ভোগ করতে পারেন না। জীবনের নির্বাচিত কিছু মুহূর্তের রূপায়নই হচ্ছে ছোটগত্ম। গল্পকারকে তাই শব্দ নির্বাচনে অতিমাত্রায় সচেতন থাকতে হয়। নাটক মূলত সংলাপধর্মী রচনা। পাত্র-পাত্রীদের মুখনিঃসৃত সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। নাটকের ভাষা মুখের ভাষার কাছাকাছি। নাট্যকারের তাই শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হয়। প্রবন্ধ যুক্তিময় ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। এ ভাষার মধ্যে থাকে যুক্তির ও তর্কের ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ আমরা যে মাধ্যমেরই চর্চা করি না কেনো, সর্বত্রই রয়েছে স্বতন্ত্র রীতি, শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য। ভাষার চর্চা করলে আমাদের সেই কৌশল বা প্রয়োগ রীতি অবশ্যই আত্মস্থ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলা শব্দের প্রয়োগরীতি বলতে কী বোঝেন? বিষয় অনুসারে শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শব্দ প্রয়োগ রীতি বলতে কী বোঝান তা লিখুন।

২. বাংলা শব্দ কীভাবে গঠিত হয়।

৩. কীভাবে বিষয় অনুসারে শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগ করা যায়?

নির্দেশ	মূল পাঠটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরি করুন।

পাঠ - ২

বাংলা বানানের নিয়ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- *এ পাঠটি পড়ে আপনি বানান কাকে বলে তা জানতে পারবেন;*
- *বাংলা তৎসম ও অতৎসম বানানের সূত্র সম্পর্কে ধারণা পাবেন।*

'বর্ণন' শব্দ থেকে বানানের উৎপত্তি। 'বর্ণন' শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলা বা প্রকাশ করা। কিন্তু এ উক্তি থেকে বানান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় না। ফলে তা আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। বানান একান্তভাবেই লিখিত ভাষার জন্য। সে হিসেবে বলতে হয়, বানান হলো মূলত স্বরধ্বনির পর ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির পর স্বরধ্বনি যোগ করার রীতি বা লিখন-সংবিধান (Writing system)। কিন্তু কোন ভাষাতেই বাগধ্বনির উচ্চারণ অনুসারে বানান লেখা হয় না। পৃথিবীর ভাষাগুলির বানান রীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে দুটি প্রথা চালু আছে। এ দুয়ের প্রথমটিকে বলা যায় স্মৃতিময় ব্যবস্থা। এ পদ্ধতিতে উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। বাংলা ভাষাতেই এমন ব্যবস্থা বর্তমান। আমরা লিখি 'পদ্ম' কিন্তু উচ্চারণ করি 'পদ্‌দোঁ। কবে ও কীভাবে এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তা জানা যায় না। এ অবস্থায় বানান শেখার উপায় হচ্ছে স্মৃতিতে শব্দের বানানকে ধারণ করে রাখা।

বানান হলো মূলত স্বরধ্বনির পর ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির পর স্বরধ্বনি যোগ করার রীতি বা লিখন-সংবিধান ।

দ্বিতীয় সংবিধিটি প্রথমটির তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত রীতির পাশাপাশি এ পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। আমরা উচ্চারণ অনুসারে লিখি 'তিনি', 'একুশ', 'ধান'। মনে তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, বানান তাহলে কীভাবে শেখা যাবে। বানানের কোন নিয়ম বা সূত্র আসলে নির্দেশ করা হয় কি? এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর সর্বাংশে সন্ধান করা হয়তো যাবে না। কিন্তু উত্তর খুঁজতে অনেক দূরই অগ্রসর হওয়া যাবে এবং সেই প্রচেষ্টা থেকে বাংলা বানানের সূত্রও মোটামুটি তুলে ধরা সম্ভব।

বাংলা বানানের ইতিহাস বা উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, আমাদের ভাষার শব্দগুলির বানান লেখার সঙ্গে এ ভাষার শব্দগুলির পরিচয় গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। আমরা জানি, উৎসের দিক থেকে বাংলা শব্দকে মূলত দু-ভাবে বিভাজিত করা হয়। প্রথমত, তৎসম শব্দ এবং দ্বিতীয়ত, অতৎসম শব্দ। 'তৎসম' অর্থ তার সম বা মতো। এখানে সংস্কৃতের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এ জাতীয় শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সংস্কৃত থেকে শব্দ গ্রহণ করলেও সে-ভাষার উচ্চারণ আমরা গ্রহণ করিনি। এ জন্যেই এগুলি তৎসম বা সংস্কৃতের সম।

দ্বিতীয় বা অতৎসম শব্দগুলির পরিধি অনেক ব্যাপক। এর মধ্যে অর্ধ-তৎসম বা সংস্কৃত থেকে কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় আগত শব্দগুলি, তদ্ভব শব্দ বা সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে তারপর আর এক দফা পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় স্থান পাওয়া শব্দসমূহ, বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দগুলি বা দেশী শব্দ এবং ইয়োরোপীয় ও এশিয়া ভাষা থেকে বাংলায় স্থান পাওয়া সব ধরনের বিদেশী শব্দ অন্তর্ভুক্ত। বাংলা বানানের সূত্রও শব্দের এই উৎসগত পরিচয় অনুসারে নির্ণীত হয়েছে।

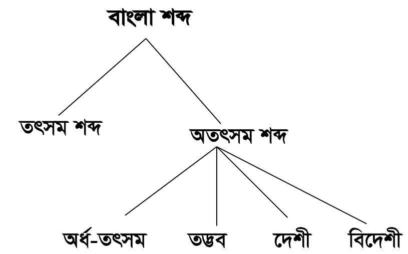

চিত্র-১ : উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার

তৎসম শব্দের বানান

এ শ্রেণীর শব্দগুলির বানান সুনির্ধারিত অর্থাৎ, মূল ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এগুলির কোন পরিবর্তন তাই সম্ভব নয়। এ সব শব্দের বানান শেখার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এ সম্পর্কিত সূত্র বা নিয়মগুলি জেনে নেওয়া। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম আলোচনা করা হলো।

ই-কার

১. 'ইচ্', 'ইত' প্রত্যয় সাধিত শব্দে চ ও খন্ড ৎ বাদ যায় এবং ই রক্ষিত থাকে বলে এ-সব শব্দে ই (ি) কার হয়। যেমন; চুলাচুলি, কেশাকেশি।

২. 'ইত' প্রত্যয় কৃৎ ও তদ্ধিত দুইই। কৃৎ প্রত্যয় 'ইত' ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠন করে। 'ইত'-এর 'ই' তখন ই কারে পরিণত হয়। যেমন; লিখিত, রক্ষিত, পতিত, জারিত, ঘটিত।

৩. কৃৎ প্রত্যয় 'ইত্র', 'ইষ্ণু' যোগে গঠিত শব্দে ই-কার হয়। যেমন; চরিত্র, পবিত্র, বহিত্র, বর্ধিষ্ণু, সহিষ্ণু।

৪. সংস্কৃত 'ইমা' (<ইমন), 'ইল', 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগে তৈরি শব্দে আশ্রিত ব্যঞ্জনে ই-কার হয়। যেমন; নীলিমা, গরিমা, লঘিমা।

৫. তদ্ধিত প্রত্যয় 'ইল' শব্দের শেষে বসলে চ বাদ যায় এবং ই রূপ পায় ই-কারে। যেমন; পিচ্ছিল, জটিল, ফেনিল।

৬. তদ্ধিত প্রত্যয় 'ইষ্ঠ' শব্দে যুক্ত হলে এর ই রূপ পায় ই-কারে। যেমন; গরিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কনিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ।

৭. 'ইক' প্রত্যয়ের সাহায্যে 'সময়'; 'ব্যবসায়', আচরণ প্রভৃতি বোঝাতে যে-সব বিশেষণ পদ গঠিত হয় সেগুলিতে ই-কার হয়। যেমন; ঐচ্ছিক, মৌখিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আধুনিক।

৮. তৎসম শব্দের প্রাতিপাদিক রূপ বা সমাস হলে পূর্বের দীর্ঘ-স্বর হ্রস্ব-স্বরে অর্থাৎ, ঈ হয় ই (ঈ>ই) বা ই-কার। যেমন; মন্ত্রিসভা, প্রাণিবিদ্যা, শিত্মিমানস।

৯. সংস্কৃত 'ঈ' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দের শেষে -তা, -ত্ব প্রত্যয় যুক্ত হলে ঈ-কার (ী) হয় ই-কার। যেমন: উপকারিতা, প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা।

ঈ-কার

১. 'অনীয়' প্রত্যয় ক্রিয়ামূলের শেষে বসে বিশেষণ পদ তৈরি করে। এ সব শব্দে ঈ-কার হয়। যেমন; পালনীয় গ্রহণীয়, সহনীয়, পানীয়।

২. তৎসম 'ইন' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে ইন-এর জন্যে ঈ-কার হয়। যেমন; দায়ী, যোগী, গুণী, ধনী।

৩. 'ঈ' স্ত্রী প্রত্যয়। তাই পুরুষবাচক শব্দের শেষে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাক শব্দ গঠিত হয়। এ সব শব্দে ঈ-কার হয়। যেমন; কুমারী, মানবী, ছাত্রী, দেবী, সখী, সুন্দরী।

৪. ঈর প্রত্যয়ের মূল 'ইরচ'। ধাতুর পরে বসলে এর 'চ' বাদ দিয়ে -'ঈর' থাকে। যেমন, গভীর, শরীর।

৫. ‘ঈন’, ‘ঈয়’ প্রত্যয়ের ব্যবহার বিচিত্র। যে-সব তৎসম শব্দে ঈ-কার অনিবার্য বলে মনে করা হয়, সেগুলির মধ্যে ‘ঈন্’ ও ‘ঈয়’ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ জাতীয় কিছু শব্দ হচ্ছেঃ কুলীন, গ্রামীণ, প্রাচীন, নবীন।
৬. সংস্কৃত ‘বিন’ প্রত্যয় শব্দের পরে বসলে শেষের ই বাদ যায়। তখন থাকে ‘বিন’। যেমন, মেধাবিন; মায়াবিন। কিন্তু বাংলায় এ সব শব্দ প্রথমার এক-বচনের রূপ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এ সব শব্দে বিন স্থলে -বী হয়। যেমন; মেধাবী (মেধা+বী<বিন), মায়াবী।
৭. স্বর সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধির সাহায্যে গঠিত কিছু শব্দে ঈ কার হয়। স্বর সন্ধিতে ই+ই=ঈ (উদাহরণ; অভি+ইষ্ট=অভীষ্ট, রবীন্দ্র, অতীত), ই+ঈ=ঈ(প্রতীক্ষা, অধীশ্বর), ঈ+ই= ঈ(শচীন্দ্র, মহীন্দ্র), ঈ +ঈ =ঈ (সতীশ, রজনীশ) হয়। বিসর্গ সন্ধিতে বিসর্গের পর কেবল র থাকলে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় এবং বিসর্গ লোপ পায়। যেমন; নীরব (নিঃ+রব) নীরক্ত, নীরস, নীরোগ।
৮. পূর্বপদে ‘বীত’ থেকে যে-সব সমাসবদ্ধ পদ বা যৌগিক শব্দ তৈরি হয় সেগুলিতে ঈ-কার (বী-) হয়। যেমন, বীতনিন্দ্রা, বীতভয়।

উ-কার [ু], ঊ [ূ],

তৎসম শব্দে তিনটি ক্ষেত্রে ঊ-কার হয়।

১. আদিতে ঊ আছে এমন শব্দে ঊ [ূ] কার হয়। যেমন; ঊরু, ঊর্মি, ঊষর, ঊষা।
২. কিছু শব্দের শেষে ঊ-কার হয়। যেমন; উলূ, কূট, কূপ, ঘূর্ণ, তূর্ণ, দূষণ, ধূসর, শূন্য।
৩. সন্ধিবদ্ধ কিছু শব্দে উ+উ=ঊ বা উ-কার এবং ই+ঊ = ঊ হয়। যেমন; কটূক্তি, মরূদ্যান, ন্যূন।
৪. তৎসম‘ঊন’ উপসর্গের মূলে ঊ থাকায় এ উপসর্গে গঠিত শব্দে ঊ হয়। যেমন, ঊনিশ,ঊনচল্লিশ।

ঙ, ঞ, অনুস্বার (ং)

১. সুসংহত মৌল বা একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দে অনুস্বর হয় না। এ সব শব্দে ঙ হয়। যেমন; অঙ্ক, পঙ্ক, বঙ্কিম, শঙ্খখ বঙ্গ, ভঙ্গ, ল–ঘন, সঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা।
২. চ-বর্গীয় ব্যঞ্জনের পূর্বে যুক্ত বর্ণ রূপে ঞ ব্যবহৃত হয়। যেমন; পঞ্চাশ, চঞ্চল,মঞ্চ, লাঞ্ছনা, ব্যঞ্জন।
৩. ব্যঞ্জন সন্ধিতে ম-এর পর ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ব্যঞ্জন থাকলে ম-এর স্থলে অনুস্বার হয়। যেমন, শংকর (শম + কর), সংখ্যা, সংগীত, সংঘর্ষ, সংঘাত।
৪. ম-এর পর য, র, ল, ব থাকলে কিংবা শ, ষ, হ, ম থাকলে ম-এর স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন; সংযোগ (সম্+যোগ), সংরাগ, সংহার।

মূর্ধন্য ণ

তৎসম শব্দে সাধারণত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়:

১. ঋ, র, ষ -এর পর মূর্ধণ্য ণ হয়। যেমন, ঋণ, ত্রাণ, অরণ্য, অর্ণব, কর্ণ।
২. ট-বর্গীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ণ হয়। যেমন, কন্টক, কান্ড , কুণ্ঠা, ঠান্ডা, চান্ড, মন্ডল, গন্ডার।
৩. একই পদের মধ্যে ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় (ক, খ, গ, ঘ) বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ (প, ফ, ব, ভ), য, ব, হ, ও অনুস্বার [ং] থাকলে ণ হয়। যেমন; কৃপণ, ম্রিয়মাণ, গ্রহণ, দর্পণ।
৪. প, পরা, নির্ উপসর্গের পর ন্ম, নশ্, নুদ, অন্, হন্ ধাতুর ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন, প্রণতি, প্রাণিধান, পরায়ণ, পরিবহণ, উত্তরায়ণ।
৫. কিছু সমাসবদ্ধ শব্দে সব সময় ণ হয়। যেমন; অগ্রণী, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন।
৬. কিছু শব্দে সব সময়ই ণ হয়। এগুলিকে বলে নিত্য মূর্ধন্য বাচক শব্দ। যেমন; অণু, কণা, কল্যাণ, পণ, গণ্য, নিপুণ, ফণা, বাণিজ্য ইত্যাদি।

দন্ত্য ন [দন্তমূলীয় ন]

ণত্ব বিধিতে নিম্নোক্ত শব্দে ণ ব্যবহার নিষেধ আছে। এ সব শব্দ দন্ত্য ন হবে। যেমন;

১. ত-বর্গীয় (ত, থ, দ, ধ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের নাসিক্য বর্ণ কেবলই দন্ত্য ন হয়। যথা; দন্ত, পান্থ, দ্বন্দ্ব, বন্ধু, কান্ত, চিন্তিত, জন্তু, পান্থ, অনন্ত, উড়ন্ত, গ্রন্থ, মন্থন, চন্দ্র ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ-র এর অন্য কোন বর্গীয় ব্যঞ্জন থাকলে দন্ত্য ন হয়। যথা: দর্শন, অর্চনা, প্রার্থনা, কর্তন, মার্জনা, আবর্তন।

৩. 'অহ্ন' যোগে গঠিত শব্দে ন হয়। যথা: আহ্নিক, মাত্র্যাহ্ন, সায়াহ্ন।

৪. কিছু তৎসম শব্দের সমাস হলেও পরপদের দন্ত্য ন-এর পরিবর্তন হয় না। যথা; সর্বনাম, দুর্নীতি, বরানুগমন।

৫. কিছু তৎসম শব্দে সন্ধির দ্বারা দন্ত্য ন ব্যবহার নির্ধারিত হয়েছে। যথা; জগন্নাথ (জগৎ+নাথ), কান্না(কাঁদ + না)।

৬. কিছু পদের শেষে স্বভাবতই ন হয়। যথা; শ্রীমান।

৭. তৎসম কৃৎ প্রত্যয় 'নক' এবং 'নঞ', 'নঙ' যুক্ত পদে দন্ত্য ন-এর ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত। 'নক' যোগে গঠিত শব্দে শেষের ক ধ্বনিটি রক্ষিত হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা সাধিত শব্দে কেবল ন পাই। যথা; মীন, ফেন, প্রশ্ন।

তালব্য শ

তৎসম শব্দে শ-এর ব্যবহার নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে:

১. যে সব তৎসম শব্দে কেবল শ আছে সেগুলিতে তা রক্ষিত হয়। যেমন; শক্ত, শক্র, শঙ্কা, শব, শঙ্খখ, শকট; দর্শন, শশী, নাশ, দশ, স্পর্শ।

২. চ বা ছ পরে থাকলে সন্ধিতে বিসর্গের স্থলে শ হয়। যেমন: নিশ্চয় (নিঃ + চয়), নিশ্ছিদ্র, দুশ্চিন্তা, নিশ্চিন্ত।

৩. নিপাতনে সিদ্ধ কিছু সন্ধিবদ্ধ শব্দে শ হয়। যেমন; আশ্চর্য, হরিশ্চন্দ্র।

মূর্ধন্য ষ

তৎসম শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার ষত্ববিধির দ্বারা নির্ধারিত। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি হলো:

১. অ, আ ছাড়া স্বরবর্ণ এবং ক ও র-এর পরস্থিত প্রত্যায়াদির দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন; ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, গোষ্পদ।

২. ট-বর্গীয় সংযুক্ত বর্ণে সব সময় ষ হয়। যেমন; অষ্ট, কষ্ট, ওষ্ঠ, বৃষ্টি, স্পষ্ট, অনিষ্ট, শ্রেষ্ঠ।

৩. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর ষ হয়। যেমন; অভিষেক (অভি+সেক), বিষণ্ণ, সুষমা, নিষিদ্ধ।

৪. কিছু শব্দে সব সময় ষ হয়। যেমন; কলুষ, দোষ, আষাঢ়, কৃষক, বিষয়।

৫. ঋ, র রেফ-এর পর ষ হয়। যেমন; কৃষক, ঋষি, বর্ষ।

৬. সন্ধিতে ই-পরস্থ বিসর্গের পর ক, প, ফ থাকলে বিসর্গের স্থলে ষ হয়। যেমন; নিষ্পাপ, নিষ্ফল, নিষ্কর।

দন্ত্য স/ দন্তমূলীয় স

তৎসম স ব্যবহারের পরিমাণ অধিক। ষত্ব বিধি অনুসারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স ব্যবহার করতে বলা হয়েছে:

১. 'সাৎ' প্রত্যয় সাধিত শব্দে স হবে। যেমন; ধূলিসাৎ, আত্মসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ।

২. পূর্বপদে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গ যুক্ত হলেও কিছু শব্দে স হবে। যেমন; পরিসীমা, পরিস্থিতি, বিসংবাদ, অনুসরণ, সুসময়।

৩. ত-বর্গীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনে স হবে। যেমন; প্রস্তর, স্থান, অস্ত, বস্ত্র, সমস্ত, স্থগিত, প্রস্তাব, স্থপতি।

৪. 'স্পৃহ্', 'স্পন্দ্', 'স্ফুট্', ও 'স্ফর্' ধাতু যোগে গঠিত শব্দে স হবে। যেমন; নিস্পৃহ, নিস্পন্দ, দন্তস্ফুট, পরিস্ফুট, বিস্ফোরণ।

য-ফলা

যে-সব তৎসম শব্দে 'য' স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, সে-সব শব্দের বানানে অবশ্যই 'য' রক্ষা করতে হবে। যেমন; যাওয়া, যাযাবর, যাত্রা, যদি। কিন্তু কিছু শব্দ আছে যেগুলিতে 'য'-এর ব্যবহার সংক্ষিপ্ত আকারে অর্থাৎ , ফলা হিসেবে হয়। এ জাতীয় শব্দগুচ্ছে সাধারণত প্রত্যয় দ্বারা তৈরি। নিচে প্রত্যয়ের উদাহরণসহ এগুলি দেখানো হলো:

১. সংস্কৃত 'যৎ' প্রত্যয় কৃৎ ও তদ্ধিত উভয় হতে পারে। এর আদি রূপ যথাক্রমে 'ক্যঙ, 'ক্যপ', ন্যাৎ, 'যঙ' এবং 'যৎ'। এ সব প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দে তাই য-ফলা [্য] হয়। যেমন, ভৃত্য, বিদ্যা, শ্রাব্য, লভ্য, ব্যাখ্যেয়।
২. তদ্ধিত প্রত্যয় 'যৎ', ন্য, 'য্যঞ' দিয়ে তৈরি শব্দগুলিতে য ফলা হয়। যেমন, গ্রাম্য, ন্যায্য, দিব্য সাম্রাজ্য, কৌলীন্য, চৈতন্য, সাহায্য।
৩. কিছু তৎসম শব্দে 'য' ও 'অ' দুটি পত্যয়ই সিদ্ধ। এ সব শব্দের বানান য -ফলা দিয়ে ও য -ফলা ছাড়া দুভাবেই লেখা যায়। যেমন; চারিত্র/চারিত্র্য, দারিদ্র/দারিদ্র্য, বৈশিষ্ট/বৈশিষ্ট্য, বৈদগ্ধ/বৈদগ্ধ্য।

অতৎসম (তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশী) শব্দের বানান

এ জাতীয় শব্দের বানানে রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, শব্দের শেষে হস্ [্] চিহ্ন ইত্যাদি নিয়ম ইতোমধ্যে বর্জিত হয়েছে। এগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমরা আধুনিক চলিত বাংলায় অনুসরণ করা – হয় এমন নিয়মগুলিই আলোচনা করছি।

ই, ঈ, উ, ঊ

১. মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকলে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে কেবল ই এবং উ কার। যেমন; পাখী, পাখি, ঊনিশ, উনিশ, বাড়ী, বাড়ি, চূণ, চুণ। এ সব শব্দে এখন ই বা উ বহুল প্রচলিত।
২. কিছু শব্দে কেবল ঈ এবং কেবল ই হবে। যেমন, হীরা, নীল, পানি, খিল।
৩. স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা, বিশেষণবাচক শব্দে ই হবে। যেমন; ইংরেজি, কেরানি, বাঙালি, রেশমি, ঝি, দিদি, মাঝারি, মিহি।
৪. জীব, জন্তু, গুণ, বস্তু ও ভাববাচক শব্দে ই হবে। যেমন; বেঙাচি, বেজি, পাগলামি, কাঠি, বাবুগিরি, সরাসরি।

জ, য

মূলে য থাকলেও কিছু শব্দে জ লেখা হবে। যেমন; কাজ (<কার্য), জাঁতা, জুঁই, জোয়াল।

ন, ণ

এ জাতীয় শব্দে কেবল ন হবে। এমনকি মূলে ণ থাকলেও ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন; কান (<কর্ণ), রানী (<রাজ্ঞী), বরন(<বর্ণ), গিন্নি (<গৃহিণী), পূর্ণিমা(<পুন্নিমা)।

ও-কার

১. স্বরান্ত শব্দগুলিতে ও-কার (ো) হবে। যেমন; কালো, ভালো, মতো। এ সব শব্দে ও-কার ছাড়া অনেকে লেখেন। কিন্তু সে-স্বাধীনতা গ্রহণ না করাই ভালো।

২. কিছু শব্দে নিশ্চয়ার্থক প্রয়োগ ও-কার হবে। যেমন; আরো, করো, কোন, কখনো। এ সব শব্দ ও-কার ছাড়া লেখার প্রবণতা এখনো রয়েছে। এ সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন।

শ,ষ, স

মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে শ, ষ বা স হবে। যেমন; আঁশ (<আঁশু), মশা (<মশক), শাঁস (<শসা), মিনসে(<মানুষ্য), কাঁসা(<কাংস্য), ঘষা (<ঘৃষ), শাড়ি (<শাটী), পাশা (<পাশক), সরিষা(সর্ষপ)।

ক্রিয়াপদ

পুরুষ ও কাল ভেদে বিভিন্ন ধাতুরূপের বানান হবে:

১. **হা-ধাতু:** হন, হয়, হও, হস, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হক, হন, হও, হ। হলো, হলাম। হত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব/হবো, হবে। হয়ো, হস। হতে, হয়ে, হলে, হবার, হওয়া।
২. **খা-ধাতু:** খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে, খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব/খাবো, খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।
৩. **দি-ধাতু:** দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত/দিতো। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব/দেবো, দেবে। দিয়ো, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. তৎসম শব্দের বানানে ণত্ববিধি কীভাবে কাজ করে? উদাহরণসহ লিখুন।
২. তৎসম শব্দের বানানে ষত্ববিধি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
৩. বিদেশী শব্দ বাদে অতৎসম শব্দের বানান বিধি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
৪. বাংলা বানানে 'ই' ও ই-কার ব্যবহারের নিয়মগুলি উদাহরণসহ লিখুন।
৫. বাংলা বানানে 'ঈ' ও ঈ-কার ব্যবহারের নিয়মগুলি উদাহরণসহ লিখুন।
৬. বাংলা বানানে 'ন' ব্যবহারের নিয়মগুলি উদাহরণসহ লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বানান কাকে বলে?
২. 'পদ্ম' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ লিখুন।
৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ বলতে কী বোঝেন?

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলি তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

বাংলা শব্দের যথার্থ প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- *শব্দের যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;*
- *শব্দের যথাযথ প্রয়োগ-বিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বক্তব্য অনুসারে যথাযথ শব্দ নির্বাচন ও ব্যবহার করতে পারবেন।*

সংস্কৃত ভাষায় শব্দকে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম। অর্থাৎ, পরম তত্ত্ব এবং এর পর আর কিছু নেই। শব্দের 'যথার্থ' প্রয়োগ বলতেও সেই একই কথাকে বোঝানো হয়েছে। যথা অর্থেই শব্দকে ব্যবহার করতে হবে এবং এ ব্যবহার এমন হবে যার কোন বিকল্প ভাবা যাবে না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই যথার্থ ব্যবহার কে করবেন এবং কীভাবে করবেন? সে-উত্তরে বলতে হয় যে, শব্দ ব্যবহারের চাবি এক জনের হাতেই থাকে। তিনিই তা প্রয়োগ করবেন। তাঁর পরিচয় একটিই, তিনি শব্দশিল্পী। মানুষ যে-সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্যে জীবজগতে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে সেগুলির অন্যতম তার ভাষা। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। সে-অর্থে মানুষমাত্রই শব্দকুশলী। মানুষের আরো একটি অনুভূতি বা বৈশিষ্ট্য এখানে স্মরণ করা যায়। মানুষ শুধু নিজের কথা ভাবে না। অন্যের কথাও সে ভাবে। নিজের আবেগ, অনুভূতি, ভাব, কল্পনা সে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে চায়। সুতরাং শব্দ নিয়ে তাকে ভাবতেই হয়। তার শব্দ প্রয়োগ যথার্থ না হলে তার ভাবনা কল্পনাও অন্যের নিকট অবিকৃত ও যথার্থভাবে তুলে ধরা যায় না।

শব্দের যথার্থ প্রয়োগের জন্যে কয়েক প্রকার শব্দের প্রতি আমাদের অবশ্যই মনোযোগী হতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রাধান্য দিতে হয়, বিশেষ্য জাতীয় শব্দগুলিকে। আমরা কোন না কোন ভাব বা বিষয়ই প্রকাশ করি। বিশেষ্য বাচক শব্দগুলির মাধ্যমে আমরা এগুলিকেই বুঝিয়ে থাকি। এক্ষেত্রে অমনোযোগী কিংবা অসতর্ক হলে নির্দিষ্ট বিষয়টি অবিবৃতভাবে বোঝানো যায় না। যেমন, কারোর খাদ্যের প্রয়োজন। খাবারের আবার প্রকার ভেদ আছে। খাবারের দোকানে গিয়ে যদি বলি 'আমাকে খাবার দিন' তাহলে খাদ্য সরবরাহাকারীকে দ্বিধায় পড়তে হবে। খাবার, পরিবেশন না করে সে প্রশ্ন করবে: কোন খাবার? কিন্তু আমরা প্রথমেই যদি বলি 'ভাত বা রুটি দিন' তাহলে এ জাতীয় সমস্যায় পড়তে হয় না।

দ্বিতীয় বিশেষণ জাতীয় শব্দ। শব্দের যথার্থ প্রয়োগ বিশেষ্যের তুলনায় বিশেষণ জাতীয় শব্দগুলি অধিক মনোযোগ কাড়ে। বাংলা ভাষায় বিশেষ্যের তুলনায় তাই বিশেষণ জাতীয় শব্দগুলি অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য আমরা তার আগে প্রায়শই বিশেষণ জুড়ে দিই। এ কোন বাড়তি শব্দ নয়; বিশেষণ ভাষার অনিবার্য শব্দ। হঠাৎ কেউ বললেন যে, তার বুকের মধ্যে ব্যথা করছে। 'ব্যথা' বলে তিনি কষ্টকে বুঝিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ব্যথার ধরন তাতে প্রকাশ পায় নি। সে জন্য বাংলায় আছে একাধিক বিশেষণ জাতীয় শব্দ। আমরা বলি, টনটনে ব্যথা, ঝিনঝিনে ব্যথা, ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ব্যথা, গভীর ব্যথা, দারুণ ব্যথা, ভীষণ ব্যথা ইত্যাদি। বিশেষণ সব সময় বিশেষ্যের পূর্বেই বসে তা নয়, ক্রিয়ার আগেও আমরা বিশেষণ ব্যবহার করি। যেমন; 'পড়া' একটি ক্রিয়া। তার আগে বিশেষণ যোগ করে আমরা পড়ার নানা ধরন বোঝায়। বলি: চিৎকার করে পড়া, নীরবে পড়া, গড়গড়িয়ে পড়া, গুনগুন করে পড়া, নিঃশব্দে পড়া, হনহন করে পড়া।

বিশেষণ অনেক সময় বাক্যে পাশাপাশি অর্থাৎ, একাধিক ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় বিশেষণকে বলে বিশেষণের বিশেষণ। যেমন; খুব ভালো মানুষ, ভারি মজার ব্যাপার, ভীষণ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, খুব আস্তে কথা বলা ইত্যাদি। প্রতি ক্ষেত্রেই একটি বিশেষণের পূর্বে আর একটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। বক্তব্যকে প্রকাশের অনিবার্য প্রয়োজনেই এ প্রয়োগ। এ প্রসঙ্গে বিশেষণের তারতম্যের কথাও বলা যায়। বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষণের সাধারণ রূপটি অনেক সময় অনিবার্য বলে মনে হয় না, তখন বিশেষণকে আরো প্রসারিত করতে হয়। বাংলা শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভাব প্রকাশের জন্য বিশেষণের শেষে -'তর' -'তম' ইত্যাদি রূপমূল এবং 'চেয়ে' 'সবচেয়ে' 'সর্বাপেক্ষা', 'সকলের মধ্যে' প্রভৃতি যোগ করে। কঠিনের আধিক্য বোঝানোর জন্যে আমরা বলি: 'কঠিনতর', 'কঠিনতম'। অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হয় বৃহৎ থেকে বৃহত্তর; মহৎ থেকে মহত্তর; শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, শুদ্ধতম ইত্যাদি। দামের আতিশয্য প্রকাশের জন্যে ব্যবহার করা হয়: সবচেয়ে দামি।

শব্দের যথার্থ প্রয়োগে বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বাগধারা বা বাগবিধি ভাষায় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ হিসেবে গণ্য হয়। অন্য কথায়, বাগধারার মাধ্যমে শব্দের অর্থকে ইংগিতবহ ও সূক্ষ্মতর করে তোলা হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া–সব ধরনের শব্দই বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। মাথা, মুখ, চোখ, কাঁচা শব্দগুলি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করলে এগুলির আভিধানিক অর্থ আর থাকে না। ভাষায় এভাবে শব্দের অভিধান অতিরিক্ত ব্যবহার স্বাভাবিক ঘটনা। আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলি: তিনি গ্রামের মাথা; এমন কাজ করলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না; বেশ কাঁচা হাতের লেখা, তার চোখে চামড়া নেই। বিশিষ্টার্থক শব্দগুলির বিকল্প, অন্য কোন শব্দ গ্রহণ করলে বক্তব্যকে এত নির্দিষ্ট, ব্যঞ্জনাত্মক ও লক্ষ্যভেদী করা যায় না। ভাষার শব্দ ব্যবহার আয়ত্ত করতে হলে তার বাগধারাগুলির অর্থ, প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হয়।

প্রবাদগুলি মূলত জনপ্রিয় সব উক্তি। দীর্ঘ কাল মানুষ এগুলি ব্যবহার করার ফলে ভাষায় এগুলি অঙ্গীভূত হয়েছে। বহু মানুষের জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন এগুলিতে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। এমন কোন ভাষা সম্ভবত নেই, যে-ভাষায় প্রবাদের ব্যবহার অনুপস্থিত। জীবনের সত্য ও সরল উপলব্ধি প্রকাশ প্রবাদ-প্রবচন ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। আমরা বলি: 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' কিংবা 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' তখন ভাব বা বক্তব্য যেভাবে প্রকাশ পায় ও সবাইকে স্পর্শ করে তা অন্য কোন শব্দে বা শব্দগুচ্ছে ব্যক্ত করা যায় না।

জীবনের নানা রূপ ও বিবিধ প্রকাশ। জীবনে আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, মিলন–বিরহ–সবই বর্তমান। ভাষার রূপের মধ্যেও এ জাতীয় বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য রয়েছে। কথাকে অনেক সময় আটপৌরেভাবে, আমাদের প্রতিদিনের পুনরাবৃত্ত জীবনের মতো নিরাভরণ করে বললে চলে না। মাঝে-মাঝে বক্তব্যের প্রয়োজনেই ব্যবহার করতে হয় অলংকার। ভাষার অলংকার বাইরের কোন বিষয় নয়। শব্দই এর আশ্রয়। শব্দের মাধ্যমে ভাষাদেহে অলংকার হয় প্রতিস্থাপিত। জীবনের আনন্দকে, উচ্ছলতাকে ও আবেগের আধিক্যকে অলংকারের সাহায্যেই উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়। গান যে আমাদের এতো ভালোলাগে তা অলংকারের জন্যই। সংগীতে এক অলংকারের প্রকাশ ঘটে, ধ্বনির বার-বার আবৃত্তির মাধ্যমে। কবিতায় আমরা যে মিলের কথা বলি তাও এক জাতীয় অলংকার। একে বলে অনুপ্রাস। বর্তমানে অবশ্য কবিতার মিল সব সময় চরণের শেষে থাকে না। চরণের মধ্যেও এ মিল অবস্থান করে। উদাহরণ হিসেবে জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতাটির কথা বলা যায়। এ কবিতায় আছে: 'চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার নিশা'। এখানে 'র' ধ্বনির পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মাধ্যমেই কবি অনুপ্রাস সৃষ্টি করছেন।

অনুপ্রাসের মতো কবিতার আরো একটি অলংকার উপমা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোন বস্তুর দোষ, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্য কিছুর সাদৃশ্য কল্পনাই হলো উপমা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে; 'বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা'। এখানে সুখানুভূতির সঙ্গে ব্যথার উপমা দেয়া হয়েছে। উপমা শুধু কবিতায় নয়, প্রবন্ধে এবং অন্য কোন রচনাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনের এমন কিছু ভাব আছে যেগুলির প্রকাশের উপযোগী শব্দ খুবই নির্বাচিত। 'মৃত্যু' এ জাতীয় ভাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট। জীবন থাকলেই আবেগ, অনুভূতি, বিচিত্র সব ভাব ও কল্পনা; কিন্তু মৃত্যু হলেই সব শেষ। মৃত্যুর বর্ণনা তাই সংক্ষিপ্ত, এখানে বাড়তি কিছু থাকে না। মোটকথা, শব্দের যথার্থ প্রয়োগ বাইরের কোন বিষয় নয়। বক্তব্যই বিশেষ ধরনের শব্দের প্রয়োগ দাবি করে, আর তা খুঁজতে হয় ভাষার শব্দজগৎ থেকেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা শব্দের প্রয়োগরীতি বলতে কী বোঝেন? বিষয় অনুসারে শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যথার্থ শব্দ প্রয়োগ বলতে কী বোঝেন?

২. শব্দের যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হলে কোন ধরনের শব্দ নির্বাচন করতে হয়?

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

৪

বাংলা উচ্চারণ

ভাষামাত্রেরই স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে। কিন্তু উচ্চারণের দিকে থেকে স্বরধ্বনির তুলনায় ব্যঞ্জনধ্বনি অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ ধ্বনি উচ্চারণের জন্য কোন্ কোন্ বাকপ্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে, তা জানা প্রয়োজন। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলেই শব্দ গঠিত হয়। এই ইউনিটে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াও বিদেশী শব্দের প্রমিত বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ-১. প্রমিত বাংলা উচ্চারণ: স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য
- পাঠ-২. প্রমিত বাংলা উচ্চারণ: ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য
- পাঠ-৩. বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ

পাঠ - ১

প্রমিত বাংলা উচ্চারণ: স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- *প্রমিত উচ্চারণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন;*
- *স্বরধ্বনির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;*
- *স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবেন:*
- *বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বাংলা দ্বি-স্বরধ্বনি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;*
- *বাংলা অনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলি চিনতে ও সেগুলির উচ্চারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

উচ্চারণ হলো ধ্বনির শ্রবণগত প্রকাশ বা বাগধ্বনির শ্রুতিগত অভিব্যক্তি।

উচ্চারণ বলতে মূলত এক ধরনের বাচনিক ক্রিয়াকে বোঝায়। মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারণ করে। আরো বিস্তৃতভাবে বলা যায়, ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখের মধ্যে নানা প্রত্যঙ্গে বাধা পেয়ে আবার কখনো কোন রকম বাধা ছাড়াই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। বস্তুত, উচ্চারণ হলো ধ্বনির শ্রবণগত প্রকাশ বা বাগধ্বনির শ্রুতিগত অভিব্যক্তি।

একটি দেশে অবস্থানকারী ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি উপভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা থাকতে পারে। এক উপভাষী মানুষ তাদের নিজেদের মধ্যে সেই উপভাষায় কথা বলে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষেরাও হয়তো তাদের সে-উপভাষা বোঝেন। কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষের কাছে তা বোধগম্য নাও হতে পারে। এজন্য একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাকে সমগ্র দেশের যোগাযোগের বাহন বা মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হয়। দেশের সর্বত্র বোধ্য এই উপভাষাটিকেই বলে প্রমিত ভাষা এবং এই উপভাষার উচ্চারণই হচ্ছে প্রমিত উচ্চারণ।

বাগধ্বনির লিখিত রূপকে বর্ণ বলা যায়। ধ্বনি ও বর্ণের উচ্চারণের মধ্যে সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই যে-ভাষায় ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে ১:১ অনুপাত রক্ষিত হয়েছে। এর অবশ্য কারণও আছে। ধ্বনি পরিবর্তনশীল। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতি দশ মাইল অন্তর ভাষার পরিবর্তন হয়। কিন্তু কোন ভাষার বর্ণমালার পরিবর্তন একশো বা দুশো বছরেও হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, একটি বর্ণ আদিতে যেভাবে উচ্চারিত হতো কালান্তরে তার সেই উচ্চারণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উচ্চারণের পরিবর্তন-অনুযায়ী নতুন বর্ণ প্রতিস্থাপিত হয় না। বর্ণের উচ্চারণকে সে-হিসেবে স্মৃতিতে ধরে রাখার বিষয় হিসেবে দেখা যায়।

স্বরধ্বনি উৎপাদনে ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখের মধ্যে কোথাও বাধা পায় না।

সব ভাষার মতো বাংলা ভাষারও ধ্বনি দু-ধরনের, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। এ দুই শ্রেণীর ধ্বনির পরিচয় গ্রহণ করলে আমরা দেখি, স্বরধ্বনি উৎপাদনে ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখের মধ্যে কোথাও বাধা পায় না। এ ধ্বনি স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হয়।

বাংলা বর্ণমালায় ১১টি স্বরবর্ণ আছে: অ আ ই ঈ/ উ ঊ ঋ/ এ ঐ ও ঔ। সে-হিসেবে বাংলা ভাষায় এই ১১টি স্বরধ্বনি থাকার কথা। কিন্তু উচ্চারণে আমরা তা পাই না। উচ্চারণে আমরা মাত্র ৭টি স্বরধ্বনি পাই। এগুলি হলো: ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও এবং উ। এগুলিই হলো বাংলা ভাষার **মৌলিক স্বরধ্বনি** (Cardinal vowel)। অবশিষ্ট স্বরবর্ণগুলির মধ্যে ঐ (<ও+ই) এবং ঔ (<ও+উ) হলো যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বরধ্বনি (diphthong)। ঈ এবং ঊ বর্ণ বাংলা লিপিতে থাকলেও উচ্চারণে নেই।

ঋ স্বরবর্ণের মধ্যে থাকলেও এর মধ্যে আছে দুটি বর্ণ র্ + ই। সে-হিসেবে বর্ণটিকে যুক্ত বর্ণ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যায়, এগুলির মধ্যে ই, এ, এ্যা জিভের সামনের অংশ থেকে উচ্চারিত হয়। এই তিনটি স্বরকে তাই সম্মুখ-স্বরধ্বনি (Front vowel) বলে। জিভের পেছনের অংশ থেকে উচ্চারিত অ, ও, উ স্বর পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (Back Vowel)- রূপে পরিচিত। আ স্বরধ্বনিটি উচ্চারণে জিভ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, সামনে বা পেছনে কোন দিকেই যায় না বলে একে বলে মধ্য স্বরধ্বনি (Central Vowel)।

ঠোঁটের অবস্থা ভেদে স্বরধ্বনিগুলির দু-ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ঠোঁট গোলাকৃত (round) ও অগোলাকৃত (unround) অবস্থায় থাকতে পারে। বাংলা অ, ও, উ–এই তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট গোলাকৃত হয়। সে-হিসেবে এগুলি হচ্ছে গোলাকৃত স্বরধ্বনি। অন্যদিকে ই, এ, এ্যা স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণে ঠোঁট গোলাকৃত হয় না বলে এগুলি হচ্ছে অগোলাকৃত স্বরধ্বনি।

স্বরধ্বনি বিচারে ঠোঁটের উন্মুক্তি অর্থাৎ স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট কতটুকু খোলা হচ্ছে বা আমরা কী পরিমাণ হাঁ করছি, সে-বিবেচনাও প্রাধান্য পায়। এ বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বারধ্বনিগুলিকে সংবৃত (Close), অর্ধ-সংবৃত (half-Close), বিবৃত (open) ও অর্ধ-বিবৃত (half-open) স্বরধ্বনিরূপে বিচার করা হয়।

- সংবৃত স্বরধ্বনি: এ সব স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট সব চেয়ে কম খোলা থাকে। বাংলা 'ই', 'উ' এ জাতীয় স্বরধ্বনি।
- অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি: এ শ্রেণীর স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণে ঠোঁট পূর্বের তুলনায় অধিক খোলা থাকে। এ জাতীয় বাংলা স্বরধ্বনি হচ্ছে 'এ' এবং 'ও'।
- অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি: এ জাতীয় স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণে ঠোঁট বিবৃত স্বরধ্বনির তুলনায় কম কিন্তু অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনির উচ্চারণের চেয়ে অধিক খোলা থাকে। এ জাতীয় বাংলা স্বরধ্বনি হলো 'এ্যা', 'অ'।
- ফবিবৃত স্বরধ্বনি: এ জাতীয় স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট সব চেয়ে বেশি খোলা থাকে। বাংলা বিবৃত স্বরধ্বনি হলো 'আ'।

জিভের উচ্চতা		**জিভের অবস্থান**		**ঠোঁটের উন্মুক্তি**
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	এ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

সারণি-০১: জিভের উচ্চতা ও ঠোটের উন্মুক্তি অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনি।

দ্বি-স্বরধ্বনি

বাংলা স্বরবর্ণমালায় দুটি বর্ণ আছে: ঐ এবং ঔ। স্বরবর্ণের মধ্যে থাকলেও এগুলির পরিচয় ভিন্ন। এগুলিকে বলে দ্বি-স্বর (Diphthong) বা যৌগিক স্বর। প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে এগুলিকে সন্ধ্যক্ষর হিসেবে দেখানো হয়। আসলে ঐ এবং ঔ একটি স্বর নয়, দুটি স্বর। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করলে আমরা দেখি যে,

এ ক্ষেত্রে দুটি স্বর (ও+ই = ঐ; ও + উ = ঔ) থাকলেও দুটি স্বরের পূর্ণ উচ্চারিত হয় না। একটি পূর্ণ এবং আর একটি অপূর্ণ বা অর্ধ উচ্চারিত হয়। সে-অর্থে এগুলিকে ‘দেড়খানা স্বর’ বলতে হয়। বাংলা ভাষায় পরের স্বরটিই অর্ধ উচ্চারিত হয়। অপূর্ণ স্বরটির উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে আমরা স্বরের নিচে হস্ [্] চিহ্ন ব্যবহার করছি। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূল বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet)-য় এ জন্যে একটি অনুচিহ্ন (diacritic) বা সংকেত [‍] ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আন্তর্জাতিক বর্ণমালা হলো ভাষাবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত এক ধরনের লিখন পদ্ধতি (Writing system)। এর সাহায্যে পৃথিবীর সব ভাষার ধ্বনির উচ্চারণের অতিক্ষুদ্র অংশ পর্যন্ত প্রকাশ করা যায়।

বাংলা স্বরবর্ণে উল্লিখিত দ্বি-স্বর দুটি ছাড়াও বাংলা ভাষায় আরো ১৫টি দ্বি-স্বর আছে। এ সংখ্যা নির্ণয়ে বাংলা ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকে ভিন্ন মতও পোষণ করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে বাংলা ১৭টি দ্বি-স্বরই স্বীকৃত হয়েছে। নিচে এগুলি দেখানো হলো:

দ্বি-স্বর	উচ্চারণ
অএ্	হয়
অও্	হও
আই্	ভাই
আউ্	সাউ

দ্বি-স্বর	উচ্চারণ
আএ	আয়
আও্	আও
ইই্	ইই
এই্	এই

দ্বি-স্বর	উচ্চারণ
এও্	এও
এ্যাই্	দেয়
এ্যাও্	ন্যাওটা
ওই্	বই

দ্বি-স্বর	উচ্চারণ
ওউ্	বউ
ওএ্	ধোয়
ওও্	ছোঁও

অনুনাসিক স্বরধ্বনি

ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখ দিয়ে আবার নাক দিয়ে এবং মুখ ও নাক দিয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে। বাতাসের বেরিয়ে যাওয়ার এই ধরন অনুযায়ী ধ্বনিগুলিকে মৌখিক (oral) অর্থাৎ কেবল মুখ দিয়ে বাতাস নির্গত হয়ে উচ্চারিত ধ্বনি এবং অনুনাসিক (nasalised) বা মুখ ও নাক দিয়ে বাতাস বের হয়ে উচ্চারিত ধ্বনি ও নাসিক্য (nasal) বা কেবল নাক দিয়ে বাতাস নির্গত হয়ে উচ্চারিত ধ্বনি-হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির মৌখিক ও অনুনাসিক দুটি রূপই বর্তমান। বাংলা স্বর অনুনাসিক স্বর হিসেবে উচ্চারিত হলে অর্থের পার্থক্য ঘটে। বাংলা সাতটি স্বরেরই সাতটি অনুনাসিক রূপ আছে। স্বরের অনুনাসিক রূপ নির্দেশে বাংলা বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু [ँ] ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরধ্বনি সংক্ষিপ্ত রূপে বা কার [া] হিসেবে লেখা হলে চন্দ্রবিন্দু স্বরের উপরে দেখানো যায় না। চন্দ্রবিন্দু তখন ব্যঞ্জনের উপর ব্যবহার করতে হয়। যেমন; ‘বাঁচা’, ‘কাঁচি’,। কিন্তু আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় সে-সীমাবদ্ধতা নেই। এ লিখন-রীতিতে সব সময়ই স্বরের উপর অনুনাসিকতা নির্দেশ করা যায়। এ জন্যে ব্যবহার করতে হয় একটি অনুচিহ্ন [য়]। এখন দেখুন বাংলা স্বরধ্বনিগুলির মৌখিক ও অনুনাসিক রূপ ও সেগুলির উচ্চারণ।

ই:বিধি	অ:গদ	এ্যা:ট্যাক	উ:কুড়ি
ইঁ:বিঁধি	অঁ:গঁদ	এ্যাঁ:ট্যাঁক	উঁ:কুঁড়ি
এ:এরা	ও:ওরা	আ:বাধা	
এঁ:এঁরা	ওঁ:ওঁরা	আঁ:বাঁধা	

বাংলা মৌলিক স্বরের উচ্চারণ

বাংলা স্বরধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই এগুলি উচ্চারিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণে জিভের উচ্চতা ও অবস্থান, ঠোঁটের আকৃতি পড়ে। সে-অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

ই: উচ্চ, সম্মুখ সংবৃত স্বর। এর উচ্চারণে কোন ব্যতিক্রম হয় না। বাংলা শব্দে অনেক সময় দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা থাকে। যেমন; দায়ী, মানবী, মনীষী, তরী, বীর ইত্যাদি শব্দ। কিন্তু বর্ণে থাকলেও বাংলা ভাষায় কোন দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। উল্লেখ করা যায় যে, ভাষায় দীর্ঘ স্বর তখনই প্রাধান্য পায় যখন স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে অর্থের পার্থক্য ঘটে। ইংরেজি ভাষায় এ পার্থক্য রয়েছে। যেমন; sit[sit] seat [si:t] শব্দ। উদাহরণের প্রথম শব্দের স্বর হ্রস্ব ই [ধ] কিন্তু দ্বিতীয়টির ই [ধ:] দীর্ঘ। স্বরের এই তারতম্যের কারণে দুটি শব্দের অর্থ ও ভিন্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় দীর্ঘ স্বর বোঝানোর জন্যে [:] এই অনুচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ঈ-কার (ী) যুক্ত বাংলা শব্দগুলির তাই হ্রস্ব স্বর উচ্চারিত হবে। যেমন; দায়ি, মানোবি, মোনিশি, তোরি,বির্।

এ : উচ্চ-মধ্য, সম্মুখ, অর্ধ-সংবৃত। বাংলা শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে এ ধ্বনি থাকলে তার উচ্চারণে সাধারণত কোন বিভ্রাট ঘটে না। যেমন; দেখি, তেল, বেল, দেশি, মেয়ে, ঢেঁকি, অনেক, এসেছে, পড়েছে, ইত্যাদি।

এ্যা : নিম্ন-মধ্য, সম্মুখ অর্ধ-বিবৃত স্বর। বাংলা বর্ণমালায় এ ধ্বনিটি প্রকাশের জন্যে কোন বর্ণ নেই। বাংলা শব্দে নানাভাবে, কখনো এ দিয়ে, কখনো শব্দের প্রথমে মাত্রাহীন এ-কার [ে] দিয়ে, কখনো য-ফলা [্য] দিয়ে, কখনো য-ফলার সঙ্গে আ-কার [্যা] ব্যবহার করে এবং কখনো যুক্তবর্ণের সঙ্গে কেবল আ-কার [া] দিয়ে লেখা হয়। কিন্তু সর্বত্রই এর উচ্চারণ বর্তমান। যেমন; এত [এ্যাতো], এক (এ্যাক্), এখন (এ্যাখোন্), এমন (এ্যামোন্), খেলা (খ্যালা), বেলা (ব্যালা), পেঁচা (প্যাঁচা), বেচারা (ব্যাচারা), ব্যর্থ (ব্যার্থো), ব্যবহার (ব্যাবহার্), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্) ব্যাহত (ব্যাহতো), ব্যারাম (ব্যারাম্), জ্ঞান (গ্যাঁন্), জ্ঞাতি (গ্যাঁতি), জ্ঞাত (গ্যাঁতো) ইত্যাদি।

আ: নিম্ন, মধ্য ও বিবৃত স্বর। শব্দের শেষের প্রথমে আ বা আ-কার [া] হিসেবে এবং শব্দের মধ্যে আ বা আ-কার রূপে, যেভাবেই থাকুক– এর উচ্চারণ সর্বত্রই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত। যেমন; আমার (আমার), আজ (আজ্), কাল (কাল্), তারা (তারা), মানুষেরা (মানুশেরা)।

অ: পশ্চাৎ, নিম্ন ও অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি। বাংলা ভাষায় অ-এর দুটি উচ্চারণ আছে। একটি এর স্বাভাবিক উচ্চারণ যা শব্দের প্রথমে অ থাকলে বা শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে নিহিত অবস্থায় অ থাকলে পাওয়া যায়। যেমন, অজ (আজো), অল্প (অল্পো), গল্প (গল্পো) ইত্যাদি শব্দের প্রথমের অ। না-বাচক উপসর্গ হিসেবে শব্দের প্রথমে অ বসলেও তার উচ্চারণও অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, অসীম (অশিম), অনেক (অনেক্), অনিচ্ছা (অনিচ্ছা), অনিবার্য (অনিবার্জো) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, অ কখনো-কখনো ও-রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু এ 'ও' মৌলিক বাংলা স্বর ও-এর মতো নয়। এ ও-এর উচ্চারণে ঠোঁট দুটি অপেক্ষাকৃত কম গোলাকৃত ও কম কুঞ্চিত হয়। বাংলা এই ও বোঝানোর জন্যে ও ধ্বনি-সংকেতই গ্রহণ করা হলো। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় একে সংকেতের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়। নিচে ও ব্যবহারের কিছু নিয়ম দেখানো হলো।

- উপসর্গ-যোগে গঠিত শব্দ ছাড়া অন্যত্র নিহিত অ থাকলে ও উচ্চারিত হবে। যেমন; পাগল (প্যাগোল্), গঠন (গঠোন্), সরল (শরোল্), চপল (চপোল্), বালক (বালোক্), নয়ন (নয়োন্), আসন্ন (আশোন্নো) ইত্যাদি।
- র-ফলা [্র] দিয়ে শব্দ শুরু হলে সেই শব্দের আদি ব্যঞ্জনের নিহিত অ-এর উচ্চারণ ও হয়। যেমন; প্রভাত (প্রোভাত্), প্রণয় (প্রোনয়), গ্রহণ (গ্রোহোন্), ব্রত (ব্রোতো), প্রথম (প্রোথোম্), ভ্রমণ (ভ্রোমোন্), ইত্যাদি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন; হ্রদ (হ্রদ্), হ্রস্ব (হ্রশ্শো) ইত্যাদি।

- শেষের দ্বিতীয় অক্ষর (Syllable)-এ য বা য-ফলা [্য] থাকলে তার উচ্চারণ ও হয়। যেমন; সত্য (শোত্তো), পদ্য (পোদ্দো), জন্য (জোন্নো), সন্ধ্যা (শোন্ধা), হত্যা (হোত্তা) ইত্যাদি।
- একাক্ষরিক শব্দের শেষ ধ্বনি ন (ণ) থাকলে তার প্রথম ব্যঞ্জনের নিহিত অ-এর উচ্চারণ ও হয়। যেমন; বন (বোন্), মন (মোন্), জন (জোন্) ইত্যাদি।
- একাক্ষরিক শব্দের শেষে যুক্ত ব্যঞ্জনের নিহিত অ-এর উচ্চারণ ও হয়। যেমন; বক্ষ (বোক্খো), লক্ষ (লোক্খো), রক্ষা (রোক্খা) ইত্যাদি। কিন্তু যক্ষ্মা (জক্খ্যাঁ), অজ্ঞ (অগ্গোঁ) শব্দে তা হয় না। এ সব শব্দে অ উচ্চারিত হয়।
- সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জনের নিহিত অ ধ্বনির উচ্চারণ ও হয়। যেমন; জনস্রোত (জনোস্রোতু), জলস্রোত (জলোস্রোত্), কালক্রম (কালোক্রোম্), বনভূমি (বনোভুমি), প্রাণবন্ত (প্রানোবন্তো), গণতন্ত্র (গনোতন্ত্রো) ইত্যাদি।
- ব্যঞ্জনধ্বনি ত দিয়ে শেষ হয়েছে এমন কিছু শব্দের শেষের অ উচ্চারিত হয় ও। যেমন; গত (গতো), মত (মতো), তত (ততো), প্রান্ত (প্রান্তো), যত (জতো), শত (শতো), হত (হতো), প্রীত (প্রিতো)।
- সংস্কৃত -তস্ ও - শস্ প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শেষ ব্যঞ্জনের নিহিত অ ধ্বনির উচ্চারণ ও হয়। এ জাতীয় শব্দগুলি এক সময় বিসর্গ [ঃ] দিয়ে লেখা হতো। কিন্তু অধুনা সে-প্রথা বর্জিত হয়েছে। এ জাতীয় কিছু শব্দের উচ্চারণ হলোঃ অন্তত (অন্তোতো), মূলত (মুলোতো), ক্রমশ (ক্রোমোশো), বিশেষত (বিশেশতো), জ্ঞানত (গ্যাঁনোতো), প্রকাশ্যত (প্রোকাশ্শতো।
- যে-সব শব্দের শেসে হ ধ্বনি রয়েছে, সেগুলির নিহিত অ-এর উচ্চারণ ও হয়। যেমন; বিবাহ (বিবাহো), প্রবাহ (প্রোবাহো), স্নেহ (স্নেহো), দেহ (দেহো), মোহ (মোহো) ইত্যাদি।
- ঘটমান বর্তমান কালের সাধারণ মধ্যম পুরুষ, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষ, অতীত কালের সাধারণ প্রথম পুরুষ, নিত্যবৃত্ত অতীত কালের সাধারণ প্রথম পুরুষ ও ভবিষ্যৎ কালের সাধারণ উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের শেষ ব্যঞ্জনের নিহিত অ ধ্বনির উচ্চারণ ও হয়। উল্লেখ করা যায় যে, এ সব
- ক্রিয়ারূপ যথাক্রমে -ছ, -ত, -ব, -ল বিভক্তি বা সহ-রূপমূল যোগে তৈরি হয়। যেমন; বলছ (বোল্ছো), করছ (কোর্ছো), খেলত (খেল্তো), চলত (চোল্তো), দেখব (দেখ্বো), ভাবব (ভাব্বো), দেখল (দেখ্লো), পড়ল (পোড়ুলো) ইত্যাদি।
- দ্বিরুক্ত ক্রিয়াবিশেষণের ব্যঞ্জন-নিহিত অ ধ্বনির উচ্চারণ ও হয়। যেমন; মর-মর (মরো-মরো), পড়-পড় (পড়ো-পড়ো), কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), ঝর-ঝর (ঝরো-ঝরো) ইত্যাদি।
- কছু ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিহিত ব্যঞ্জনের অ ধ্বনির উচ্চারণ ও হয়। যেমন; জরজর (জরোজরো), থরথর (থরোথরো), গদগদ (গদোগদো), ছলছল (ছলোছলো), টলমল (টলোমলো) ইত্যাদি।
- য় দিয়ে শেষ হয় এমন শব্দের অন্ত ব্যঞ্জনের নিহিত অ-এর উচ্চারণ ও হয়। যেমন; দেয় (দেয়ো), পেয় (পেয়ো), শ্রেয় (স্রেয়ো), পানীয় (পানিয়ো), বিধেয় (বিধেয়ো), তদীয় (তদিয়ো) ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে যুক্ত ব্যঞ্জন অথবা অনুস্বার [ং] এবং বিসর্গ [ঃ] -এর পরবর্তী ব্যঞ্জনের নিহিত অ-এর উচ্চারণ ও হয়। যেমন; গ্রন্থ (গ্রোন্থো), প্রান্ত (প্রান্তো), আনন্দ (আনোন্দো), মূর্খ (মুর্খো) ইত্যাদি।

- কিছু সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ ব্যঞ্জনের নিহিত অ ধ্বনির উচ্চারণ ও হয়। যেমন; বার (বারো), ষোল (শোলো), পনের (পনেরো) ইত্যাদি।

- তৎসম -তও, -তম প্রত্যয় বা সহরূপমূল যোগে গঠিত শব্দগুলির শেষের নিহিত অ ধ্বনির উচ্চারণ ও হয়। যেমন; বৃহত্তর (ব্রিহত্‌তরো), ক্ষুদ্রতর (খুদ্রোতরো), বৃহত্তম (ব্রিহত্‌তমো), ক্ষুদ্রতম (খুদ্রোতমো)।

- কিছু শব্দে ঋ-ফলা [ৃ], ঐ-কার [ৈ] এবং ঔ-কার [ৌ]- পরবর্তী ব্যঞ্জনের নিহিত অদ্বও উচ্চারিত হয়। যেমন; ধৃত (ধ্রিতো), কৃত(ক্রিতো), তৈল (তোইলো), নৈশ (নোই্শো), পৌর (পোউ্রো), গৌর (গোউ্রো)। কিন্তু কিছু শব্দের উচ্চারণে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এগুলির উচ্চারণে অদ্বও হয় না। যেমন; দৌড় (দোউড়্), পৌষ (পোউশ্)।

- ও : উচ্চ-মধ্য, পশ্চাৎ, অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি। শব্দের প্রথমে এবং মধ্যে বা শেষে যেখানেই থাক্, এ স্বরধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই একই রকম। এর উচ্চারণজনিত কোন বিভ্রাট হয় না। যেমন; ওঠা (ওঠা), ওল (ওল্), উহ্য (উজ্ঝো) ইত্যাদি।

- উ : পশ্চাৎ, উচ্চ, সংবৃত স্বরধ্বনি। বাংলা বর্ণমালায় আরো একটি উ রয়েছে। একে বলা হয় দীর্ঘ ঊ। কিন্তু দীর্ঘ ঈ-এর মতো বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ-ঊ নেই। সর্বত্র আমরা হ্রস্ব উ উচ্চারণ করি। সে হিসেবে বর্ণমালায় থাকলেও দীর্ঘ ঊ-কে বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির মধ্যে গণ্য করা যায় না। উ-এর উচ্চারণ নিয়ন্ত্রিত এবং ধ্বনিটির উৎপাদন রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন; উপর (উপোর), ধনু (ধোনু), উপকার (উপোকার্) ইত্যাদি।

ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্র: স্বরধ্বনি

উচ্চারণে অনেক সময় উচ্চ স্বরধ্বনি ও নিম্ন স্বরধ্বনির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। এ অবস্থায় নিম্ন স্বরধ্বনি এক ধাপ উপরে উঠে উচ্চারিত হয়। ধ্বনি পরিবর্তনের এ সব রীতি-বৈশিষ্ট্য নিয়েই তৈরি হয় ধ্বনি পরিবর্তন সূত্র। নিচে স্বরধ্বনি পরিবর্তনের কিছু সূত্র দেখানো হলো।

- শব্দের প্রথম অক্ষরে এ্যা এবং দ্বিতীয় অক্ষরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে এ্যা ধ্বনির উচ্চারণ এ (এ্যা + ই/উ = এ্যা→এ) হয়। যেমন: একটি, একটু, একাকী (একাকি)। নেড়ি, এমনি (এম্‌নি), এক্ষুনি (এক্‌খুনি) ইত্যাদি।

- যুক্ত ব্যঞ্জনের এ-কার [ে] সব সময় এ উচ্চারিত হয়। যেমন; স্নেহ (স্নেহো), প্রেম (প্রেম্), শ্রেষ্ঠ (স্রেশ্‌ঠো)।

- তৎসম শব্দের প্রথমের কার হিসেবে এ ধ্বনি থাকলে তার উচ্চারণ এ হয়। যেমন; চেতনা (চেতোনা), ছেদ (ছেদ্), দেশ (দেশ্), নেতা (নেতা)।

- য় বা হ দিয়ে শেষ হয়, এমন শব্দগুলির প্রথমে এ থাকলে তার উচ্চারণ পরিবর্তন হয় না। যেমন; পেয় (পেয়ো), হেয় (হেয়ো), দেহ (দেহো)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রমিত বাংলা উচ্চারণে স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উচ্চারণ কি ?
২. প্রমিত উচ্চারণ কাকে বলে ?
৩. স্বরধ্বনি বলতে কী বুঝেন ?
৪. উদাহরণসহ দ্বি-স্বরধ্বনির সংজ্ঞা লিখুন।
৫. মধ্য-স্বরধ্বনি কাকে বলে ?
৬. বাংলা মৌলিক স্বরগুলির উল্লেখ করুন।
৭. নিচের শব্দগুলি প্রমিত উচ্চারণে লিখুন:
এক; একটি; ক্ষুদ্র; অনিবার্য; অধিকার; সকাল; সবিশেষ; গীতবিতান; বন; বনোমধ্যে।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলি তৈরি করুন।

পাঠ - ২

প্রমিত বাংলা উচ্চারণ: ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি

- *ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;*
- *বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান জানতে পারবেন;*
- *বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;*
- *বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলি উচ্চারণ করতে পারবেন।*

স্বরধ্বনির বিপরীত ধ্বনিগুলিই হলো ব্যঞ্জনধ্বনি। এ সব ধ্বনির উচ্চারণে ফুস ফুস থেকে আগত বাতাস বাগযন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বাধা পায়, কখনো মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ বাতাস রুদ্ধ হয়, কখনো আংশিক রুদ্ধ হয়, কখনো আবার দুটি বাকপ্রত্যঙ্গ খুব কাছাকাছি আসার কারণে সংকীর্ণ পথে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়।

ধ্বনিমাত্রেরই দুটি প্রধান পরিচয়: এক, তার উচ্চারণ স্থান (Place of Articulation) অর্থাৎ কোন বাগযন্ত্রের সাহায্যে তা উচ্চারিত হচ্ছে এবং দুই, তার উচ্চারণ রীতি (Manner of Articulation) অর্থাৎ, কোন প্রক্রিয়ায় বা কীভাবে ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। এছাড়াও বায়ুপ্রবাহের কৌশল, কোমল তালু ও স্বরতন্ত্রের (Vocal cords) অবস্থা অনুসারে ধ্বনি বিচার করা হয়। ধ্বনি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট বায়ুপ্রবাহ-কৌশল দুটি: বহির্গামী ও অন্তর্গামী। অর্থাৎ, ফুসফুস থেকে বাতাস মুখ দিয়ে বের হয়ে এবং বাইরের বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে ধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে। কোমল তালুর অবস্থা অনুসারে ধ্বনিগুলিকে মৌখিক ও নাসিক্য ধ্বনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মৌখিক ধ্বনিগুলি উচ্চারণে কোমল তালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে ও বাতাস মুখ দিয়ে বের হয়। কিন্তু নাসিক্য ধ্বনির উচ্চারণে কোমল তালু নিচে ঝুলে যায় এবং বাতাস মুখ ও নাক দিয়ে নির্গত হয়। স্বরতন্ত্রের অবস্থা অনুযায়ী ধ্বনিগুলিকে ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি হিসেবে বিচার করা হয়। অঘোষ ধ্বনির সৃষ্টিতে স্বতন্ত্র কম্পিত হয় না কিন্তু ঘোষ ধ্বনির উচ্চারণে তা কম্পিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বলতে মূলত ধ্বনির এ সব পরিচয়কেই বোঝায়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে ধ্বনি উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট বাগপ্রত্যঙ্গগুলি চিত্রে দেখানো হয়েছে। চিত্রটি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। তখন ধ্বনিগুলি সহজে ও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা যাবে।

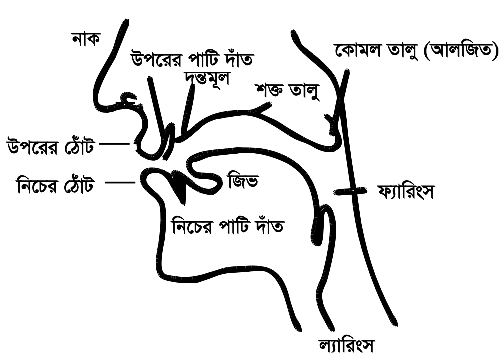

উচ্চারণ স্থান

প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির যে-সব উচ্চারণ স্থান দেখানো হয়েছে বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় সেগুলি সর্বাংশে নির্ভুল বলে মানা যায় না। কেননা অনেক ব্যঞ্জনের উচ্চারণ স্থান পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বাংলা ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানীরা ধ্বনিগুলিকে ওষ্ঠ (Labial), দন্ত (dental), দন্তমূলীয় (alveolar), তালব্য-দন্তমূলীয় (Palato-alveolar), তালব্য (Palatal), জিহ্বামূলীয় (Velar) ও কণ্ঠালীয় (glottal) ধ্বনি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন:** দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিগুলিই হলো ওষ্ঠ্য। এ শ্রেণীর বাংলা ব্যঞ্জনগুলি হচ্ছে: প্, ফ্, ব্, ভ্ এবং ম্।

২. **দন্ত্য:** এ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ উপরের পাটি দাঁতকে স্পর্শ করে। এ জাতীয় ব্যঞ্জনসমূহ হচ্ছে: ত্, থ্, দ্, ধ্।

৩. **দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন:** জিভের সামনের অংশ দন্তমূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকেই এ নামে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা এ জাতীয় ব্যঞ্জনগুলি হলো: ন্, র্, ল্, স্।

৪. **তালব্য-দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন:** এ শ্রেণীর ব্যঞ্জনগুলিকে সাধারণত মূর্ধন্য ব্যঞ্জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মূর্ধা থেকে বাংলা ভাষার কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। বাংলা ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ড়্, ঢ়্, ব্যঞ্জনগুলি উচ্চারণের সময় জিভের সামনের অংশ তালু ও দন্তমূলকে একই সঙ্গে স্পর্শ করে। সে- হিসেবে এগুলি তালব্য-দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন। এ জাতীয় ব্যঞ্জনগুলি হচ্ছে: ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ড়্, ঢ়্।

৫. **তালব্য:** জিভের প্রসারিত অংশ সামনের তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত ব্যঞ্জনগুলিই হলো তালব্য। এ জাতীয় ব্যঞ্জন হচ্ছে: চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ।

৬. **জিহ্বামূলীয় ব্যঞ্জন:** এ জাতীয় ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণের সময় জিভের পেছনের অংশ উপরে উঠে গিয়ে আলজিভের কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে। বাংলা ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ – এ জাতীয় ব্যঞ্জন।

৭. **কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন:** এ জাতীয় ব্যঞ্জন বাংলা ভাষায় মাত্র একটি: তা হলো হ্।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ করুন, উপরে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, তাতে নিচের ধ্বনিগুলির উল্লেখ নেই। কারণ এ সব ধ্বনি বর্ণমালায় থাকলেও এগুলির স্বতন্ত্র উচ্চারণ স্থান নেই। সে–অর্থে এগুলিকে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনিমূল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

- **ঞ:** ব্যাকরণ বইয়ে চ-বর্গের শেষ ধ্বনি হিসেবে দেখানো হলেও এর কোন উচ্চারণ স্থান নেই। এর উচ্চারণ য়ঁ। কিন্তু চ-বর্গীয় ব্যঞ্জনের সঙ্গে এর উচ্চারণ দন্তমূলীয় ন্-এর অনুরূপ। যেমন; মিঞ (মিয়োঁ), মিয়াঁ (মিঞা), ব্যঞ্জন (ব্যান্জোন)।
- **মূর্ধন্য ণ:** বান (বন্যা), বাণ (তীর) দুটি শব্দের উচ্চারণ অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দন্তমূলীয় ন্ উচ্চারণ করি। মূর্ধন্য ণ-এর কাছাকাছি উচ্চারণ আমরা কেবল একটি ক্ষেত্রে পাই। ট-বর্গীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ন্ থাকলেই কেবল এ রূপ উচ্চারণ হয়। কিন্তু সেই প্রতিবেশ (Context) বাদ দিলে ণ-এর উচ্চারণ সব সময় দন্তমূলীয় ন্। সে হিসেবে ণ-কে ন-এর প্রতিবেশগত বৈচিত্র্য (Variant) বলা যেতে পারে।
- **মূর্ধন্য ষ:** এর উচ্চারণ তালব্য শ্-এর অনুরূপ। যেমন; 'বিশেষ' শব্দ। এখানে শ্ এবং ষ্-এর উচ্চারণ অভিন্ন। সে হিসেবে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ষ্ অবশ্যই তালব্য ধ্বনি।
- **অন্তস্থ ব্ :** শব্দের প্রথমে থাকলে এর কোন উচ্চারণ নেই আর শব্দের মাঝখানে বা শেষে বসলে যে ব্যঞ্জনকে আশ্রয় করে সেই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন; স্বীকার (শিকার), অন্বয় (অন্নয়), পক্ক (পোক্কো)।

- **অন্তস্থ য়:** এর উচ্চারণ স্বরধ্বনি ই-এর মতো। যেমন; যায় (জাই), যাযাবর (জাজাবর)। তাই ব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকলেও ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায় একে স্বর হিসেবেই ধরা হয়।
- **অন্তস্থ ব্** এবং অন্তস্থ য়্-কে ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় বলে অর্ধ-স্বর (Semi-vowel) বা শ্রুতি ধ্বনি (glides) বা জিভের গতিশীলতার ফলে সৃষ্ট অসম্পূর্ণ স্বর। যেমন; নোয়া, হাওয়া, খাওয়া। এ সব শব্দে অন্তস্থ ব্ ধ্বনি রয়েছে। বাংলা বর্ণে লেখার কারণে ধ্বনিটি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রোমান লিপিতে লিখলে আরো স্পষ্টভাবে দৃশ্যগোচর হবে: ভমষট, রমষট, দটষট, পদটষট. লিপিতে য় ব্যবহার করলেও এর উচ্চারণ এ-এর মতো। যেমন; 'হয়' শব্দের য়্। এর পর আর কোন স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না। বাংলা ভাষায় এছাড়া আরো দুটি অর্ধ-স্বর আছে: ই্ এবং উ্।
- **খন্ড ৎ:** এর উচ্চারণ দন্ত্য ত্-এর মতো। যেমন; জগৎ (জগোত্), ভবিষ্যৎ (ভোবিশ্শত্)
- **অনুস্বর ং :** ঙ-এর সঙ্গে উচ্চারণে এর কোন পার্থক্য নেই। যেমন; বেঙ/ব্যাং (ব্যাং), রঙ/রং।
- **বিসর্গ ঃ:** এরও কোন উচ্চারণ স্থান নেই। স্বরের সঙ্গে বসলে এর উচ্চারণ স্বরের মতো আর ব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকলে তা ব্যঞ্জনের অনুরূপ। যেমন; অতঃপর (অতোপ্পর), ক্রমশঃ (ক্রোমোশ্শো)। কিন্তু বাংলা শব্দে এখন অন্ত বিসর্গ ব্যবহার করা হয় না।
- **চন্দ্রবিন্দু (ঁ):** স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে চন্দ্রবিন্দুকে গ্রহণ করা যায় না। এ মূলত এক ধরনের অনুচিহ্ন। স্বরধ্বনি অনুনাসিক উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন; বাঁকা, এঁটেল (এঁটেল্) ইত্যাদি।

উচ্চারণ রীতি

উচ্চারণ রীতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য দু-ভাবে নির্দেশ করা। প্রথমত, এগুলিকে অঘোষ (unvoiced) ও ঘোষ (voiced), অল্পপ্রাণ (unaspirated) ও মহাপ্রাণ (aspirated) ধ্বনি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়ত, বাগযন্ত্রে বায়ুপ্রবাহের বাধার প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ এগুলিকে স্পৃষ্ট (Stops), নাসিক্য (nasals), রণিত (trill),তাড়নজাত (flap), পার্শ্বিক (lateral) ও ঘর্ষণজাত (fricatives) ধ্বনি হিসেবে বিচার করা হয়। নিচে এ-সব বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি দেখানো হলো।

১. **অঘোষ ও ঘোষ:** ধ্বনির ঘোষতা ও অঘোষতা নির্ভর করে স্বরতন্ত্র (শমডটফ ডমরদ্র)-এর কম্পনের উপর। যে-সব ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় না সেগুলি অঘোষ আর যে-সব ধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় সেগুলি হলো ঘোষ ধ্বনি। সাধারণভাবে বলা হয় যে, বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ। কিন্তু এর বাইরেও এ-সব ধ্বনি রয়েছে। বাংলা অঘোষ ও ঘোষ ব্যঞ্জনগুলির উল্লেখ আমরা এভাবে করতে পারি; অঘোষ: ক্, খ্, চ্, ছ্, ট্, ঠ্, ত্, থ্, ঘোষ: গ্, ঘ্, ঙ্, জ্, ঝ্, ড্, ঢ্, দ্, ধ্, ন্, ব্, ভ্, ম্, র্, ল্, ড়্, ঢ়্, হ্।

২. **অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ:** প্রাণ শব্দের অর্থ হ্ ধ্বনি। সে হিসেবে যে ধ্বনির উচ্চারণে হ্ ধ্বনির অনুষঙ্গ জড়িত নয় সেগুলিই হলো অল্পপ্রাণ। আর যেগুলির উচ্চারণে এ অনুষঙ্গ জড়িত সেগুলি হলো মহাপ্রাণ ধ্বনি। এ সব ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখ দিয়ে নির্গত হওয়ার সময় বায়ুপথ কিছুটা কঠিনভাবে রুদ্ধ হয়, তারপর প্রবল ধাক্কা দিয়ে সেই বায়ু বেরিয়ে যায়। অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলির উৎপাদনে মুখের কাঠিন্য ও বাতাসের ধাক্কা–দু-ই তুলনামূলকভাবে কম। চলিত বাংলায় অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলি হলো: ক্, গ্, ঙ্, চ্, জ্, ট্, ড্, ত্, দ্, ন্, প্, ব্, ম্, র্, ল্, শ্, স্, ড়্; মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনগুলি হচ্ছে: খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্, ঢ়্। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অল্পপ্রাণ ও মাহপ্রাণ ব্যঞ্জনের উচ্চারণজনিত সমস্যা আমাদের প্রবল। আমরা অনেক মহাপ্রাণ ধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারি না। কিন্তু এ উচ্চারণের একটি সহজ উপায় আছে। বর্গীয়

প্রথম ব্যঞ্জনের সঙ্গে একত্রে একটি হ্ উচ্চারণ করলে দ্বিতীয় মাহপ্রাণ ধ্বনিটি পাওয়া যায়। একইভাবে তৃতীয় ব্যঞ্জনের সঙ্গে একত্রে একটি হ্ উচ্চারণ করলে দ্বিতীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিটি পাওয়া যায়। একইভাবে তৃতীয় ব্যঞ্জনের সঙ্গে হ্ উচ্চারণ করলেই উৎপাদিত হবে চতুর্থ মহাপ্রাণ ধ্বনিটি। যেমন; ক্ + হ্ = খ, গ + হ্ = ঘ্।

১. **স্পৃষ্ট ধ্বনি:** এ সব ধ্বনি উচ্চারণে মুখের মধ্যে বাতাস সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। এ সব ধ্বনিকে স্পর্শ বা রুদ্ধ ধ্বনিও বলে। বাংলা স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি হলোঃ ক্, খ্, গ্, ঘ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, প্, ফ্, ব্, ভ্।

২. **নাসিক্য ধ্বনি:** এ সব ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে সম্পূর্ণ আটকিয়ে যায় এবং এর পর মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাংলা নাসিক্য ধ্বনি তিনটিঃ ম্, ন্, ঙ্।

৩. **রণিত ধ্বনি:** এ সব ধ্বনি উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ বারবার অনুরণিত বা কম্পিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যাশ্রয়ী ধ্বনি বাংলা ভাষায় একটি, র্।

৪. **তাড়নাজাত ধ্বনি:** রণিত ধ্বনির উচ্চারণে জিভ বারবার কম্পিত হয়, কিন্তু তাড়নাজাত ধ্বনির সৃষ্টিতে জিভের সামনের অংশ পেছনের দিকে বেঁকে যায় ও মাত্র একটি টোকা খায়। এ জাতীয় ধ্বনিকে টোকাজাত ধ্বনিও বলে। বাংলা ড় এবং ঢ় এ জাতীয় ধ্বনি।

৫. **পার্শ্বিক ধ্বনি :** যে ধ্বনি উচ্চারণে জিভের এক পাশ বা উভয় পাশ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায় তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। বাংলা এ জাতীয় ধ্বনি একটি, ল্।

৬. **ঘর্ষণজাত ধ্বনি:** এ সব ধ্বনির উচ্চারণে দুটি বাক প্রত্যঙ্গ খুব কাছাকাছি আসে এবং বাতাস এই সংকীর্ণ পথে বেরিয়ে যাবার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। এই ঘর্ষণের আওয়াজ শিস দেওয়ার আওয়াজের মতো শোনায় বলে এগুলিকে শিসজাত ধ্বনিও বলে। এ জাতীয় বাংলা ধ্বনি হলোঃ শ্, স্, এবং হ্।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারেই উচ্চারিত হয়। প্রতিটি ব্যঞ্জনের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে তাই উচ্চারণে কোন অসুবিধা হয় না। নিচে সে আলোকেই বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি দেখানো হলো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ব্যঞ্জনধ্বনির এ-সব বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখলে উচ্চারণজনিত আর কোন অসুবিধা হবে না। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির এ পরিচয় নিচে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে দেওয়া হয়েছে। এখানে বলে রাখি যে, বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির অধিকাংশেরই উচ্চারণের আগে, এগুলির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি আলোচনার সময় নির্দেশ করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্যে এখন কেবল সেই সব উচ্চারণ প্রক্রিয়া দেখানো হলো যেগুলি এর পূর্বে উল্লিখিত হয়নি।

ক্: জিহ্বামূলীয়, অঘোষ, অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন : এর উচ্চারণে কোন জটিলতা নেই। এর উচ্চারণ এর ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন; কাক (কাক্), থাক (থাক্)

খ্: জিহ্বামূলীয় অঘোষ, মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

গ্: জিহ্বামূলীয় ঘোষ, অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ঘ্: জিহ্বামূলীয়, ঘোষ, মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ঙ্: জিহ্বামূলীয়, ঘোষ, নাসিক্য ব্যঞ্জন। লক্ষণীয়, ঙ দিয়ে কোন বাংলা শব্দ শুরু হয় না। ফলে শব্দের শুরুতে এর উচ্চারণ নেই। ঙ কেবল শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকে। কিন্তু সর্বত্রই উচ্চারণ একই রকম, অনুস্বারে সঙ্গে অভিন্ন বা ইংরেজি thing, ring ইত্যাদি শব্দের -ing [h]-এর মতো। যেমন; রঙ, ব্যাঙ, সঙ্গীত/সংগীত (শোংগিত্)।

চ্ঃ তালব্য, অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ছ্ঃ তালব্য, অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

জ্ঃ তালব্য, ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ঝ্ঃ তালব্য, অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ট্ঃ তালব্য- দন্তমূলীয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ঠ্ঃ তালব্য- দন্তমূলীয়, অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ড্ঃ তালব্য- দন্তমূলীয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ঢ্ঃ তালব্য- দন্তমূলীয়, অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ত্ঃ দন্ত্য, অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

থ্ঃ দন্ত্য, অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

দ্ঃ দন্ত্য, ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ধ্ঃ দন্ত্য, ঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ন্ঃ দন্ত্য-মূলীয় ঘোষ দন্ত-মূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জন।

প্ঃ ওষ্ঠ্য, অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ফ্ঃ ওষ্ঠ্য, অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ব্ঃ ওষ্ঠ্য, ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ভ্ঃ ওষ্ঠ্য, ঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

ম্ঃ ওষ্ঠ্য, ঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জন।

র্ঃ দন্ত-মূলীয়, ঘোষ রণিত ব্যঞ্জন।

ল্ঃ দন্ত-মূলীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ পার্শ্বিক ব্যঞ্জন। বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবেশে এ ধ্বনির কিছুটা উচ্চারণ পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'আলতা' ও 'উলটো' শব্দদ্বয়ের উচ্চারণ উল্লেখ করা যায়। 'আলতা' শব্দের ল্ ধ্বনির উচ্চারণে বৈচিত্র্য নেই, তা ধ্বনিটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয়। কিন্তু 'উলটো' শব্দের ল উচ্চারণের সময় জিভ দন্তমূল থেকে সরে অনেকটা মূর্ধার দিকে অগ্রসর হয়।

শ্ঃ তালব্য, অঘোষ শিসজাত ব্যঞ্জন।

স্ঃ দন্ত-মূলীয় অঘোষ শিসজাত ব্যঞ্জন।

ড়্ঃ তালব্য, দন্তমূলীয়, অঘোষ, অল্পপ্রাণ তাড়নজাত ব্যঞ্জন।

ঢ়্ঃ তালব্য-দন্তমূলীয়, মহাপ্রাণ তাড়নজাত ব্যঞ্জন।

হ্ঃ কণ্ঠনালীয়, ঘোষ, মহাপ্রাণ শিসজাত ব্যঞ্জন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে দেখার জন্যে নিচে একটি সারণি দেওয়া হলো।

উচ্চারণ রীতি ↓			উচ্চারণ স্থান						
			ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্ত-মূলীয়	তালব্য-দন্তমূলীয়	তালব্য	জিহ্বা-মূলীয়	কণ্ঠনালীয়
স্পৃষ্ঠ	অমোঘ	অল্পপ্রাণ	প্	ত্		ট্	চ্	ক্	
		মহাপ্রাণ	ফ্	থ্		ঠ্	ছ্	খ্	
	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	ব্	দ্		ড্	জ্	গ্	
		মহাপ্রাণ	ভ্	ধ্		ঢ্	ঝ্	ঘ্	
নাসিক্য			ম্		ন্			ঙ্	
রণিত					র্				
তাড়নজাত		অল্পপ্রাণ				ড্			
		মহাপ্রাণ				ঢ্			
পার্শ্বিক					ল্				
ঘর্ষণজাত/শিসজাত					স্		শ্		হ্

সারণি-০২: উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

যুক্ত-ব্যঞ্জনের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য

ভাষা বলতে এখন শুধু মুখের ভাষাকেই বোঝায় না; লিখিত ভাষাকে এখন ভাষার সংজ্ঞার্থের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। লিখিত ভাষার প্রমিত উচ্চারণে তাই যুক্ত-ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। লেখার সময় আমরা দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জন ধ্বনিকে এক সঙ্গে লিখে থাকি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ব্যঞ্জন বর্ণের এই সংযুক্ত রূপকেই বলে যুক্ত-ব্যঞ্জন। নিচে বাংলা যুক্ত-ব্যঞ্জনগুলির উল্লেখ এবং সেগুলির উচ্চারণ নির্দেশ করা হলো।

ম্-ফলা: এর তিন ধরনের উচ্চারণ রয়েছে:

- শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকলে আশ্রিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব এবং নিহিত স্বরধ্বনিটিকে অনুনাসিক করে। যেমন; আত্মা (আত্‌তাঁ), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ), বিস্মিত (বিশ্‌শিঁতো)।
- শব্দের প্রথমে থাকলে এর উচ্চারণ উহ্য থাকে ও আশ্রিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন; স্মৃতি (স্রিঁতি), স্মিত (শিঁতো)।
- ল্ ও ন্-এর সঙ্গে থাকলে এর উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন; গুল্ম (গুল্‌মো), তন্ময় (তন্‌ময়), কাশ্মীর (কাশ্‌মির)।

য্-ফলা [য]: এর উচ্চারণ চার ধরনের হয়ে থাকে:

- শব্দের প্রথমে থাকলে এ্যা উচ্চারণ হয়। যেমন; ব্যথা (ব্যাথ্যা), ব্যধি (ব্যাধি)।
- শব্দের প্রথমে ছাড়া অন্যত্র থাকলে আশ্রিত ব্যঞ্জণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন; কাব্য (কাব্‌বো), পদ্য (পোদ্‌দো), হত্যা (হোত্‌তা)।

- অন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের পরে থাকলে এর উচ্চারণ হয় না। যেমন; সন্ধ্যা, (শোন্‌ধা), লক্ষ্য (লোক্‌খো), বৈচিত্র (বোইচিত্‌ত্রো)।
- হ্‌-এর সঙ্গে থাকলে তার উচ্চারণ জ্‌ঝ্‌-এর মতো হয়। যেমন; সহ্য (সোজ্‌ঝো), দাহ্য (দাজ্‌ঝো)।

র্‌-ফলা [্র]: শব্দের প্রথমে ছাড়া অন্যত্র থাকলে আশ্রিত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন; আম্র (আম্‌ম্রো), পত্র (পত্‌ত্রো), শক্র (শোক্‌ক্রো), মিত্র (মিত্‌ত্রো)।

ক্ষ্‌ (<ক্‌+ষ্‌), জ্ঞ্‌(<জ্‌+ঞ্‌): যুক্ত ব্যঞ্জন দুটি শব্দের প্রথমে থাকলে খ্‌ বা গ্‌-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন; ক্ষতি (খোতি), ক্ষয় (খয়্‌), জ্ঞাতি (গ্যাঁতি), জ্ঞান(গ্যাঁন)। কিন্তু অন্যত্র থাকলে এদের উচ্চারিত ক্‌খ্‌ ও গ্‌গঁ্‌-এর মতো হয়। যেমন; অক্ষয় (অক্‌খয়্‌) অজ্ঞাত (অগ্‌গ্যাঁতো), প্রজ্ঞা (প্রোগগাঁ)।

হ্ন (হ্‌+ন্‌)/হ্ণ (হ্‌+ণ্‌): লেখার সময় আমরা হ্‌-এর পর ন্‌/ণ্‌ লিখি কিন্তু উচ্চারণে ন্‌ আগে আসে। যেমন; চিহ্ন (চিন্‌হো), অপরাহ্ণ (অপোরান্‌হো)।

হ্ম (<হ্‌+ম্‌): হ্ন-এর মতোই লেখার সময় হ্‌-এর পর ম্‌ থাকে কিন্তু উচ্চারণে ম্‌ আগে আসে। যেমন; ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌হোন)।

হ্ব (হ্‌+ব): এর উচ্চারণ ওভ্‌-এর মতো। যেমন; আহ্বান (আওভান্‌), আহ্বায়ক (আওভায়ক্‌)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ স্থানগুলি বুঝিয়ে দিন।
২. বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণের নিয়মগুলি বুঝিয়ে দিন।
৩. অন্তস্ত 'ব' ও অন্তস্থ 'য়'-এর উচ্চারণের নিয়মগুলি বুঝিয়ে দিন।
৪. উচ্চারণ রীতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যঞ্জনধ্বনি বলতে কী বুঝেন?
২. তালব্য ধ্বনির উদাহরণসহ সংজ্ঞা দিন।
৩. বাংলা ভাষার কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি লিখুন।
৪. অঘোষ ও ঘোষ ব্যঞ্জন বুঝিয়ে দিন।
৫. নাসিক্য ধ্বনি কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলি তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে

- *প্রতিবর্ণীকরণের সংজ্ঞার্থ দিতে পারবেন;*
- *প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বাংলা ভাষায় আশ্রিত বিদেশী শব্দগুলির প্রতিবর্ণীকরণ করতে পারবেন।*

সংজ্ঞার্থ

প্রতিবর্ণীকরণ বলতে এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় লিপ্যন্তর বা লেখাকে বোঝায়। সাধারণত বিদেশী শব্দগুলির লেখার ক্ষেত্রেই এই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। একে অনেকে বর্ণীকরণ বলেন।

বিদেশী শব্দ

এ কালের কোন ভাষাই মৌলিক নয়। বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারেও বিদেশী বহু শব্দ বিশেষত, আরবি-ফারসিসহ বিভিন্ন এশীয় ভাষার শব্দ এবং গ্রীক, ফরাসি, পোর্তুগিজ, জার্মান ইতালীয়, রুশ ইত্যাদি ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ স্থান পেয়েছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বাংলা আশ্রিত বিদেশী শব্দগুলির মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। কিছু তুর্কি শব্দও আমাদের ভাষায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু সেগুলি সরাসরি সে-ভাষা থেকে আসেনি। সেগুলি আরবি-ফারসির মাধ্যমেই বাংলায় প্রবেশ করেছে ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ জাতীয় শব্দগুলি প্রতিবর্ণীকরণে তাই আরবি-ফারসি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের নিয়মই প্রযোজ্য। এশীয় উৎসের চীনা, বর্মি, হিন্দি কিংবা তামিল ভাষার শব্দগুলি এমনভাবে মিশে আছে যে, সেগুলি কেউ ধরিয়ে না দিলে আমরা বুঝতে পারি না। এ সব শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম তাই আলাদাভাবে আমরা আলোচনা করছি না।

ইয়োরোপীয় উৎসের গ্রীক, রোমান, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, পোর্তুগিজ, স্প্যানিশ ইত্যাদি প্রকৃত পরিচয় আমরা খুব কমই জানি। দীর্ঘকাল এ উপমহাদেশ ইংরেজরা শাসন করেছে। পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক অর্থে ইংরেজির মাধ্যমেই। ইংরেজি ধ্বনিসাম্যের সঙ্গেও আমরা পরিচিত। ফলে ইয়োরোপীয় উৎস থেকে অনুপ্রবিষ্ট শব্দগুলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে আমরা ইংরেজি বর্ণমালাকেই অনুসরণ করছি।

প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম

বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ দু-ভাবে হতে পারে। [এক], বর্ণভিত্তিক (alphabetic) এবং [দুই], অক্ষরভিত্তিক (Syllabic)। ইংরেজি, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষার লিপি ও ধ্বনির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ফলে এ সব ভাষার শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে বর্ণগুলি পরপর সাজিয়ে দিলেই প্রতিবর্ণীকরণ করা যায়।

অক্ষরভিত্তিক প্রতিবর্ণীকরণে উচ্চারণই প্রাধান্য পায়। আমরা শব্দ লিখি কিন্তু উচ্চারণ করি অক্ষর। একটি শব্দ একটি মাত্র অক্ষরের সমন্বয়ে তৈরি হতে পারে। শব্দে আবার একাধিক অক্ষরও থাকে। অক্ষরভিত্তিক প্রতিবর্ণীকরণে উচ্চারণ অনুসারেই শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ করতে হয়। বাংলা ভাষার লিখন ব্যবস্থা একই সঙ্গে বর্ণভিত্তিক ও অক্ষরভিত্তিক। ধ্বনি ও বর্ণের সমতা অনুসারে আমরা লিখি 'একটি', 'তিন', 'ধান'। কিন্তু আমরা যখন লিখি 'অভিষেক' তখন আমরা অক্ষর অনুসারে লিখি। এখানে দুটি অক্ষর রয়েছে 'অভি+শেক' (উচ্চারণ অনুসারে দেখানো হয়েছে)। বর্ণভিত্তিক লিখন ব্যবস্থার বহির্ভূত কোন বিদেশী ভাষার শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে এ ব্যবস্থায় সব চেয়ে নিরাপদ। এর ফলে মূল উচ্চারণের অনেকটাই প্রতিবর্ণীকরণে ধরে রাখা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বাংলা উচ্চারণে কোন দীর্ঘ ধ্বনি নেই। ফলে বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে দীর্ঘ ঈ, কিংবা দীর্ঘ ঈ-কার গ্রহণ করা যাবে না। একইভাবে বাংলায় তিনটি শিস বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি তালব্য শ,

মূর্ধন্য ষ ও দন্ত্য স থাকলেও উচ্চারণে আমরা কেবল দুটি শিসধ্বনি শ এবং স পাই। ফলে এ দুটি ধ্বনিকেই প্রতিবর্ণীকরণের গ্রহণ করতে হবে। বর্গীয় জ এবং অন্তস্থ য প্রসঙ্গে একই কথা বলতে হয়। বাংলা লিপিতে 'জ' ও 'য' থাকলেও উচ্চারণে আছে কেবল 'জ'।

আরবি-ফারসি শব্দ

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দগুলির আগমন খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। আদি মধ্যযুগের অর্থাৎ ১৪শ থেকে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত কবি বড়ুচন্ডী দাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে মাত্র ৭টি আরবি-ফারসী শব্দ রয়েছে। এগুলি হলো 'আফের', 'কামান', 'খরমজা', 'বাকী', 'মঞ্জুরী', 'লেম্বু' ও 'সফেরু'। কিন্তু ক্রমান্বয়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও আরব বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং উপমহাদেশের রাজনৈতিক কারণে বহু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, এ কালে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার প্রতি একুশটি শব্দের মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দ হচ্ছে ৩.৩৩ টি।

আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের কিছু নিয়ম ১৯৩৬ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিধিতে উল্লিখিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক গৃহীত নিয়মে এবং বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানেও এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্রও এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। আমরা এ সব আলোচনার আলোকে আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়মগুলি এখন উল্লেখ করছি:

১. মূল শব্দে 'জোয়াদ' বা 'জাল' থাকলে 'জ' বা 'য' লিখতে হবে। সে-হিসেবে হবে আজান/আযান, ওজু/ওযু, এজিন/এযিন, কাজা/কাযা, নামাজ/নামায, জিকির/যিকির, জোহর/যোহর, রমজান/রমযান, হজরত/হযরত। একই শব্দের দুটি বানান প্রচলিত হলে বানানে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, বাংলা 'জ' ও 'য'-এর উচ্চারণ অভিন্ন। এ সব শব্দে 'য' ব্যবহারের যুক্তির মূলে আছে, ইংরেজি ড় ধ্বনির মতো ঘর্ষণজাত উচ্চারণ। কিন্তু এ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন না হলে তা করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ তা করে না। তারা সর্বত্র 'জ' উচ্চারণ করে। তাই আমাদের মতে, এ সব শব্দে 'জ' লেখাই উচিত।

২. মূলের 'সোয়াদ' বা 'সিন' থাকলে দন্ত্য (দন্তমূলীয়) স হবে। যেমন; অসি, অসিলা, আফসোস, আসমান, আসর, ইনসান, ইসবগুল, ইস্তফা, ওয়াসিল, ওস্তাদ, কসুর, কিস্তি, কুরসি, গোস্তাকি, তফসিল, তসবি, তসলিম, তহসিল, দুরস্ত, নসিব, ফিরিস্তি, মিসিলি, মুনসেফ, মুসাফির, মুসিবত, মুসা, মুস্তাকিম, সওয়ার, সফর, সফেদ, সালাত, সামাদ, সুকানি, সুন্নি, সুফি, সুরকি, সুরত, সুলতান, সেরেস্তা, সিয়াম, হাদিস। মৌরসি, বেসাত, সরকার, সরাসরি, সাদা, সাফ ইত্যাদি শব্দের 'স'-এর উচ্চারণে বাংলায় 'শ' প্রচলিত হয়ে গেছে। এ সব শব্দের বানানে প্রচলিত উচ্চারণ অনুযায়ী 'শ' প্রবর্তন করলে আমাদের চোখ তা সহজে গ্রহণ করতে রাজি হবে না। তাছাড়া এ সব শব্দের মূল তা সমর্থন করে না। তাই এ সব শব্দ উচ্চারণ অনুযায়ী না লেখাই ভালো।

৩. মূলে 'শিন' থাকলে তালব্য শ হয়। যেমন; আরশ, আশরাফি, কুর্নিশ, কিশমিশ, খবিশ, খরগোশ, খুশকি, তল্লাশি, নওশা, নকশি, নালিশ, নিশান, নেশা, নেশপাতি, পেশা, পোশাক, ফানুশ, বকশি, বাদশাহ, বেশ, মকশ, মালিশ, মুখোশ, রেশম, শরবত, শরাব, শরিফ, শর্ত, শহিদ, শালি, শানাই, শাবাশ, শামিয়ানা, শার্শি, শাদি, শাহাদত, শিকার, শিশি, শিরনি, শিরোপা, শেরি।

৪. কিছু আরবি-ফারসি শব্দের মূল উচ্চারণ দীর্ঘ হওয়ায় বাংলায় এ সব শব্দ প্রতিবর্ণীকরণে অনেকে দীর্ঘ ঈ ব্যবহার করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা একান্তই বাহ্যিক। বাংলা দীর্ঘ উচ্চারণ সম্ভভ নয়। তাই আরবি-ফারসি শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত, যেখানেই ই ধ্বনি আছে সেখানে ই বা ই কার ব্যবহার করতে হবে। অজিফা, অম্বুরি, অলি, আনজির, আজগুবি, আমির, আমিন, আর্জি, আলিম, আস্তিন, ইলাহি, ইহুদি, উকিল, উজির, আকিদা, এজমালি, এতিম, ওয়াকিব, ওয়াজিব, কলি, কাজি, কাফির, কালিয়া, কাহিল, কিমা, কুচি, কুলি, খতিব, খরিদ, খলিফা, বাকি, খাতির, খাদিম, খালি, খাসি, খোবানি, খুশি, গরিব, গাজি, গালিচা, গিরা, চরকি চর্বি, ছবি, ছানি, ছিনা, জমি, জরি, জরিফ, জামিন, জায়গির, জারি, জালি,

জামিন, জালিয়াত, জাহিদ, জাহির, জিগির, জিন, জিনিস, জিন্দা, জুলফি, টুপি, তকদির, তরিকা, তহবিল, তাগিদ, তাবিজ, তারিখ, তালিকা, দরজি, দরিয়া, দলিল, দাখিল।

৫. শব্দের সঙ্গে কিছু আরবি-ফারসি রূপমূল অর্থাৎ, প্রত্যয় ও উপসর্গ বাংলায় স্থান পেয়েছে। প্রত্যয়গুলি হলো আনি, গিরি, চি, দারি, দানি, বাজি। এ গুলির ই-ধ্বনির জন্যে ঈ বা ঈ-কার ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, বাংলা উচ্চারণে ঈ নেই। সে-কারণে এ সব প্রত্যয় যুক্ত শব্দ ই বা ই-কার দিয়ে লিখতে হবে। যেমন; হিন্দুয়ানি, বাবুগিরি, কর্তাগিরি, তবলচি, ধুনচি, মশালচি, চিলমচি, ফুলদানি, পিকদানি, তবিরদারি, জমিদারি, চাপাবাজি, গলাবাজি। ফারসি প্রত্যয়-'ওয়ালা' স্ত্রীলিঙ্গে হয় -'ওয়ালী',-'আলি',-'উলি'। এ সব প্রত্যয় যোগে তৈরি শব্দগুলিও লেখার একই নিয়ম অর্থাৎ ই দিয়ে এগুলি লিখতে হবে। যেমন; বাড়িওয়ালি, মাছউলি, বাসনালি।

৬. ফারসি উপসর্গগুলির মধ্যে 'পাতি', 'নিম', 'ফি' ও 'মাদি' বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এগুলির বানান হবেঃ পাতিহাঁস, পাতিনেবু, নিমরাজি, নিমমোল্লা, মাদি হাতি, মাদি কুকুর।

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাংলায় আগত শব্দকে আমরা ইংরেজি শব্দ বলছি। কিন্তু এভাবে প্রাপ্ত শব্দমাত্রই ইংরেজি নয় এবং খোদ ব্রিটিশদের কাছ থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমরা এগুলি পাইনি। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া অর্থাৎ, ইংরেজি ভাষী অন্যান্য দেশের শব্দও এর মধ্যে পড়ে। এ জাতীয় শব্দগুলি বাংলায় আসার আগেই ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের আগমনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইংরেজরা বাংলাদেশে বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ সনের পলাশি-যুদ্ধের পর তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল করে। ফলে ইয়োরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান ইংরেজদের মাধ্যমে বাঙালিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমান্বয়ে জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইংরেজির ছাপ বাংলা ভাষায় পড়তে থাকে। তাছাড়া ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার জন্য বর্তমান কালেও বাংলার উপর ইংরেজির প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলায় কয়েক-শো ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ গৃহীত হয়েছে দু-ভাবে। প্রথমত, মূলানুগভাবে অর্থাৎ, কিছু শব্দ সরাসরি ইংরেজি থেকে বাংলায় এসেছে। যেমন; চেয়ার, ট্রে, হকি, ক্রিকেট, বল, শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, রূপান্তরিতভাবে অর্থাৎ, কিছু শব্দ ইংরেজি থেকে বাংলায় আসার সময় কিছুটা হলেও বিকৃত হয়ে পড়েছে। এ জাতীয় শব্দগুলি বাংলা ধ্বনি-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে, এগুলিকে ইংরেজি বলে চেনাই যায় না। শব্দের এই বিকৃতিকে বলে লোকনিরুক্তি (এমফপ ঋহবমফমথহ) এ জাতীয় শব্দগুলি হচ্ছেঃ আর্দালি (orderly), উলুফ (Owl), জর্জ (judge) ডাক্তার (doctor), তারপিন (turpentine), পল্টন (paltoon), পলেস্তারা (plaster), পানসি (pinnace), পালিশ (Polish), পিজবোর্ড (pasteboard), পুলিশ (police), ফুলুট (flute), বাক্স (box), বান্ডিল (bundle), বেয়ারা (beraer), বেলেস্তারা (blister), মার্কা (mark), মার্কিন (American), মেম (ma'am), রাইফেল (rifle), লুণ্ঠন (lantern), শার্সি (Sash), হাতল (handle)। এ জাতীয় শব্দগুলি আমরা উচ্চারণ অনুসারে লিখি। ফলে এগুলির প্রতিবর্ণীকরণ সহজ।

এতোক্ষণ যে দু-ধরনের ইংরেজি শব্দের কথা বললাম এর বাইরে আরো এক ধরনের ইংরেজি শব্দ বাংলায় রয়েছে। এগুলিকে বলে অনূদিত ঋণ শব্দ (Translated Loan Word)। যেমন; অঙ্গীকার (agreement), সাঁজোয়া গাড়ি (armored car), দেহরক্ষী (ঠমঢহ থলটরঢ), স্বর্ণযুগ (golden age), পাদটীকা (foot note), সিংহভাগ (lion's share) ইত্যাদি। এ জাতীয় বেশির ভাগ শব্দ তৈরি করা হয়েছে তৎসম শব্দ-গঠন– রীতি অনুসরণ করে। তাই এগুলি লেখার জন্যে তৎসম শব্দের বানান বিধি অনুসরণ করতে হবে।

একটু আগে আমরা লিখন ব্যবস্থার কথা বলেছি। ইংরেজি লিখন ব্যবস্থা মূলত বর্ণভিত্তিক। ধ্বনি-প্রকাশক বর্ণগুলি পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই ইংরেজি শব্দের বানান হয়ে যায়। কিন্তু বাংলায় তা হয় না, বাংলা বানান

কখনো অক্ষরভিত্তিক আবার কখনো ধ্বনিভিত্তিক। ফলে ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে বাংলা সেই সব বর্ণকে গ্রহণ করতে হবে যেগুলির সাহায্যে ইংরেজি বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত ধ্বনির সমতা রয়েছে। এখন সে-বিষয়েই আলোচনা করছি। অর্থাৎ, ইংরেজি কোন্ বর্ণের জন্যে বাংলা কোন্ বর্ণ ব্যবহার করতে তা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

১. a থাকলে বাংলা এ্যা, e থাকলে এ হবে। যেমন; এ্যান্ড (and), এ্যাডভোকেট (advocate), এ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat), এন্ড (end), এন্ট্রি (entry)।

২. s থাকলে স্, sh থাকলে শ্ এবং st থাকলে স্ট হবে। যেমন; বাস (bus), শেইক (Shake), শেইম (shame), শেক্সপিয়র (Shakespeare), স্টার (star), স্টেডিয়ম (stadium)। কিন্তু s এর উচ্চারণ যেখানে শ্ সেখানে s-এর জন্যে শ্ হবে। যেমন; শুগার (sugar), প্রেশার (Pressure)

৩. কোন বিদেশী শব্দের বর্ণীকরণে ণ্ড, কিংবা ণ্ট হবে না। কারণ বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ নেই। যেমন; লন্ডন (London), ক্যান্টরবারি (Canterbury)।

৪. ই-কারান্ত ইংরেজি শব্দে সব সময় ই হবে। যেমন; হেনরি (Henry), মানি (money)।

৫. ইংরেজি শব্দের উচ্চারণে র্-এর পর ন্ থাকলেও বাংলায় মূর্ধন্য ণ হবে না। যেমন; এ্যাটর্নি (atorny), মর্নিং (morning)।

৬. c-এর উচ্চারণ কখনো স্ হলে c-এর জন্যে স্, ক হলে c-এর জন্যে ক হবে। যেমন; সাইকেল (cycle), সার্কল (circle)।

৭. ch-এর উচ্চারণ চ্ হলে এ জন্যে চ্ হবে। যেমন; চান্স (chance), চেইন (chain), মাচ্ (much)। কিন্তু যে-সব শব্দে ch-এর উচ্চারণ ক সে-সব ক্ষেত্রে ক এবং যেখানে শ্ সেখানে শ্ হবে। যেমন; কেমিক্যাল (chemical), কেমিস্ট্রি (chemistry), ম্যাশিন (machine)।

৮. ইংরেজি শব্দ -sion, -sion ও -tion থাকলে বাংলায় শন্ হবে। যেমন, ভিশন (vision), ম্যানশন (mansion), প্রফেশন (profession), প্রমোশন (promotion), টিউশন (tution)।

৯. ইংরেজি e -এর কয়েকটি উচ্চারণ রয়েছে এবং তা কখনো ই, কখনো এ। ফলে সেভাবেই শব্দগুলি লিখতে হবে। যেমন; পিরিয়ড (period), রেফারেন্স (reference), রিসার্চ (research), রিনিউ (renew)।

১০. ea এবং ee-এর উচ্চারণ দীর্ঘ কিন্তু বাংলা দীর্ঘ ধ্বনি না থাকায় লিখতে হবে ই। যেমন; সিট (seat), সিল (seal), শিপ (sheep), ফিল (fell), সিক (seek)।

১১. ইংরেজি শব্দের শেষে ণ থাকলে তার উচ্চারণ হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে উচ্চারণ উহ্য রাখতে হবে। যেমন; পিয়র (pure), রুড (rude), স্কেল (scale)।

১২. i-এর উচ্চারণ যেখানে ই সেখানে ই এবং যেখানে আই সেখানে আই লিখতে হবে। যেমন; মিনিস্টার (minister), মিল (mill), মিল্ক (milk), মিলিটারি (military), নাইস (nice), নাইট (night), মাইল (mile)।

১৩. y শব্দের প্রথমে ও স্বরের পূর্বে থাকলে তা দ্বি-স্বর। এর উচ্চারণ a এবং i-এর মিলিত উচ্চারণ। বাংলা 'য়্যা' লিখলে অনেকটা এ উচ্চারণ আসে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ধ্বনিবিজ্ঞানের এতো সূক্ষ্ম ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে ই ব্যবহার করাই ভালো। যেমন; ইয়াম (yam), ইয়াংকি (yankee), ইস্ট (yeast), ইউথ (youth), ইউল (yule)। কিন্তু শব্দের শেষে y থাকলে তার উচ্চারণ সব সময় ই এবং শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনের পরে থাকলে 'আই' বা 'ই'। যেমন; বেইবি (baby), বার্লি (barley), সাইকেল (ciycle), সিলিন্ডার (cylinder), সাইক্লোন (ciclone)।

গীক শব্দ

বাংলা ভাষায় আগত বিদেশী শব্দগুলির মধ্যে ইংরেজির পরই গ্রীক শব্দ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলায় গ্রীক শব্দগুলির প্রতিবর্ণীকরণে প্রায়ই মূলের উচ্চারণ রক্ষা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রধান কারণ আমাদের উনিশ শতকীয় ঐতিহ্য। এ কালে যেহেতু ইংরেজির মাধ্যমে আমরা শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, সেহেতু শব্দগুলি ইংরেজির মতোই লেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের একটি তালিকা দেখাই। এখানে দেখবেন নামগুলি গ্রীক কিন্তু লেখা আছে ইংরেজি বা রোমান বর্ণে। পাশে দেওয়া আছে এগুলির প্রচলিত ও ইংরেজি সুলভ উচ্চারণ। সব শেষে আছে গ্রীক উচ্চারণ। প্রতিবর্ণীকরণ মূলানুসারেই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

ইংরেজি বানান	**ইংরেজি উচ্চারণ**	**গ্রীক উচ্চারণ**
Cicero	সিসেরো	কিকেরো
Circe	সারসি	কির্কে
Hores	হোরেস	হোরেক
Longinus	লংগাইনাস	লংগিনুস
Tacitus	ট্যাসিটাস	তাকিতুস
Virgil	ভার্জিল	বির্গিল
Apollo	এ্যাপেলো	আপোলোলা
Aphrodite	এ্যাফ্রোডাইট	আফ্রোদিতে
Achilles	এ্যাকিলিস	আখিল্লেস
Aristotle	এ্যারিস্টটল	আরিস্তোতল
Dionysus	ডায়োনিসাস	দিয়োনুসুস
Plato	প্লেটো	প্লাতো
Socrates	সক্রেটিস	সোক্রেতেস
Oedipus	ইডিপাস	অয়দিপৌস
Aeschylus	ইস্কাইলাস	আয়স্খুলস

বাংলার সঙ্গে গ্রীকের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলার মতো স্পৃষ্ট ঘোষ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি গ্রীকে রয়েছে। বাংলা দ্বিত্ব উচ্চারণ [ন্ন, ম্ম] (যেমন; সন্ন্যাসী, সম্মান) গ্রীকেও বর্তমান। যেমন; *ll*: আখিল্লেস (Achielles), আপোল্লো (Appollo)। বাংলা ত্, দ্, প্, ব্ অল্পপ্রাণ এবং খ্, ভ্ মহাপ্রাণ ধ্বনি। গ্রীকেও তা লক্ষণীয়। গ্রীক t-এর উচ্চারণ বাংলা ত্, যেমন; তেরেউস (tereus), তুদেউস (Tydeus), th-থ, যেমন; থেয়োদেকতেস (Theodectes), থেসেইদা (Thesida), p→প, যেমন; পাউসোন (pauson), পিনদারোস (pindaros), ph→ফ, যেমন; ফিলোজেনুস (philoxenus), ফোরকিদেস।

গ্রীক i, j-এর উচ্চারণ প্রায় এক রকম, অনেকটা বাংলা ই-এর মতো। যেমন; ইফিগেনাইয়া (Iphigenei), আয়াস (Ajax)। কিন্তু u ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যময়। এর সাধারণ উচ্চারণ উ। কিন্তু শব্দের দুই ব্যঞ্জনের মাঝখানে থাকলে উচ্চারণ ও হয়। যেমন; দিয়োনিসোস (Dionysus)। এ ছাড়া অন্যান্য গ্রীক বর্ণগুলির প্রতিবর্ণীকরণ এভাবে হবে:

১. গ্রীক a থাকলে বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে আ হবে। যেমন; আগামেমনন (Agamemnon), আন্তিগোনে (Antigone)।

২. c→ ক্: কেনতাউর (centaur), ক্রাতেস (Crates)।

৩. d→ দ্: দেসদিমোনা (Desdimona), ওদুসসেউস (Odysseus)।

৪. e→ এ: এলেকত্রা (Electra)।

৫. g→ গ্: আগিসথোস (Aefiothus)।

৬. r→ র্/ রেফ: হোমের (Homer)।

৭. s→স্: আরিসতোফোনেস (Aristohpanes)।

৮. x,y→জ্: জেনারখুস (xenarchus), জেনোফোন (xenohpon), জেকসিস (Zeksis)।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন নিশ্চয় বুঝেছেন যে, গ্রীক শব্দ বিশেষত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে গিয়ে আমরা যে-সব গ্রীক নামের সঙ্গে পরিচিত হই সে-সব নামের প্রতিবর্ণীকরণে মূলের প্রতি আনুগত্য খুব বেশি নেই। আমাদের বিশ্বাস, আপনারা এখন সহজেই এ সব নাম প্রতিবর্ণীকরণ করতে পারবেন।

ফরাসি, জার্মান, পোর্তুগিজ এমনকি ইতালীয় ভাষার বেশ কিছু শব্দও বাংলা ভাষায় রয়েছে। এ সব ভাষার শব্দগুলির প্রতিবর্ণীকরণেও সেই সব ভাষার মূল ধ্বনি ও ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ কাজ সহজ নয়। সবার সব ভাষা জানারও প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের অনেকেই এ সব ভাষা জানেন। তাঁদের সাহায্যে আমরা এগুলির প্রতিবর্ণীকরণও করতে পারি। জার্মান শব্দ বাংলা ভাষায় তুলনামূলকভাবে কম। ফরাশি সে-অনুপাতে কিছুটা বেশি। কিন্তু এ সব শব্দ বাংলায় অনুপ্রবেশ করার সময় একভাবে প্রতিবর্ণীকৃত হয়ে আছে। এগুলি সেভাবে থাকতে পারে। পোর্তুগিজ শব্দগুলি বাংলায় কিছুটা বিকৃতভাবে প্রতিবর্ণীকৃত হয়েছে। যেমন, 'ক্রিস্টোস' (cristos), হয়েছে খ্রিস্ট/খৃষ্ট/খ্রিষ্ট/খ্রীষ্ট। এগুলিরও পরিবর্তনেরও প্রয়োজন নেই। কেননা দীর্ঘ ব্যবহার এগুলি বাংলায় এমনভাবে মিশে আছে যে, পরিবর্তন অনেকেই গ্রহণ করতে চাইবেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রতিবর্ণীকরণ কাকে বলে ও কত প্রকার? আলোচনা করুন।
২. আরবি-ফারসি শব্দগুলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম বুঝিয়ে দিন।
৩. ইংরেজি অথবা গ্রীক শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রতিবর্ণীকরণ কাকে বলে?
২. বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের উপায়গুলি লিখুন।
৩. বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ কীভাবে গৃহীত হয়েছে? বুঝিয়ে দিন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলি তৈরি করুন।

৫

বাংলা অভিধান ও শব্দকোষ

ইংরেজি 'Dictionary' শব্দের বাংলা রূপ হলো অভিধান। ভাষার শব্দ, শব্দগুচ্ছ, শব্দের উৎস, শব্দের অর্থ ইত্যাদি বিষয় অভিধান নামক গ্রন্থে থাকে। অভিধান নানা রকম হতে পারে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির জন্য জ্ঞান শাখার নানান দিকের প্রসার ঘটেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করতে গেলেই ভাষার মাধ্যমে তা করতে হয়। ভাষা বলতেই শব্দের প্রসঙ্গ যেমন আসে, তেমনি অর্থের প্রসঙ্গও এসে যায়। শব্দের অর্থ, বানান ইত্যাদির জন্য অভিধানের সাহায্য নিতে হয়। অভিধান হলো কোন বিশেষ জ্ঞান শাখার শব্দসংগ্রহের গ্রন্থ। অভিধানের ব্যবহার রীতি থাকে। অসংখ্য শব্দের মধ্য থেকে অতি অল্প সময়েই নিজের প্রয়োজনীয় শব্দটির বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পেতে হলে অভিধানের ব্যবহার রীতির বিষয়ে জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ-১. সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
- পাঠ-২. অভিধানের প্রয়োজনীয়তা
- পাঠ-৩. বাংলা অভিধানের ব্যবহার রীতি

পাঠ - ১

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- *অভিধানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;*
- *বিভিন্ন প্রকার অভিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;*
- *বাংলা অভিধানের প্রণয়ন রীতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।*

সংজ্ঞা

লাতিন *dictionarium, dictionarius* শব্দ থেকে ইংরেজি *dictionary* বা অভিধানের উৎপত্তি। লাতিন শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক এবং এর মাধ্যমে কথা, নীতি, বাচন, শব্দ, বক্তৃতা ইত্যাদিকে বোঝানো হতো। পরবর্তীকালে অভিধানের অর্থ সংহত। অভিধান বলতে এখন যা বোঝায় তা হলো:

- কোন ভাষার শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ ও অন্যান্য তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ।
- সম্বলিত গ্রন্থ।

অভিধান হলো কোন ভাষার শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ ও অন্যান্য তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ।

উপরে অভিধানের যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে একীভূত করে সংক্ষেপে অভিধানের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করে আমরা বলতে পারি: অভিধান হলো কোন ভাষার সেই গ্রন্থ যেখানে সেই ভাষার শব্দসমূহ ও সেগুলির অর্থ, শব্দগুলির সংজ্ঞার্থ ও উৎপত্তি; কখনো শব্দসমূহের সমার্থবাহী অন্য ভাষার শব্দগুচ্ছ এবং কখনো কোন নির্দিষ্ট বিষয় এবং সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রথিত থাকে।

অভিধান রচনার সূচনা হয়েছে খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আমাদের জানা মতে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম অভিধান রচিত হয়। এ অভিধানে পাশাপাশি দুটি স্তম্ভ (column)-এ সুমেরীয় ও অক্কাদীয় ভাষার শব্দ স্থান পেয়েছিল। ইয়োরোপে অভিধান রচিত হয়েছে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে। এর নাম *Promptorium Parvulorum Sive Clercorum.* বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান রচিত হয় ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে। এর রচয়িতা ছিলেন পোর্তুগিজ পাদ্রি মানুয়েল দ্য আস্‌সুম্পসাউঁ। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিজবোঁ (Lisbon) থেকে অভিধানটি প্রকাশিত হয়। এর নাম 'বাংলা-পোর্তুগিজ শব্দকোষ' *(Vocabulario em idioma Bengala e Portuguez)*।

অভিধানের প্রকারভেদ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও চর্চার সঙ্গে নানা শ্রেণীর অভিধানের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করেছে। ফলে নানা ধরনের অভিধানও রচিত হয়েছে। এ সব অভিধানের আশ্রিত বিষয়ের মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে। নিচে বহুল ব্যবহৃত ও তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় প্রণিত হয়েছে এমন কিছু অভিধানের পরিচয় দেয়া হলো।

দ্বি-ভাষিক অভিধান (Bilingual Dictionary)

এ জাতীয় অভিধানে এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় সেই একই জাতীয় শব্দের অনুবাদ সংকলিত হয়। এ শ্রেণীর একটি অতিপরিচিত অভিধান *Samsad English-Bengali Dictionary (1959)*। এ অভিধানে ইংরেজি শব্দের সমার্থক বাংলা শব্দ নির্বাচন ও সেগুলির সংকলন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অভিধান প্রণেতার একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ রেখেই তিনি তাঁর অভিপ্রেত কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন। অভিধানটির বাস্তব পরিচয় তুলে ধরে এর শব্দ-সংকলনের পরিচয়

সহজেই তুলে ধরা যায়। এ অভিধানে ইংরেজি ability শব্দের বাংলা সমার্থক শব্দ দেখানো হয়েছে: 'সামর্থ্য, মানসিক বা শারীরিক শক্তি বা ক্ষমতা' ইত্যাদি।

এক-ভাষিক অভিধান (Monolingual Dictionary)

এ জাতীয় অভিধানে কেবল একটি বিশেষ ভাষার শব্দই গ্রহণ করা এবং সে-সব শব্দের সংজ্ঞার্থ ও সমার্থ শব্দ দেখানো হয়। এ পরিচয়ে বদ্ধ একটি অভিধান হলো মিলন দত্ত ও অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সঞ্চয়িতা' (১৯৯৫)। এ অভিধানে বাংলা ভাষার শব্দগুলির সংজ্ঞার্থ ও অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, 'অকপটতা' শব্দ সম্পর্কে লেখা হয়েছে (প্রাগুক্ত: ০৩): 'সরলতা; কপটতাশূন্যতা।'

এক ভাষিক অভিধানে অনেক সময় শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বাক্যে শব্দটির ব্যবহার নির্দেশ করা হয়। বাংলা ভাষার এ জাতীয় একটি বিখ্যাত অভিধান হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১৩৪০-১৩৫৩)। এ অভিধানে 'অনিচ্ছা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যবহার দেখানো হয়েছে (হরিচরণ; ১৯৬৬; ৭১) এভাবে:

এক ভাষিক অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বাক্যে শব্দের ব্যবহার নির্দেশ করা হয়।

> অনিচ্ছা স্ত্রী [ন ইচ্ছা, ন.ত,] ১ ইচ্ছাভাব, অনভিলাষ। "মনু ১১, ১২৫। (মহিষীরা) নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক যজ্ঞদর্শনে গমন করিলেন সী ২। ২ ঔদাসীন্য, বিরাগ। রাম তদ্বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া মৌনভাবে অধোবদনে অবস্থিত রহিলেন সী ৬৮।

লক্ষণীয়, এ অভিধানে শব্দের ব্যাকরণিক গঠন এবং বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে শব্দের ব্যবহার দেখানো হয়েছে (ন.ত, = নঞ তৎপুরুষ সমাস; সী = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'সীতার বনবাস' শীর্ষক গ্রন্থ)।

উচ্চারণ অভিধান

আভিধানিক শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশের প্রয়োজনীয়তা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই অনুভূত হয়। কিন্তু এ বিষয়ক অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে আরো পূর্বে, ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল বেইলি *(Nathaniel Bailey)* রচিত *Dictionarium Britanicum*-এ। ১৭৩৫ সনে প্রকাশিত টমাস ডাইসি ও উইলিয়ম গার্ডন *(Thomas Dyche and William pardon)* প্রণীত *New General English Dictionary*-তেও বেইলির অনুসরণে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু শব্দের পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণ নির্দেশ এ অভিধানে ছিল না। ডাইসি ও গার্ডন কেবল শীর্ষশব্দে *(head word)* শ্বাসাঘাত (stress) দেখিয়ে উচ্চারণ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উচ্চারণ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ অভিধান অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত জন ওয়াকার *(John walker)*-এর *Critical Pronouncing Dictionary*. ওয়াকারের অভিধান পরবর্তীকালের অভিধানগুলিকে প্রভাবিত করেছে এবং তাঁর অনুসরণে ইংরেজি ভাষার এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণ সম্বলিত অভিধান প্রণীত হয়েছে।

উচ্চারণ অভিধানের প্রকৃত জনপ্রিয়তার সূচনা উনিশ শতকে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ধ্বনিবিজ্ঞান-চর্চার অভূতপূর্ব অগ্রগতি। বিশ শতকে এসে সে-প্রচেষ্ঠা হয়েছে আরো ব্যাপক।

উচ্চারণ অভিধানের প্রকৃত জনপ্রিয়তার সূচনা উনিশ শতকে।

ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোন্‌স্ (Daniel Jones)-এর অবদানও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ১৯৭১ সনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা *(International phonetic Alphabet)*-র সাহায্যে উচ্চারণ নির্দেশ করে প্রকাশ করেন *English pronouncing Dictionary.*

বাংলা ভাষায় রচিত অবিধানগুলির মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৩২৩/১৯১৬)-এ উচ্চারণ-সূত্রের উল্লেখ থাকলেও প্রথম বাংলা উচ্চারণ অভিধান হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে ধীরানন্দ ঠাকুর রচিত 'বাংলা উচ্চারণকোষ' (১৩৬১/১৯৫৪)-কেই গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশের প্রথম উচ্চারণ অভিধান প্রস্তুত করেছেন নরেন বিশ্বাস ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে বা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর অভিধানের নাম 'ব্যাবহারিক বাঙলা উচ্চারণ অভিধান'। এ অভিধানে প্রায় ষোল হাজার শব্দের উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় অপর একটি অভিধান 'সংসদ বাংলা উচ্চারণ অভিধান' (১৯৯২)। সুভাষ ভট্টাচার্য অভিধানটি প্রণয়ন

করেছেন। পূর্ববর্তী অভিধান থেকে সুভাষ ভট্টাচার্যের অভিধান স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। কেননা, এ অভিধানেই প্রথম বাংলা শব্দের পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণ দেখানোর জন্যে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ অভিধানে একই শব্দের আনুষ্ঠানিক (তমরবটফ) ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ দেওয়া আছে। এ অভিধানে নির্দেশি শব্দের উচ্চারণের পরিচয় দিতে গিয়ে 'পদ্ম' (পূর্বোক্ত:১৭৬) শব্দের উচ্চারণ দেখানো যায়:

পদ্ম (ফুলবিশেষ, lotus) পদ্‌দো/পদ্‌দোঁ [poddo]।

সমার্থ অভিধান

সম্পর্কিত ও অভিন্ন অর্থ বহন করে এমন শব্দগুলি সমন্বিত ও বিষয়ানুসারে সজ্জিত করে রচিত অভিধানকেই সমার্থ অভিধান বা শব্দকোষ বলে। সাধারণ অভিধান থেকে এ জাতীয় অভিধানের পার্থক্য তাই সুস্পষ্ট। এ অভিধানে শব্দের সংজ্ঞার্থ থাকে না এবং শব্দগুলিকে বর্ণনানুক্রমিকভাবে সাজানোও হয় না। সমার্থ অভিধানে বিষয়ই প্রাধান্য পায় এবং সে-অনুসারে শীর্ষশব্দ এবং এ সব শব্দের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত বিষয়ের সহায়ক শব্দগুলি সাজানো থাকে।

সম্পর্কিত ও অভিন্ন অর্থ বহন করে এমন শব্দ সমন্বিত ও বিষয়ানুসারে এ সব শব্দ সজ্জিত করে রচিত অভিধানই সমার্থ অভিধান।

সমার্থ অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায় ১৮৫২ সনে। পিটার মার্ক রোজে (Peter Mark Roget; ১৭৭৯-১৮৬৯) এ অভিধান প্রস্তুত করেন। অভিধানটির নামকরণের থেকেও এর রচয়িতার নাম বোঝা যায়। এর নাম হলো *RogetÕs Thesaurus of English Words and Phrases.* রোজের অভিধানে শব্দগুলিকে জীববিজ্ঞানের (Biology) বর্গ ও প্রজাতি (থণভণরট টভদ্র্যণডধণ্র) অনুসারে সজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলির সংজ্ঞার্থ এতে দেওয়া হয়নি কিংবা শব্দগুলির কোন অন্তর্গত পার্থক্য নির্দেশিত হয়নি। শব্দগুলিকে কেবল অর্থের দিক থেকে সমধর্মী ও বিপরীতধর্মী (Synonyms and antonyms) শ্রেণী হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। অভিধানটি পাঠকের দু-ভাবে প্রয়োজনে আসে। প্রথমত, পাঠক সহজেই এ থেকে শব্দ সন্ধান করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যে-সব শব্দের অর্থ জানা আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে শব্দটি স্মরণে আসছে না, এমন অবস্থায় অভিধানটি থেকে শব্দ দেখা যেতে পারে। প্রকাশ-কাল থেকে এ পর্যন্ত রোজে-র অভিধান বহুবার সংশোধিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় সমার্থ অভিধান সংকলনের প্রথম প্রচেষ্টা গৃহীত হয় উনিশ শতকে। এ প্রসঙ্গে 'শব্দাম্বুধি' (১৮৫৩) অভিধানটির উল্লেখ চলে। এ অভিধানের আদর্শ ছিল অমরসিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'। 'শব্দাম্বুধি'র আদর্শে ১৯৫৫/১৩৬২ সনে আর একটি অভিধান প্রাণতোষ ঘটক রচিত 'রত্নমালা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ অভিধানে শব্দ সন্ধানের কোন পদ্ধতি ছিল না। ফলে একে সমার্থ অভিধান হিসেবে গ্রহণ না করে 'পর্যায় (synonym) শব্দকোষ'-রূপে গ্রহণ করাই ভালো।

প্রকৃত অর্থে প্রথম বাংলা সমার্থ অভিধান হলো 'যথাশব্দ' (১৯৮২)। রোজে-র আদর্শে পরিকল্পিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এ অভিধানের রচয়িতা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। এর পর অশোক মুখোপাধ্যায় সংকলন করেন 'সংসদ সমার্থক শব্দকোষ' (১৯৮৭)। সম্প্রতি আর-এক ধরনের সমার্থ অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। একে বলা যায় দ্বি-ভাষিক সমার্থ অভিধান। জগন্নাথ চক্রবর্তী রচিত 'মণিমঞ্জুষা' এ জাতীয় অভিধান। এ অভিধানে কেবল বাংলা শব্দেরই সমার্থ শব্দ দেওয়া হয়নি, পাশাপাশি শব্দগুলির ইংরেজি সমধর্মী শব্দও উদ্ধৃত হয়েছে। 'মণিমঞ্জুষা'র স্বাতন্ত্র্য বা অভিনবত্ব এ অভিধান থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেও বোঝানো যায় (১৯৯৩:১৮):

অক্ষত বিণ. সম্পূর্ণ, আস্ত, পুরো, গোটা, অখন্ড, অনাহত, নিখুঁত, অচ্ছিন্ন, অসংক্ষেপিত, সুস্থ, নিরাপদ।

unhurt, unwounded, unijured, unimpaired, unmanaged, unblemished, unbrusied, whole, unbroken, untouched, undamaged, intact, healthy, safe, unaffected, unmolested, unexpurgated, uncut, uncensored, unabridged.

লক্ষণীয়, এ অভিধানে অক্ষত শব্দের পদপ্রকরণ(বিণ.) দেখানো হয়েছে এবং শব্দটির বাংলা ও ইংরেজি সম-অর্থবাহী শব্দগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

বানান অভিধান

লিখিত ভাষায় বানান বৈচিত্র্যকে স্বীকার করলে ভাষায় সমতা বিধান দুরূহ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একই শব্দের একাধিক বানান ব্যবহার করতে হয়। শিক্ষার্থীদের জন্যে এ এক সমস্যা। অন্যদের জন্যেও সমস্যাটি প্রবল। কোন্ বানান শুদ্ধ, কোন্‌টি ব্যাকরণের সূত্র অনুমোদন করে না ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিনিয়তই দ্বিধায় পড়তে হবে। লিখিত ভাষার এই বিশৃঙ্খলা দূর করে বানানে সমতা আনাই তাই বানান অভিধান রচনার লক্ষ্য। ইংরেজি ভাষার শব্দগুলি সব অভিধানেই একই বানানে লেখা দেখা যায়। কিন্তু আদিতে তা ছিল না। ভাষাবিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলেই ইংরেজি ভাষার বানানে শৃঙ্খলা এসেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এখনো তা করা যায়নি। ব্যক্তিবিশেষের প্রবণতা অনুযায়ী এখানে বাংলা বানান লেখা হয়। উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে এ বৈচিত্র্য আরো প্রবল ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সনে এ লক্ষ্যেই বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করে। গত কয়েক বছরে অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা বানানে বর্তমানে অনেকটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা গেছে। ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলা বানান-অভিধান' (১৯৯৪)। বাংলাদেশ টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে বোর্ডের নিজস্ব বানান রীতি 'পাঠ্য বইয়ের বানান' (১৯৯২)। অরুন সেন বের করেছেন 'বানানের অভিধান: বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন' (১৯৯৩)। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'আকাদেমি বানান অভিধান' (১৯৯৭)। অশোক মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'সংসদ বানান অভিধান' (১৯৮০)-ও প্রকাশিত হয়েছে।

বানান অভিধানে শব্দের সংজ্ঞার্থে কিংবা ব্যুৎপত্তি থাকে না। এ অভিধানে কেবল শব্দের বানান দেওয়া থাকে। অনেক সময় শব্দের গঠন-বৈশিষ্ট্য, অর্থ ও শব্দের প্রকার অর্থাৎ শব্দটি বিশেষ্য না বিশেষণ কিংবা ক্রিয়া-ইত্যাদিও এ অভিধানে নির্দেশ করা হয়।

পৌরাণিক অভিধান

পূরাণ শব্দের অর্থ প্রাচীন, পুরাতন, অনাদি ইত্যাদি। সে-অর্থে পৌরাণিক অভিধানে প্রাচীন কালের ঘটনাই স্থান পায়। কিন্তু পুরাণের অর্থ আরো ব্যাপক ও প্রসারিত। ভারতীয় পুরাণের কথা বললে বৈদিক যুগের পরবর্তীকালের বা জনশ্রুতি অবলম্বনে ব্যাসদেব কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ বা গ্রন্থসমূহকে বোঝায়। এ সব ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত একটি জনপ্রিয় অভিধান হলো সুধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত 'পৌরাণিক অভিধান' (১৩৩৫)। গ্রীক ও রোমক জাতির পুরাকালের ঘটনাকে উপজীব্য করেও পৌরাণিক অভিধান বা *Mythological Dictionary* রচিত হয়েছে। পুরাণ অতীত কালের ঘটনা হলেও এ সব ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা কখনো হারায়নি। কেননা এ সব ঘটনা বা কাহিনীর মধ্য দিয়ে মানুষের সংগ্রামশীলতা, তার সৃষ্টিশীল আচরণ, সমাজের গঠন, জাতির মৌলিক পরিচয় প্রকাশ পায়। ফলে একালের মানুষের কাছেও পুরাণ প্রিয় ও আদ্রিত বিষয়।

ঐতিহাসিক অভিধান

ইতিহাসের ঘটনাধারা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের আশ্রয় করে রচিত অভিধানই হচ্ছে ঐতিহাসিক অভিধান।

যা ঘটে তা হলো ইতিহাস। দূর অতীতে কিংবা নিকট অতীতে সংঘটিত ঘটনাও ইতিহাস। ঘটনা ইতিহাসের উপজীব্য বিষয় হলেও প্রতিটি ঘটনার অন্তরালে সক্রিয় থাকে মানুষ ও মানবীয় প্রচেষ্টা। সে-অর্থে ব্যক্তিও ঐতিহাসিক তাৎপর্য পায়। ঐতিহাসিক অভিধানে তাই ঘটনার পাশাপাশি ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, ইতিহাসের ঘটনাধারা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের আশ্রয় করে রচিত অভিধানই হচ্ছে ঐতিহাসিক অভিধান। এ জাতীয় অভিধানের সাধারণত দুটি প্রকার ভেদ লক্ষ করা যায়। প্রথমত, দেশীয় বা কোন একটি বিশেষ দেশের একটি নির্দিষ্ট কালের ঘটনা ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত অভিধান। যেমন; বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ঐতিহাসিক অভিধান। এ অভিধানে কেবল উপমহাদেশের ঘটনা ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিরাই স্থান পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের ঘটনাধারা ও অতীতে এ সব ঘটনায় যে সব

আন্তর্জাতিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তাঁদের আশ্রয় করে রচিত অভিধান। এ জাতীয় একটি অভিধান হচ্ছে সুভাষ ভট্টাচার্য রচিত ও কলকাতার কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পনী প্রকাশিত ‘বিশ্ব ইতিহাস অভিধান’ (১৯৯২)। এ অভিধানে ১৭৮৯ সন থেকে শুরু করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ স্থান পেয়েছে।

এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ও অভিধান

মানবীয় জ্ঞানের সম্ভাব্য সব তথ্য যে গ্রন্থ বা গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত থাকে তা-ই হলো এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ। এ গ্রন্থ জ্ঞানের সকল শাখাকে আশ্রয় করে বা কোন বিশেষ বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হতে পারে। মানুষের জানা মতে, প্রথম এন্‌সাইক্লোপেডিয়া রচিত হয় প্রাচীন গ্রীসে ৭৯ অব্দে। ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম এন্‌সাইক্লোপেডিয়া হচ্ছে *Lexicon Technicum* (১৭০৪)। এ এন্‌সাইক্লোপেডিয়া প্রস্তুত করেন জন হ্যারিস (John Harris)। এরপর ১৯৮২ সনে এপ্রিহাম চেম্বার্স (Ephriham Chambers) কর্তৃক প্রকাশিত হয় *Chambers Encyclopedia.* পূর্ববর্তী এন্‌সাইক্লোপেডিয়াগুলির তুলনায় চেম্বার্স-এর এন্‌সাইক্লোপেডিয়া সমকালীন ইয়োরোপীয় সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফরাশি ভাষায় দিদেরো ও দ্যা আলেমবার্ত (Didero and D'Alembert)-এর অনুবাদ (১৭৫১-৭২) প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে ব্রিটেনে এন্‌সাইক্লোপেডিয়া প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং গঠিত হয় এন্‌সাইক্লোপেডিয়া-বিশেষজ্ঞ সমাজ। তাঁদের প্রচেষ্টা থেকেই রচিত হয়েছে ২৮ খন্ডের বিখ্যাত *Encyeclopedia Britan-nica* (১৬৮-৭১)।

মানবীয় জ্ঞানের সম্ভাব্য সব তথ্য যে গ্রন্থ বা গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত থাকে তা-ই হলো এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ

অভিধানের সঙ্গে এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার পার্থক্য মূলত শব্দের অন্তর্ভুক্তি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশের। দ্বিতীয়ত, বিষয়বিশেষের বাইরে কোন তথ্য ও প্রসঙ্গ এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায় গ্রহণ করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার উল্লেখ চলে। এ এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্র-বহির্ভূত কোন তথ্য নেই। এ কালে অভিধান ও এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার মধ্যে পার্থক্য খুবই ক্ষীণ। অভিধান রচনায় এখন গৃহীত হচ্ছে এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার রচনা কৌশল।

বাংলা ভাষায় এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ রচনায় প্রথম নিয়োজিত হন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও রঙ্গলাল সেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। তাঁদের প্রচেষ্টায় এ সংকলনের অ-এর অংশ একই বৎসর প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্যনাথের অনুপস্থিতিতে রঙ্গলাল সেন আরো তিনটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এর পর তা আর প্রকাশিত হয়নি। বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন (১৮৮৬-১৯১১) নগেন্দ্রনাথ বসু। অতঃপর বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সাধারণ ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে।

জনপ্রিয় অভিধান

উনিশ শতকের শেষে ব্রিটেনে অভিধান রচনার ধারায় বৈচিত্র্য আসে। সহজে ব্যবহারযোগ্য ও বহনযোগ্য করার উদ্দেশ্যে এবং সে-অনুযায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে অভিধান প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। এ জাতীয় অভিধানগুলি সাধারণত একখন্ডে সমাপ্ত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *ChamberÕs English Dictionary* এ শ্রেণীর একটি অভিধান। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অধিকাংশ অভিধানই এই একই পরিচয়ের। উদাহরণ হিসেবে রাজশেখর বসু-রচিত ‘চলন্তিকা’ (১৩৫৮/১৯৫১) বা ‘আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান’, কাজী আবদুল ওদুদ-এর ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’ (১৯৭১), ঋষি দাস সংকলিত ‘আধুনিক বাংলা অভিধান’ (১৯৯২), বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান’ (১৯৯২) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

বিবিধ বিষয়াশ্রয়ী অভিধান

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফলে অভিধানের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে এখন নানা বিষয়কে উপজীব্য করে

রচিত হচ্ছে অভিধান। এ সব অভিধানের নামকরণ থেকেই এগুলির বিষয় ও ধরন বোঝা যায়। নিচে এ জাতীয় কিছু অভিধান এবং এগুলির রচয়িতা, প্রকাশকাল, প্রকাশকসহ উদ্ধৃত হলো।

প্রকাশকাল	**রচয়িতা**	**অভিধানের নাম**	**প্রকাশক**
১৯৮৯	অশোক মুখোপাধ্যায়	সংসদ্ ব্যাকরণ অভিধান	সাহিত্য সংসদ্, কলকাতা
১৯৯৩	সুভাষ ভট্টাচার্য	সংসদ্ বাগ্ধারা অভিধান	সাহিত্য সংসদ্, কলকাতা
১৯৯৭	সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	রাজনীতির অভিধান	আনন্দ পাবরিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকতা
১৯৯৭	যোগনাথ মুখোপাধ্যায়	রাষ্ট্র অভিধান	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
১৯৯৮	আশফাক-উল আলম ও অন্যান্য	বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান	বাংলাএকাডেমী, ঢাকা
১৯৯৯	বিদেশী বাঙলা শব্দের অভিধান	রবিশঙ্কর মৈত্র বৈজ্ঞানিক অভিধান	অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা
১৩৮১	শুভেন্দ্রকুমার মিত্র		মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন প্রকার অভিধান উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
২. অভিধান ও এনসাইক্লোপেড়িয়া কি সমার্থক? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
৩. উচ্চারণ অভিধান বলতে কী বুঝেন? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অভিধান কাকে বলে?
২. বাংলা দেশের প্রথম উচ্চারণ অভিধানের রচয়িতা কে? অভিধানটির নাম কি?
৩. ইউরোপে কত সালে প্রথম অভিধান রচিত হয়? এ অভিধানের নাম কি?

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলি তৈরি করুন।

পাঠ - ২

অভিধানের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- *অভিধানের ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;*
- *প্রয়োজন অনুসারে অভিধান ব্যবহার করতে পারবেন।*

অভিধান মূলত শব্দসংগ্রহ

অভিধান মূলত শব্দসংগ্রহ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের শব্দ নিয়ে প্রতিনিয়তই ভাবতে হয়। সবার ভাবনাও এক ধরনের নয়। কেউ ভাবেন বিষয় সম্পর্কে। ধরা যাক উপন্যাস সম্পর্কে তিনি জানতে আগ্রহী। তাঁর জন্যে তাই রয়েছে সাহিত্যিক অভিধান। এ অভিধানটির সাহায্যে অনায়াসেই তিনি উপন্যাস কী, এর প্রকারভেদ, সাংগঠনিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব এবং এর সাম্প্রতিক রূপ-রূপান্তর সম্পর্কেও তিনি এ অভিধান থেকে ধারণা পাবেন। কারোর মস্তিস্কে হয়তো একটি ভাবনা বা চিন্তা এসেছে। কিন্তু তা প্রকাশের উপযোগী ও অনিবার্য শব্দ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। এ অবস্থায়, এই ব্যাকুল দশা থেকে তাঁকে মুক্তি দিতে পারে অভিধান। প্রাবন্ধিকেরা প্রায়ই ভাবিত হন শব্দ সম্পর্কে। সমার্থ শব্দ ছাড়া তাঁদের কাজ চলে না। চিন্তাকে যথার্থভাবে রূপ দানের জন্যে অনেক সময় তাঁদের নতুন শব্দ তৈরিও করতে হয়। কিন্তু আমরা জানি শব্দ তৈরির একটি নিয়ম আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটলে বা ইচ্ছাবিলাসী হলে প্রাবন্ধিকের শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গ বিরূপ সমালোচনা বিষয়ে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে তাঁরও আশ্রয় হচ্ছে অভিধান। সমার্থ ও প্রায়োগিক অভিধানগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ভুল বানানের চর্চা করলে কিংবা পরীক্ষার উত্তরপত্রে ভুল বানানে উত্তর লিখলে সুফল পায় না। তাদের জন্যে তাই রয়েছে জনপ্রিয় সব অভিধান। ইংরেজি ভাষায় অনেক রকম ছাত্রপাঠ্য অভিধান রয়েছে। বাংলা ভাষাতেও এখন এ জতীয় অভিধান প্রণিত হচ্ছে। অভিধান প্রস্তুত করতে গিয়ে এখন শিশু-কিশোরদের কথাও ভাবা হয়। তাদের প্রয়োজন অনুসারেও এখন প্রায় সব সমৃদ্ধ ভাষায় রচনা করা হচ্ছে শিশু-কিশোর অভিধান।

যাঁরা সাধারণ মানুষ, ভাষার ব্যবহারিক চর্চা তাঁদের নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তাঁদের জীবনেও অভিধানের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। বরং সে-চাহিদা এখন ক্রমবর্ধমান। প্রতিদিনই নতুন-নতুন বিষয় তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আত্মমূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, এ সব বিষয়ের কিছু তাঁদের জানা, কিছু বিষয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুবই সামান্য বা ভাসা-ভাসা, কিছু বিষয় তাঁদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। চোখ কান বন্ধ করে এবং সব কিছু থেকে দূরে সরে থাকা এ কালের কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সে-জন্য তাঁরা অভিধানের সহায়তা নিয়ে থাকেন। কোন প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজন তাঁদের সিদ্ধ করতে হয় না। তাঁদের দায়বদ্ধতা একান্তই মানসিক। অন্তর্লোকে ঘনীভূত কৌতূহল পূরণ, মনের একান্ত গভীর জাগ্রত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতেই তাঁদের জীবনে অভিধান প্রয়োজনীয়।

আমরা ক্রমশ সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। বিশ, এমনকি দশ বছর আগে মানুষ যা ভাবেনি এখন তা তার কাছে বাস্তব, স্পষ্ট, মূর্ত ও সত্য। সব কিছু সম্পর্কেই এখন তার রয়েছে জাগ্রত কৌতূহল। অবাধ তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে গোটা বিশ্বেই এখন মানুষ পরিভ্রমণ করতে চায়। তাঁর জীবনের প্রয়োজনীয়তা এখন তাই অপরিমেয়। সব জিজ্ঞাসার উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে না, সব কিছু পরখ করার সুযোগ কখনোই হবে না। কিন্তু সে সব প্রচেষ্টায় নিমগ্ন হতে কোন বাধা নেই। একজন শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ সে-চেষ্টাই করবেন। সুতরাং অভিধানের প্রয়োজন তাঁর কাছে অতীতে যেমন কমেনি, বর্তমানেও তা নিঃশেষিত হয়নি, এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে অভিধান

রচনার ক্ষেত্রেও তাই নতুন পালাবদল ঘটবে, সূচিত হবে নবতর মাত্রা। বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব অভিধান প্রণীত হচ্ছে ভবিষ্যতে সে-প্রবাহ আরো বৈচিত্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। এখন কম্পিউটার অভিধান রয়েছে, অচিরেই হয়তো আমরা পাবো ইন্টারনেট অভিধান। তথ্য-প্রযুক্তিতে বিপ্লব এনেছে অপট্রিক্স ফাইবার প্রযুক্তি। এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সে-দিন হয়তো আর দূরে নেই যেদিন আমাদের হাতের কাছেই থাকবে জ্ঞানের ভান্ডার, অপ্টিক্স ফাইভার প্রযুক্তির সব খবর, এ বিষয় তথ্য ও তত্ত্বের উল্লেখ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ অভিধান।

বস্তুত, অভিধান এখন নির্বিশেষ শিক্ষিত মানুষের নিত্য দিনের সঙ্গী। এখন অভিধান-বিমুখ হওয়ার অর্থ সমস্ত পরিবর্তন, উৎকর্ষ, অগ্রগতি ও প্রযুক্তিকে অস্বীকার করে পেছনে, মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরে যাওয়া কিংবা স্বেচ্ছা-নির্বাসিত সেই জগতে বাস করা যেখানে বর্তমান দুনিয়ার কোন খবর পৌঁছায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অভিধানের প্রয়োজনীয়তা বলতে কী বোঝেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অভিধান কাকে বলে?

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলি তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

বাংলা অভিধানের ব্যবহার রীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- *অভিধানের ব্যবহার রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *যে কোন অভিধান সহজে ব্যবহার করতে পারবেন।*

অভিধান কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা-ই হলো অভিধানের ব্যবহার রীতি। এ ক্ষেত্রে দুটি রীতির উলে-খ চলে। প্রথমটিকে ক্ল্যাসিক্যাল; আর দ্বিতীয়টিকে ইমেপ্রেশনিস্টিক বিশেষ রীতি বলা যায়।

অভিধান কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা-ই হলো অভিধানের ব্যবহার রীতি। এ ক্ষেত্রে দুটি রীতির উল্লেখ চলে। প্রথমটিকে বলা যায় ক্ল্যাসিক্যাল বা নির্বিশেষ রীতি। দেখা যায়, সব অভিধানের একটি সাধারণ ব্যবহার রীতি রয়েছে। যে-ভাষায় অভিধান রচিত হয়েছে সেই ভাষার বর্ণমালার ক্রম অনুসারেই তা রচিত হয়। অর্থাৎ, অভিধানের বিষয় কিংবা শব্দগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের ক্রম অনুসারে সজ্জিত থাকে। এ রীতির সুবিধা এই যে, এতে সহজে পাঠক বা ব্যবহারকারী তার শব্দ বা বিষয় খুঁজে পান। বাংলা ভাষার অভিধানগুলিতে আমরা দেখি যে, বাংলা বর্ণমালার ক্রম অনুসারে এগুলিতে শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা বর্ণমালায় প্রথমে আছে স্বরবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় স্বরের ক্রম হচ্ছে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। অনুস্বর ও বিসর্গ দিয়ে কোন বাংলা শব্দ পরে আছে অনুস্বার [ং] ও বিসর্গ [ঃ]। এর পর আছে ব্যঞ্জন বর্ণযুক্ত শব্দগুলি। বাংলা ব্যঞ্জনের যে ক্রম বাংলা অভিধানগুলিতে অনুসরিত হয় তা হলো ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ। ড়, ঢ় দিয়ে কোন বাংলা শব্দ শুরু হয় না। ফলে অনুস্বার ও বিসর্গের মতো এ দুই বর্ণের অন্তর্ভুক্তিযুক্ত শব্দ অভিধানে নেই। বাংলা স্বরের মৌখিক ও আনুনাসিক দুই রূপই আছে। এ ক্ষেত্রেও তাই স্বরের পরেই তার অনুনাসিক রূপ দেখানো হয়েছে। যেমন; কাচা, কাঁচা।

অভিধানে শব্দগুলি অন্তর্ভুক্তির পরই এগুলির অর্থ দেওয়া থাকে। এ পর্যায়ে একই অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দগুলিই গ্রহণ করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে সমনাম (synonym) শব্দগুলি, বাগবিধি, প্রবাদ-প্রবচন এবং বিভিন্ন লেখা থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে শব্দের অর্থ প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় রীতিটিকে বলা যায় ইমেপ্রেশনিস্টিক বা বিশেষ রীতি। এক হিসেবে প্রতিটি অভিধানই স্বতন্ত্র। এমনকি একই বিষয়ে একাধিক অভিধান রচিত হলেও সে-সব অভিধানের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। অভিধান প্রণেতা বা সংকলকের অভিপ্রায়ই এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে ক্রিয়াশীল। সুতরাং এ রীতির বাস্তব পরিচয় গ্রহণ করতে হলে ফিরে যেতে হয় প্রণেতা বা সংকলকের সাক্ষ্যে। প্রতিটি অভিধানেই একটি ভূমিকা বা মুখবন্ধ থাকে। কখনো অংশটি অভিধানের প্রথমে স্থান পায়, কখনো আবার তা থাকে অভিধানের শেষে। বস্তুত, এ অংশেই নির্দিষ্ট অভিধানটির ব্যবহার রীতির স্বাতন্ত্র্যের ইংগিত থাকে। উদাহরণ হিসেবে আমরা রাজশেখর বাসুর 'চলন্তিকা' (১৩৮৯)-র ভূমিকা অংশের উল্লেখ করতে পারি। এ অভিধানের রচনা-রীতির স্বাতন্ত্র্য এ অংশেই উল্লিখিত হয়েছে। অভিধানটিকে সংকলন বর্ণনানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছেন। কিন্তু অন্যত্র এর আভ্যন্তর পরিকল্পনায় তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন। এ অভিধানে সংকলক ব্যবহারীদের উদ্দেশ্যে অভিধানটির স্বাতন্ত্র্যের কিছু দিক তুলে ধরেছেন। পাঠককে সেগুলি স্মরণে রেখে অভিধানটির ব্যবহার করতে হবে। আমরা নির্বাচিত কয়েকটি দিক এখন উদ্ধৃত ও আলোচনা করছি।

১. বানান

এ অভিধানে মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে। একই শব্দের একাধিক বানান থাকলে প্রচলন অনুযায়ী সেগুলি পরপর দেওয়া হয়েছে। একই শব্দের সাধু ও চলিত রূপ থাকলে দুটি রূপ অবলিক চিহ্ন (/) দিয়ে সাধু রূপ দেখানো হয়েছে। যেমন; চিড়া/চিড়ে; 'ঝিঙ্গা/ঝিঙে' ইত্যাদি।

২. শব্দের অন্তর্ভুক্তি

উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করে সমস্ত শব্দকে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অসংস্কৃত শব্দের পর [অথবা [] চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দগুলির জন্যে কোন চিহ্ন নেই। ফলে পাঠক সহজে শব্দগুলি চিনতে পারবেন। যেমন; 'দুই] দ্বি. অঙ্ক। উভয়

(-সমান')।....দুই/দু]।

৩. শব্দার্থ নির্দেশ

অভিধানের শব্দগুলির অর্থ বোঝানোর জন্যে সেগুলিকে প্রচলন অনুসারে পরপর সাজানো হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাবে। অর্থ ও সমনাম (synonym) কমা চিহ্নের [,] দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। অর্থকে বিশদ করার জন্যে অনেক স্থলে শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যে-সব সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ মূল থেকেই জানা যায় সেগুলির অর্থ এ অভিধানে নেই। যেমন; অগ্নিতাপ, অগোপন ইত্যাদি।

৪. পদনাম (Parts of Speech)

প্রতিটি শব্দের পদনাম অভিধানে দেওয়া হয়নি। যেসব শব্দের পদনাম মূল থেকে জানা যায় না, কেবল সেগুলির পদনাম দেওয়া হয়েছে। যেমন; 'নিষাদ–প্রাচীন বন্যজাতি বিঃ ব্যাধ'।

৫. ক্রিয়ারূপ

ক্রিয়ার সমস্ত রূপ অভিধানে দেখানো প্রয়োজন। কিন্তু বাংলা ভাষায় এমন একটি অভিধানও নেই যেখানে সমস্ত বাংলা ক্রিয়ার রূপ দেওয়া হয়েছে। সংকলকও তাঁর অপারগতা প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি অভিধানের শেষে পরিশিষ্ট অংশে বাংলা ক্রিয়ারূপ দেখিয়েছেন।

৬. বিশেষ্য ও সর্বনাম

বাংলা বিশেষ্য পদের বিভক্তি কম কিন্তু সেগুলির প্রয়োগ বিধি জটিল বলে অভিধানের পরিশিষ্টে শব্দবিভক্তি প্রকরণে সংক্ষেপে নিয়ম নির্দেশ করেছেন। সর্বনাম প্রকরণে সব সর্বনামের সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছে। নিচে উদাহরণ দেওয়া হলো:

সর্বনামের রূপ

সাধু রূপ		চলিত রূপ	
তিনি	তাঁহারা	তিনি	তাঁরা
তাঁহাকে	তাঁহাদিগকে	তাঁরা	তাঁদের
তাঁহারা	তাঁহারদিগের,-দের	তাঁর	তাঁদের
তাহাতে	–	তাতে	–

অভিধানটিতে অনুসৃত এ সব রীতি-পদ্ধতি পাঠক অনুসরণ করলে তিনি সহজে অভিধানটি ব্যবহার করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অভিধানের ব্যবহার রীতি বলতে কী বোঝেন?

২. একটি অভিধান কীভাবে ব্যবহার করবেন? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান কে রচনা করেন?

২. ইউরোপে কখন প্রথম অভিধান রচিত হয়? অভিধানটির নাম লিখুন।

৩. বাংলা ভাষার প্রথম অভিধানের প্রকাশক ও প্রকাশস্থলের পরিচয় দিন।

৪. বাংলা ভাষায় প্রথম উচ্চারণ অভিধান কে রচনা করেন? অভিধানটির নাম লিখুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সাহায্য নিয়ে উত্তরগুলি তৈরি করুন।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

৬

সাধারণ বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। তাই ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনের সহজাত বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা সম্ভব। ভাষা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব। ভাষাতত্ত্ব হচ্ছে ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মতো ভাষা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করা হয়। যথা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সূত্র প্রদান।

প্রথাগত ব্যাকরণ সুদীর্ঘকাল ধরে ভাষা বিশ্লেষণ করে আসছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) শব্দটির উদ্ভব ঘটে। ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় অভিন্ন; এ অভিন্ন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভাষা। ভাষাতত্ত্ব ভাষা সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে। ধ্বনি, রূপমূল, বাক্য ও অর্থ– এ চারটি স্তর নিয়ে ভাষা সংগঠন। ভাষাতত্ত্ব ভাষা সংগঠনের এসব স্তর নিয়ে আলোচনা করে। এ ইউনিটে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ ১. ভাষাতত্ত্ব : সংজ্ঞার্থ ও শ্রেণীকরণ
- পাঠ ২. ধ্বনিতত্ত্ব
- পাঠ ৩. রূপতত্ত্ব
- পাঠ ৪. বাক্যতত্ত্ব
- পাঠ ৫. অর্থতত্ত্ব ও অর্থ পরিবর্তন
- পাঠ ৬. ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণ

পাঠ - ১

ভাষাতত্ত্ব: সংজ্ঞার্থ ও শ্রেণীকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- *ভাষাতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিতে পারবেন।*
- *ভাষাতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।*
- *ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।*
- *ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।*

'লিঙ্গুয়া' (Lingua) এবং 'স্টিকস্' (istics) এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'লিঙ্গুয়িস্টিকস্' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'লিঙ্গুয়া' এবং 'স্টিকস্' শব্দ দুটি লাতিন ভাষা থেকে এসেছে। 'লিঙ্গুয়া' অর্থ জিহ্বা এবং 'স্টিক্স' অর্থ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। তাই ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ভাষার বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনকে ভাষাতত্ত্ব বলা যায়। ভাষাতত্ত্ব সুনির্দিষ্ট কোন ভাষা সংক্রান্ত বিজ্ঞান নয়। ভাষাতত্ত্বে সকল ভাষাকে মানবভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন, সংগঠন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা হয়।

ভাষাতত্ত্ব সুনির্দিষ্ট কোন ভাষা সংক্রান্ত বিজ্ঞান নয়। ভাষাতত্ত্বে সকল ভাষাকে মানবভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন, সংগঠন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা হয়।

বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন সময়ে ভাষাতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখন আমরা সেসব সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে দেখব। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leocnard Bloomfied) ভাষাতত্ত্বকে 'the study of language' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বে ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ডেভিড ক্রিস্টাল (David Crystal) ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে 'the scientific study of language; অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভাষা আলোচিত হয়। জন লায়ন্স (John lyons) ভাষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, Linguistics may be defined as the scientic study of langua ... ... by the scientific study of language is meant its investigation by means of controlled and empirically verfiable observations and with reference to some general theory of language structure. অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা বিশ্লেষণ করা হয় এবং ভাষা-সংগঠন সম্পর্কিত সূত্র প্রদান করাই ভাষাতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক মুনীর চৌধুরীর মতে ভাষাতত্ত্বের কাজ ভাষার অঙ্গব্যবচ্ছেদে, ভাষার অবয়ব সংস্থাপনের শৃঙ্খলা আবিষ্কারে, তার ব্যবহার প্রণালী বর্ণনায়। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক ভাষা সংগঠনের বর্ণনা, বিশ্লেষণ, সূত্র ও প্রায়োগিক দিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন।

উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভাষার একটি সংগঠন আছে এবং ভাষা সংগঠন সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব (Theory) ব্যবহার করে সুনিয়ন্ত্রিত ও তথ্য যাচাই-সম্ভব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভাষা সংগঠন নিয়ে গবেষণা করা হলে তাকে ভাষাতত্ত্ব বলে। প্রতিটি ভাষার একটি সংগঠন আছে। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এবং অর্থ নিয়ে ভাষা সংগঠন গড়ে ওঠে। ভাষার যেমন সংগঠন আছে তেমনি কিছু নিয়ম-রীতি আছে। ভাষার ধ্বনি সংগঠনে কিছু নিয়ম আছে, শব্দ সংগঠনে কিছু নিয়ম আছে, বাক্য সংগঠনে কিছু নিয়ম আছে, অর্থ সংগঠনে নিয়ম আছে। বাংলা ভাষার শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে প্র, পরা, পরি, অপ ইত্যাদি প্রত্যয় (affix) সমূহ শব্দের আগে বসে। যেমন, প্র+ভাত = প্রভাত, পরা+জয় = পরাজয়, পরি+বেশ = পরিবেশ, অপ+প্রচার = অপপ্রচার। এসব প্রত্যয় কখনো শব্দের শেষে বসে না। এটি বাংলা ভাষার শব্দ-সংগঠনের একটি নিয়ম। প্রতিটি ভাষা কতগুলি নিয়মের সমষ্টি। ভাষাতত্ত্ব ভাষার এ নিয়ম-শৃঙ্খলা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে।

ভাষার অনেক বিধা বা প্রকার (Aspects) রয়েছে। ভাষার ধ্বনিগত রূপ আছে, শব্দগত রূপ আছে, বাক্যগত রূপ আছে, অর্থগত রূপ আছে, সমাজতান্ত্রিক রূপ আছে, মনস্তাত্ত্বিক রূপ আছে। যে ব্যক্তি ভাষার সকল বিধার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন তাঁকে ভাষাতাত্ত্বিক (Linguist) বলা হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি একাধিক ভাষা জানেন তাঁকে ভাষাবিদ (Polyglot) বলা হয়। ভাষাতাত্ত্বিক ভাষা সংগঠন সম্পর্কে অভিজ্ঞ আর ভাষাবিদ কেবলমাত্র বলা (Speaking), শোনা (Listening), পড়া (reading), লেখা (writing)– ভাষার এ চারটি দক্ষতা অর্জন করেন। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাবিদ শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ভাষা সংগঠন সম্পর্কে ভাষাবিদের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকে না। তবে ভাষাবিদ একইসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক হলে ভাষা সংগঠন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকবে। একজন ভাষাতাত্ত্বিক ভাষাবিদ হতে পারেন, নাও হতে পারেন। অন্যদিকে একজন ভাষাবিদ ভাষাতাত্ত্বিক হতে পারেন, নাও হতে পারেন।

ভাষার অনেক বিধা বা প্রকার রয়েছে। ভাষার ধ্বনিগত রূপ আছে, শব্দগত রূপ আছে, বাক্যগত রূপ আছে, অর্থগত রূপ আছে, সমাজতান্ত্রিক রূপ আছে, মনস্তাত্ত্বিক রূপ আছে। যে ব্যক্তি ভাষার সকল বিধার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন তঁকে ভাষাতাত্ত্বিক বলা হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি একাধিক ভাষা জানেন তাঁকে ভাষাবিদ বলা হয়।

পরিধি

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন এবারে আমরা ভাষাতত্ত্বের পরিধি নিয়ে আলোচনা করি। ভাষা কি, ভাষা কিভাবে কাজ করে, ভাষার মধ্যকার সাদৃস্য-বৈসাদৃশ্য, ভাষা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও সূত্র, মানুষের ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া, ভাষার লিপি প্রবর্তনের কারণ ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করে। ভাষাতত্ত্বের এ কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করলে আমরা ভাষাতত্ত্বের নিম্নলিখিত পরিধি লক্ষ করি:

- ভাষাতত্ত্ব ভাষার ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ একটি ভাষায় কি কি ধ্বনি আছে তা আলোচনা করে। সেই সঙ্গে ধ্বনি উৎপাদনের কৌশল এবং ধ্বনি উৎপাদনে সাহায্যকারী বাকপ্রত্যঙ্গের গঠনও ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- ভাষাতত্ত্ব ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ এবং শব্দের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। শব্দের আলোচনায় শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্রতর 'রূপমূল' নামক ভাষিক উপাদান (Linguistic element) নিয়েও আলোচনা করা হয়।
- প্রতিটি ভাষায় অসংখ্য বাক্য রয়েছে। এসব বাক্যের প্রকৃতি ও গঠন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্য বিদ্যমান। বাক্যের প্রকৃতি ও গঠন প্রক্রিয়া ভাষাতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।
- অর্থ (meaning) ভাষার প্রাণ। অর্থ কি এবং ভাষার অর্থ কিভাবে প্রকাশিত হয় তা ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে।
- ভাষা পরিবর্তনশীল। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সংগঠনে পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে সুদীর্ঘ সময় পর এ পরিবর্তন ধরা পড়ে। ভাষা কেন পরিবর্তিত হয় এবং কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করে। এ ছাড়া ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশও ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- শুধুমাত্র কালের পরিবর্তনের কারণে ভাষার পরিবর্তন ঘটে না। মানুষ অনেক সময় সচেতনভাবে ভাষার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, বর্ণমালা সংস্কার, বানান সংস্কার, রাষ্ট্রভাষা নির্বাচন, শিক্ষার ভাষা নির্বাচন, প্রশাসনের ভাষা নির্বাচন বা পুনর্নির্বাচন করা ইত্যাদি। ভাষাভাষী কর্তৃক সচেতনভাবে পরিবর্তিত ভাষা পরিবর্তনও ভাষাতত্ত্বের আওতাভুক্ত বিষয়।
- সাধারণত একটি ভাষার একাধিক উপভাষিক বৈচিত্র্য থাকে। ভাষার এসব উপভাষা নিয়ে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে।
- ভাষা সংগঠনের উপর মানুষের মন, মস্তিষ্ক, দর্শন ও সমাজের কোন প্রভাব আছে কিনা, থাকলে তার স্বরূপ কিরূপ তা ভাষাতত্ত্ব জানতে চেষ্টা করে।

ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস

ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। প্রায় ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীনকালে প্রধানত ভারত, গ্রিস ও রোমে ভাষাতত্ত্বের চর্চা হয়েছে।

ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। প্রায় ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীনকালে প্রধানত ভারত, গ্রিস ও রোমে ভাষাতত্ত্বের চর্চা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের কয়েকজন বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক হলেন সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল, প্রোতাগোরাস, দিওনীসিউস থ্রাকস, আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস প্রমুখ। রোমের ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মার্কুস তেরেনতিউস ভারবো, প্রিসকিআন, দোনাতুস প্রমুখ। প্রাচীনকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষাতাত্ত্বিক হলেন পাণিনি। পাণিনি ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কালজয়ী তাঁর এ বইটি আধুনিক ভাষাতত্ত্ব চর্চাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ভারতে পাণিনি ছাড়াও যাস্ক, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রমুখ পন্ডিতগণ ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক সভায় বৃটিশ পন্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এ বক্তৃতায় সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, কেলটিক ও জার্মানীয় ভাষাসমূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। সেই সঙ্গে তিনি অনুমান করেন যে, এ ভাষাসমূহ কোন একটি অভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার পর ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Historical & comparative Linguistics) এর ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে পুরো উনিশ শতক ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যাঁরা ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাসমুস রাস্ক, ইয়াকব গ্রিম, কার্ল ভারনার, হেরমান গ্রাসমান, ভিলহেলম ফন হুমবোল্ডট, আউগুস্ট ফন শ্লেগেল প্রমুখ।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভাষাতত্ত্ব চর্চা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসে। সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফেদিনঁ দ্য সোস্যুরকে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভাষাতত্ত্ব চর্চা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসে। সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফেদিনঁ দ্য সোস্যুরকে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সোস্যুর সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ (structural approach) থেকে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এজন্য তিনি সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবেও পরিচিত। পরবর্তীকালে যাঁরা সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ব চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্লুমফিল্ড রচিত 'Language' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিক হচ্ছেন এডওয়ার্ড সাপির, ইউজিন নাইডা, জেলিগ হ্যারিস, চালর্স হকেট প্রমুখ।

আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিক আবরাম নোয়াম চমস্কি 'Syntatic structures' নামে একটি বই রচনা করেন। বইটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ বইটি ভাষাতত্ত্ব চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এ বইয়ের মাধ্যমে চমস্কি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতত্ত্ব (Transformational Generative Linguistics)- এর প্রস্তাব পেশ করেন।

শ্রেণীকরণ

আমরা জেনেছি ভাষাতত্ত্বে ভাষা সংগঠন এবং ভাষা সংগঠনের উপর মানুষের মন, সমাজ, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভাষাতত্ত্ব চর্চার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা চর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যুক্ত হয়েছে। এসব কারণে ভাষাতত্ত্ব বর্তমানে নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত এক সুবিশাল জ্ঞানশাখায় পরিণত হয়েছে। এবারে ভাষাতত্ত্বের এসব শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথাগত ব্যাকরণ (Traditional Grammar)

প্রাক-আধুনিক ভাষা-চর্চা কিংবা প্রাচীনকালের ভাষাচর্চাকে প্রথাগত ব্যাকরণ নামে অভিহিত করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণ মূলত গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা চর্চাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ভাষিক শুদ্ধতা (Linguistic purism)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুশাসিক ব্যাকরণ (Prescriptive Grammar)। এখানে ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কতগুলো সূত্র

প্রদান করা হয়। কিন্তু এসব সূত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া হয় না। প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে শব্দ এবং ভাষার লিখিত রূপের উপর প্রাধান্য প্রদান করা হয়।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব (Historical Linguistics)

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব–কালের বিবর্তনে ভাষা সংগঠনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, সে পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা, ভাষা বিবর্তনের কারণ ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করা এবং ভাষার শ্রেণীকরণ করা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের কাজ। এসব ছাড়াও ভাষার ইতিহাস রচনায় কিংবা পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব সাহায্য করে।

ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা, ভাষা বিবর্তনের কারণ ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করা এবং ভাষার শ্রেণীকরণ করা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের কাজ।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Linguistics)

ভাষার তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে দুই বা ততোধিক ভাষা-সংগঠনের মধ্যে তুলনা করা হয়। যেমন বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষার শব্দ-গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হলে সেটি ভাষার তুলনামূলক আলোচনা হবে। এ ধরনের তুলনার মাধ্যমে তুলনাকৃত ভাষাসমূহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করা হয়। যেমন, মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সঙ্গে আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা। একাধিক ভাষার মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ব (Structural Linguistics)

সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বে ভাষাকে ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্য সম্বলিত একটি সংগঠন (Structure) মনে করা হয়। এ ভাষাতত্ত্বে ভাষা সংগঠনের আলোচনায় অর্থকে সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ব আচরণবাদী (Behaviourism) দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভাষা বিশ্লেষণ করে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব এবং বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ ভাষাতত্ত্ব সারা বিশ্বে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়। সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বে ভাষার মৌখিক রূপ গুরুত্ব লাভ করে।

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতত্ত্ব (Transformational Generative Grammar) আবরাম নোয়াম চমস্কি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতত্ত্বের জনক। চমস্কি এ ভাষাতত্ত্বে সকল ভাষার সাদৃস্যমূলক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং পৃথিবীর সকল ভাষা বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতত্ত্ব ভাষার আলোচনায় অর্থকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতত্ত্বের প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষ কিভাবে ভাষা সৃষ্টি করে, সে সূত্র আবিষ্কার করা।

তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব এবং ফলিত ভাষাতত্ত্ব (Theoretical Linguistics & Applied Linguistics)

তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব পর্যবেক্ষণপূর্বক ভাষা-সংগঠন এবং ভাষার কার্যাবলী সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব (Theory) প্রদান করে। কিন্তু এ ভাষাতত্ত্বে এসব তত্ত্বসমূহের বাস্তব প্রয়োগগত দিক বিবেচনা করা হয় না।
অন্যদিকে ফলিত ভাষাতত্ত্বে ভাষা সংগঠন ও ভাষার কার্যাবলী সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহের বাস্তব প্রয়োগগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বে আলোচিত তত্ত্বসমূহ বাস্তবজীবনে কিভাবে, কোথায় প্রয়োগ করা যায় তা ফলিত ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করে। ফলিত ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হচ্ছে, ভাষা শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, অনুবাদ এবং ভাষা পরিকল্পনা।

সামষ্টিক ভাষাতত্ত্ব এবং ব্যষ্টিক ভাষাতত্ত্ব (Macrolinguistics & Microlinguistics linguistics)

আলোচনার পরিধির ভিত্তিতে ভাষাতত্ত্বকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। এ দুটি শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে সামষ্টিক ভাষাতত্ত্ব এবং ব্যস্টিক ভাষাতত্ত্ব। সামষ্টিক ভাষাতত্ত্বে সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা অর্জনের মনস্তাত্ত্বিক ও স্নায়ুবিক প্রক্রিয়া প্রভৃতির আলোকে ভাষা বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়। সমাজ ও জীবনের সঙ্গে ভাষা অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। তাই সমাজ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাষার আলোচনা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ কারণে সামষ্টিক ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের আন্তর্বিদ্যামূলক (Inter-disciplinary) বিভিন্ন শাখার

উদ্ভব ঘটেছে। যেমন, সমাজভাষাতত্ত্ব (Sociolinguistics), মনোভাষাতত্ত্ব (psycholinguistics), শৈলীতত্ত্ব (Stylistics) ইত্যাদি।

ব্যষ্টিক ভাষাতত্ত্বে শুধুমাত্র ভাষা-সংগঠনের আলোকে ভাষা আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ধ্বনি শব্দ বা রূপমূল, বাক্য, অর্থ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভাষাতত্ত্ব কাকে বলে? ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ভাষাতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করুন।
২। ভাষাতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

নির্দেশ	উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন

পাঠ - ২

ধ্বনিতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- *ধ্বনিতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিতে পারবেন।*
- *ধ্বনিতত্ত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।*
- *ধ্বনিতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।*
- *প্রমিত কথ্য বাংলার ধ্বনিমূলসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।*

ধ্বনি ভাষা সংগঠনের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক।

ইংরেজি ভাষার Phonology শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় ধ্বনিতত্ত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ধ্বনি ভাষা সংগঠনের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক। ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধ্বনিতত্ত্বে যে কোন ধ্বনি (Sound) নিয়ে আলোচনা করা হয় না। শুধুমাত্র মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি (Phone) নিয়ে আলোচনা করা হয়। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'The study of significant speech sounds is phonology' অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ বাকধ্বনি নিয়ে আলোচনা করে। ডেভিড ক্রিস্টালের মতে, ধ্বনিতত্ত্ব হচ্ছে 'The branch of linguistics which studies the sound system of language' অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। জর্জ ইউল (George Yule)-এর মতে,'phonology is essentially the description of the systems and patterns of speech sounds in a language. It is, in effect, based on a theory of what every speaker of a language unconsciously knows about the sound patterns of the language. অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব শুধুমাত্র ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে না, শব্দে বা বাক্যে তথা ভাষায় ধ্বনির বিন্যাস নিয়েও আলোচনা করে।

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভাষার একটি ধ্বনি সংগঠন আছে এবং এ ধ্বনি সংগঠনে কতগুলো ধ্বনি আছে। ভাষার ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। যেমন বাংলা ভাষার প ধ্বনিটি উভ ওষ্ঠ্য (Bilabial) এবং স্পৃষ্ট (Stop) ধ্বনি। এ ধ্বনি উচ্চারণে দুটি ঠোঁট ব্যবহৃত হয় এবং ঠোঁট দুটি পরস্পরকে স্পর্শ করে। এ ছাড়াও এ ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুস ফুস তাড়িত বাতাস মুখবিবরে কিছুক্ষণের জন্যে রুদ্ধ হয় এবং পরমুহূর্তে বাতাস মুখবিবর থেকে বেরিয়ে যায়। এটি বাংলা ভাষার ধ্বনি সংগঠনের একটি নিয়ম। এ রকম বহু নিয়মের সমষ্টি হচ্ছে প্রতিটি ভাষার ধ্বনি সংগঠন। ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি সংগঠন এবং ধ্বনি সংগঠনের নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিধি

ধ্বনি কি, ধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয় এবং কোথায় উৎপন্ন হয়, ধ্বনি কিভাবে মানুষ শুনতে পারে এবং অনুধাবন করতে পারে, কিভাবে এবং কেন ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহ পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন্নতর হয় ইত্যাদি নিয়ে ধ্বনিতত্ত্ব কাজ করে। ধ্বনিতত্ত্বের এ কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে ধ্বনিতত্ত্বের পরিধি হিসেবে উল্লেখ করা যায়ঃ

- ধ্বনিতত্ত্ব বাক্প্রত্যঙ্গ (Organs of Speech), কান (Ear) এবং মস্তিষ্ক (Brain)-এর গঠন প্রক্রিয়া এবং ধ্বনি উৎপাদনে এদের ভূমিকা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে।

- ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, অর্ধস্বর, দ্বিস্বর, ঝোঁক, মীড়, স্বরতরঙ্গ ইত্যাদি নির্ণয় করে এবং এদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে।
- ধ্বনি উৎপাদনের ফুসফুসতাড়িত বাতাস কিভাবে, কোন্ প্রক্রিয়ায় প্রবাহিত হয় তা বর্ণনা করে।
- ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিমূল (Phoneme), সহধ্বনি (Allophone), স্বতো বিভেদ (Free variation) নির্ণয় করে এবং এদের প্রকৃতি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে।

প্রকারভেদ

ধ্বনিতত্ত্বের দুটি পর্যায় বা ভাগ রয়েছে। যথাঃ ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) এবং ধ্বনিবিচার (Phonemics)।

ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics): ধ্বনিবিজ্ঞানে ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহ কোন্ কোন্ বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত হয় এবং ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস কিভাবে প্রবাহিত হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানে বাক-প্রতঙ্গ এবং বায়ু প্রবাহের কৌশল দ্বারা ভাষার ধ্বনিসমূহ সনাক্ত করা হয় এবং সনাক্তকৃত ধ্বনিসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়। এভাবে ভাষার স্বরধ্বনি (vowel), ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant), অর্ধস্বর (semivowel), যৌগিকস্বর বা দ্বিস্বর (Diphthong) এবং অতিভাষিক বৈশিষ্ট্য (para linguistic features), নির্ণয় করা হয়। ঝোঁক (stress), মীড় (pitch), স্বরতরঙ্গ (intonation) ইত্যাদি অবিভাজ্য ভাষিক উপাদানসমূহকে অতিভাষিক বৈশিষ্ট্য বলা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা:

ধ্বনিতত্ত্বের দুটি পর্যায় বা ভাগ রয়েছে। যথা ধ্বনিবিজ্ঞান এবং ধ্বনিবিচার।

উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Articulatory phonetics), শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Acoustic phonetics) এবং শ্রবণগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Auditory phonetics)। ধ্বনির উচ্চারণমূলক শ্রুতিগত কিংবা শ্রবণগত বিশ্লেষণে কোন্ ধরনের যন্ত্রপাতি (যথা, প্যালেটোগ্রাফ, কিমোগ্রাফ, স্পেক্টোগ্রাফ, ওসিলোমিঙ্ক ইত্যাদি) ব্যবহার করা হলে তাকে যান্ত্রিক ধ্বনিবিজ্ঞান (Instrumental phonetics) অভিহিত করা হয়। যান্ত্রিক ধ্বনিবিজ্ঞানকে নিরীক্ষামূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Experimental phonetics) নামেও অভিহিত করা হয়।

উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Articulatory phonetics): ধ্বনিবিজ্ঞানের যে শাখায় বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে ধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয় তা আলোচনা করা হয় তাকে উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান বলে। উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানে উচ্চারণ স্থান (point of Articulation) অনুযায়ী ধ্বনিসমূহ বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়। যেমন বাংলা ভাষার ত ধ্বনিটি উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী দন্ত্য ধ্বনি এবং উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী অঘোষ, অল্পপ্রাণ এবং স্পষ্ট ধ্বনি। বাকপ্রত্যঙ্গের গঠন এবং ধ্বনি সৃষ্টিতে বাকপ্রত্যঙ্গের ভূমিকা উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Acoustic phonetics): ধ্বনি উৎপাদিত হবার পর তা একটি মাধ্যম (Transmission)-এর সাহায্যে শ্রোতার কানে পৌঁছায়। ধ্বনিবিজ্ঞানের যে শাখায় ধ্বনি প্রবাহিত হবার মাধ্যম নিয়ে কাজ করা হয়, তাকে শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান বলে। সাধারণত বাতাস ধ্বনি প্রবাহিত হবার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাতাস ছাড়া গ্যাস, পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি ধ্বনি তথা ভাষা প্রবাহের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। বাক ধ্বনি উচ্চারিত হবার পর তা বাতাস তথা মাধ্যম এ মৃদু শব্দ **তরঙ্গ** (sound waves) সৃষ্টি করে। এ শব্দতরঙ্গের পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান

ক্যাথড রে ওসিলোস্কোপ, ওসিলোমিস্ক, স্পেক্টোগ্রাফ, ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করে। শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞানে শব্দতরঙ্গের পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাকধ্বনি বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়।

শ্রবণগত ধ্বনিবিজ্ঞান (Auditory phonetics): শ্রবণগত ধ্বনিবিজ্ঞান ধ্বনি উৎপন্ন হবার পর তা মানুষের কান দিয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় স্নায়ু (Auditory nerve) -এর সাহায্যে কিভাবে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং কিভাবে মানুষ ধ্বনি উপলব্ধি করতে পারে তা আলোচনা করে। অর্থাৎ ধ্বনির শ্রবণগত ও অনুধাবনগত আলোচনাকে শ্রবণগত ধ্বনিবিজ্ঞান বলে। যেমন বাংলা ভাষার প এবং ফ ধ্বনি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি, অঘোষ ধ্বনি, উভ ওষ্ঠ্য ধ্বনি এবং স্পৃষ্ট ধ্বনি। এ দুটি ধ্বনির মধ্যে সব দিক থেকে মিল রয়েছে। এ দুটি ধ্বনির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি প্রাণতার পার্থক্য। প ধ্বনিটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি, ফ ধ্বনিটি মহাপ্রাণ ধ্বনি। পুল ফুল শব্দ দুটি উচ্চারণের পর একজন শ্রোতা কিভাবে প এবং ফ ধ্বনি দুটির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করেন এবং পার্থক্য নির্ণয় করেন তা শ্রবণগত ধ্বনিবিজ্ঞান নির্দেশ করে। কান ও মস্তিষ্কের গঠন এবং ধ্বনি তথা ভাষা উৎপাদনে এদের কার্যকারিতা শ্রবণগত ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

প্রতিটি ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের একটি মূলরূপ বা তাৎপর্যপূর্ণ রূপ থাকে। এ মূলরূপটিকে ধ্বনিমূল বলা হয়।

ধ্বনিবিচার (Phonemics): ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না। ধ্বনি উচ্চারিত হয় শব্দে, বাক্যে, তথা ভাষায়। তাই ধ্বনিতত্ত্বে শুধুমাত্র স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয় না। শব্দে, বাক্যে তথা ভাষায় ধ্বনির বিন্যাস নিয়েও আলোচনা করা হয়। স্বতন্ত্রভাবে ধ্বনিসমূহ যেভাবে উচ্চারিত হয়, সেই ধ্বনিসমূহ যখন শব্দে বা বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন ঠিক ঐভাবে উচ্চারিত হয় না। শব্দে বা বাক্যে ধ্বনির বৈশিষ্ট্যসমূহ কিছু ভিন্ন রূপ লাভ করে। তাছাড়া শব্দে ধ্বনিটি কোন অবস্থানে (আদি, মধ্য, অন্ত্য) ব্যবহৃত হচ্ছে তাও ধ্বনির উচ্চারণকে প্রভাবিত করে।

যথা-কাক, বকা, বক-এ তিনটি শব্দে ক ধ্বনিটির উচ্চারণ অভিন্ন নয় এবং এসব শব্দে উচ্চারিত ক ধ্বনির উচ্চারণসমূহ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত ক ধ্বনির মতো নয়। শব্দে অবস্থিত ধ্বনির অবস্থান ছাড়াও ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন উচ্চারণ অনেক সময় ধ্বনিকে উচ্চারণ বৈচিত্র্য দান করে। যেমন বাংলা ভাষার ফ ধ্বনিটি উভ ওষ্ঠ্য ধ্বনি (Bilabial) কিন্তু অনেক বাঙালির উচ্চারণে ধ্বনিটি দন্তৌষ্ঠ ধ্বনি (Labiodental) হিসেবে উচ্চারিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশি কিংবা অসচেতনতা এ ধরনের উচ্চারণের কারণ হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশির কারণে কিংবা শব্দে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য থাকলেও এসব উচ্চারণ-বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট একটি ধ্বনির বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যথা কাক, বকা, বক শব্দ তিনটির ক ধ্বনির উচ্চারণসমূহ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত জিহ্বামূলীয়, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, স্পৃষ্ট 'ক' নামক ধ্বনির মূলরূপকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়। প্রতিটি ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের একটি মূলরূপ বা তাৎপর্যপূর্ণ রূপ থাকে। এ মূলরূপটিকে ধ্বনিমূল (Phoneme) বলা হয়।

ধ্বনিমূল, সহধ্বনি এবং স্বতোবিভেদ নির্ণয়ে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধ্বনিমূলের কারণে শব্দের অর্থ বদলে যায়। কিন্তু সহধ্বনি ও স্বতোবিভেদের ক্ষেত্রে শব্দের অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ধ্বনিমূল, সহধ্বনি ও স্বতোবিভেদঃ ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক ড্যানিয়েল জোনস (Daniel Jones) ধ্বনিমূল সম্পর্কে বলেছেন, A phoneme is a family of sounds in a given language, অর্থাৎ ধ্বনিবিচারের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধ্বনিমূল (যদমভণবণ) নির্ণয় করা। ধ্বনিবিচারে ধ্বনিমূল ছাড়া সহধ্বনি (Allophone) এবং স্বতোবিভেদ (Free variation) নিয়েও আলোচনা করা হয়। আমরা জেনেছি একটি ধ্বনিমূলের সঙ্গে ঐ ধ্বনির অনেকগুলো উচ্চারণ বৈচিত্র্য থাকে। ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য যদি কোন অবস্থানগত শর্তের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে সেই উচ্চারণ বৈচিত্র্যকে সহধ্বনি বলে। অন্যদিকে যদি বক্তার অসচেতনতা বা খেয়াল-খুশির উপর উচ্চারণ বৈচিত্র্য নির্ভর করে, তবে তাকে সহধ্বনি বলে।

মনে রাখতে হবে ধ্বনিমূল, সহধ্বনি এবং স্বতো বিভেদ নির্ণয়ে অর্থ (meaning) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধ্বনিমূলের কারণে শব্দের অর্থ বদলে যায়। কিন্তু সহধ্বনি ও স্বতোবিভেদের ক্ষেত্রে শব্দের অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ধ্বনিমূলের উদাহরণ:

কাল = ক + আ + ল

খাল = খ + আ + ল

উপরের দুটি শব্দে ক এবং খ ধ্বনি দুটির কারণে শব্দদুটির অর্থ ভিন্ন হয়েছে। সুতরাং ক এবং খ দুটি ধ্বনিমূল।

সহধ্বনির উদাহরণ:

ণ

ন

ঞ

বাংলা ভাষার এ তিনটি ধ্বনি যখন শব্দে ব্যবহৃত হয় তখন এদের অবস্থান শর্তাধীন থাকে। যথা ণ ধ্বনিটি ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে বসে, ন ধ্বনিটি ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে বসে এবং ঞ ধ্বনিটি চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে বসে (কন্টক, ভন্ড, শান্ত, পান্থ, চঞ্চল, বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি শব্দ লক্ষ্য করুন)। এ ধ্বনিগুলো একটি অপরটির স্থানে বসলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হবে না।

স্বতোবিভেদের উদাহরণ:

ফুল = ফ(ph) – অঘোষ, মহাপ্রাণ, স্পৃষ্ট, উভওষ্ঠ্য
ফুল = ফ (f) – অঘোষ, মহাপ্রাণ, উষ্ম, দন্তৌষ্ঠ

বাংলা ভাষার 'ফুল' শব্দটির ফ ধ্বনিটি উপরে উল্লেখিত দুটি প্রক্রিয়ায় উচ্চারিত হলে তা শব্দটিকে দুটি অর্থ দান করবে না। অর্থাৎ সহধ্বনির অবস্থান শর্তাধীন আর স্বতোবিভেদ বক্তার খেয়ালের অধীন। তবে সহধ্বনি এবং স্বতোবিভেদ উভয়ই ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য।

ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics) : ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনির উচ্চারণ, শ্রুতি ও শ্রবণ বিচার করে ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, অর্ধস্বর, ঝোঁক ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। ধ্বনি বিচারে ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রাপ্ত ধ্বনিসমূহ থেকে ধ্বনিমূল নির্ণয় করা হয়। ধ্বনিমূল নির্ণয়ের সময় লক্ষ করা হয় ধ্বনিটি শব্দে কিভাবে, কোন অবস্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধ্বনিবিজ্ঞানে ভাষায় ব্যবহৃত সকল ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু ধ্বনিবিচারে ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনির মূলরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ধ্বনিবিচার ধ্বনিমূল নিয়ে আলোচনা করে।

ধ্বনিতত্ত্বের প্রকারভেদ নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হচ্ছেঃ

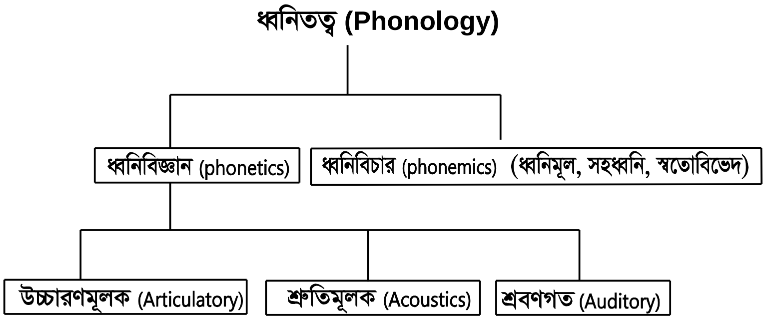

প্রমিত কথ্য বাংলার ধ্বনিমূল (phonemes of standard colloquial Bengali):

প্রমিত কথ্য বাংলায় মোট ৪৭ টি ধ্বনিমূল রয়েছে। এ ৪৭টি ধ্বনিমূলের মধ্যে ৭টি মৌখিক স্বরধ্বনি (Oral vowel), ৭টি আনুনাসিক স্বরধ্বনি (Nasalized vowel), ৪টি অর্ধস্বর (Semi vowel) এবং ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant)।

মৌখিক স্বরধ্বনিঃ

ই	এ	এ্যা	আ	অ	ও	উ
I	e	æ	a		o	u

উল্লেখ্য যে, বিশিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই ও’ (O) নামে আরো একটি স্বরধ্বনিকে ধ্বনিমূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রমিত কথ্য বাংলায় ধ্বনিমূল হিসেবে ৮টি স্বরধ্বনি রয়েছে।

অনুনাসিক স্বরধ্বনিঃ

ইঁ	এঁ	এ্যাঁ	আঁ	অঁ	ওঁ	উঁ
i	e	æ	a		o	u

অর্ধস্বরঃ

ই	এ	ও	উ
∧	∧	∧	∧
i	e	o	u
∧	∧	∧	∧

ব্যঞ্জনধ্বনিঃ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
k	kh	g	gh	G
চ	ছ	জ	ঝ	শ
c	ch	j	jh	s
ট	ঠ	ড	ঢ	ড়
t	th	d	dh	r
.	.	.	.	.

ত	থ	দ	ধ	ন	স	র	ল
t	th	d	dh	n	s	r	l

প	ফ	ব	ভ	ম
p	ph	b	bh	m

প্রমিত কথ্য বাংলার ধ্বনিমূল নির্দেশের জন্যে বাংলা বর্ণমালার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet) ব্যবহার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা এমন একটি বর্ণমালা যার সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন ভাষার যে কোন ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ধ্বনিতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করুন।

২. ধ্বনিতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৩. ধ্বনিমূল, সহধ্বনি ও স্বতোবিভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

নির্দেশ	উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

রূপতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি অনুশীলন করে আপনি-

- *রূপতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।*
- *রূপতত্ত্বের পরিধি সর্ম্পকে ধারণা দিতে পারবেন।*
- *রূপমূল ও রূপমূলের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।*
- *শব্দের প্রকারভেদ ও শব্দ গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।*

রূপতত্ত্ব (Morphology) ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর এবং শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্রতর ভাষিক একক (Linguistic element) রূপমূল (mopheme) এবং শব্দ (word) নিয়ে আলোচনা করে। ভাষাতাত্ত্বিক লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leonard Bloomfield) রূপতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন 'we may say that morphology includes the constructions of words and parts of words' অর্থাৎ রূপতত্ত্ব শব্দ এবং শব্দ গঠনকারী বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোচনা করে। পি. এইচ. ম্যাথিউস (P.H. Mathews)-এর মতে, Morphology, Therefore, is simply a term for that branch of linguistics which is concerned with the 'froms of words' in differrent uses and constructions. অর্থাৎ রূপতত্ত্ব ভাষাতত্ত্বের একটি শাখা এবং শব্দ গঠন সংক্রান্ত আলোচনা এ শাখার প্রধান আলোচ্য বিষয়। ফ্রাংক পামার (Frank palmer)-এর মতে, 'Morphology is essentially the grammar of words and deals with the forms of words' অর্থাৎ রূপতত্ত্ব হচ্ছে শব্দ গঠন প্রক্রিয়ার ব্যাকরণ।

উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি যে, ভাষাতত্ত্বের যে শাখায় শব্দ এবং শব্দ গঠনকারী বিভিন্ন উপাদান (প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন, কারক, কাল ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রূপতত্ত্ব বলে। রূপতত্ত্বে রূপমূলের আলোকে শব্দসংগঠন (word structure) আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, শব্দ ও রূপমূলের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। শব্দ একই সঙ্গে রূপমূল ও শব্দ। কিন্তু সকল রূপমূল শব্দ নয়। অর্থাৎ বদ্ধ রূপমূলসমূহ শব্দ নয়। যেমন, 'পাখি' এ ভাষিক সংগঠনটি একই সঙ্গে শব্দ এবং রূপমূল। কিন্তু -রা,-টি,-গুলো এসব ভাষিক সংগঠন শব্দ নয়, এগুলো রূপমূল। এগুলোকে বদ্ধ রূপমূল বলে। প্রথাগত ব্যাকরণের প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন, কারক, কাল ইত্যাদি ভাষিক এককসমূহ রূপতত্ত্বের আলোচনায় বদ্ধরূপমূল হিসেবে আলোচিত হয়।

শব্দ ও রূপমূলের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। শব্দ একই সঙ্গে রূপমূল ও শব্দ। কিন্তু সকল রূপমূল শব্দ নয়। অর্থাৎ বদ্ধ রূপমূলসমূহ শব্দ নয়। যেমন, 'পাখি' এ ভাষিক সংগঠনটি একই সঙ্গে শব্দ এবং রূপমূল। কিন্তু -রা,-টি,-গুলো এসব ভাষিক সংগঠন শব্দ নয়, এগুলো রূপমূল।

পরিধি

রূপতত্ত্বের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে সুশৃঙ্খলভাবে রূপমূল সম্পর্কে আলোচনা করা এবং রূপমূলের সমন্বয়ে শব্দ কিভাবে গঠিত হয় তা নির্দেশ করা। রূপতত্ত্বের এ ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই-

- রূপতত্ত্বে বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূল ও সহরূপমূল নির্ণয় করা হয় এবং এদের শ্রেণীকরণ করা হয়।
- রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় শব্দ গঠন প্রক্রিয়া। প্রতিটি ভাষায় শব্দ গঠনের নানা প্রক্রিয়া রয়েছে। রূপতত্ত্ব শব্দ গঠনের এসব প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।
- শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গে নতুন যেসব ভাষিক উপাদান সংযুক্ত হয় রূপতত্ত্বে সেসব ভাষিক উপাদান নিয়েও আলোচনা করা হয়। যেমন, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন, কারক, কাল, পুরুষ ইত্যাদি।

- রূপতত্ত্বে শব্দ গঠন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি শব্দের শ্রেণীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন, সরল শব্দ, জটিল শব্দ, যৌগিক শব্দ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদি।
- নতুন শব্দ গঠনের পর নব গঠিত শব্দে কোন পরিবর্তন সূচিত হলে সে পরিবর্তন নিয়েও রূপতত্ত্ব আলোচনা করে। যেমন, বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়। এ শব্দে একটি 'আ' ধ্বনির বিলোপ ঘটেছে। নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তনকে রূপতত্ত্বে রূপমূলগত ধ্বনি পরিবর্তন (Morphophonemic change) বলা হয়।

রূপমূল (Morpheme): আমরা জেনেছি যে, রূপতত্ত্বের আলোচনা শব্দ সংগঠন সম্পর্কিত হলেও সে আলোচনা রূপমূলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। শিক্ষার্থীরা আসুন এবার আমরা রূপমূল সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

ভাষাতাত্ত্বিক এইচ. এ. গ্লিসন (H.A.Gleason)-এর মতে, ... Morphemes can be usefully describe as the smallest meaningful units in the structure of the language. অর্থাৎ রূপমূল হচ্ছে ভাষা সংগঠনের ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষিক একক। রূপমূল শব্দ হতে পারে কিংবা শব্দের অর্থপূর্ণ কোন অংশ হতে পারে। যেমন, বাংলাভাষার 'বইগুলো' শব্দটিতে দুটি রূপমূল রয়েছে -বই এবং -গুলো অন্যদিকে 'বই' শব্দটি একটি রূপমূল সহযোগে গঠিত। আপাতদৃষ্টিতে '-গুলো' এ ভাষিক উপাদানের কোন অর্থ নেই মনে হলেও এর অর্থ রয়েছে। '-গুলো' বহুবচন অর্থ প্রকাশক ভাষিক একক।

রূপমূল হচ্ছে ভাষা সংগঠনের ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষিক একক। রূপমূল শব্দ হতে পারে কিংবা শব্দের অর্থপূর্ণ কোন অংশ হতে পারে।

সহরূপমূল (Allomorph): ধ্বনিমূলের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ধ্বনিমূলের উচ্চারণ বৈচিত্র্য আছে। যেমন, বাংলা ভাষায় বহুবচন অর্থে -এরা, -রা, -গুলো, -সমূহ, -রাশি,-গণ ইত্যাদি ভাষিক একক ব্যবহৃত হয়। এসবই বহুবচনসূচক রূপমূলের আকার বৈচিত্র্য। আমরা জানি বহুবচনসূচক ভাষিক এককসমূহ বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু সকল বহুবচন-সূচক ভাষিক একক সকল বিশেষ্য সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। যেমন, 'পাখি' এ বিশেষ্যবাচক শব্দের শেষে '-গণ' বহুবচনসূচক ভাষিক একক বসতে পারে না। -'গণ' সাধারণত মনুষ্যবাচক, ও সম্মানবাচক শব্দের শেষে বসে। যেমন, শিক্ষকগণ। রূপমূলের আকার বৈচিত্র্য যদি ব্যাখ্যাযোগ্য হয় অর্থাৎ রূপমূল যদি ব্যাখ্যাযোগ্য অবস্থানে অবস্থান করে তবে তাকে সহরূপমূল বলে। যেমন, বাংলা ভাষার -রা, -এরা, বহুবচনসূচক রূপমূলের সহরূপমূল। '-রা' এ ভাষিক এককটি স্বরান্ত শব্দের শেষে বসে। যেমন, ছেলেরা, মেয়েরা, মহিলারা ইত্যাদি। '-এরা' ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে বসে। যেমন, লোকেরা, সাহিত্যিকেরা,সমালোচকেরা ইত্যাদি।

সুতরাং বাংলা ভাষায় '-রা' এবং '-এরা' বহুবচনসূচক রূপমূলের সহরূপমূল; কারণ এদের অবস্থান ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে।

রূপমূল: প্রকারভেদ

রূপমূলকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, মুক্তরূপমূল এবং বদ্ধ রূপমূল।

রূপমূলকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, মুক্তরূপমূল (Free-morpheme) এবং বদ্ধ রূপমূল (Bound morphme)

- মুক্ত রূপমূল (Free-morpheme): যে রূপমূল অন্য রূপমূলের সহায়তা ছাড়া স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে মুক্ত রূপমূল বলে। যেমন, 'পাখি' একটি মুক্ত রূপমূল। কেননা 'পাখি' অন্য কোন রূপমূলের সাহায্য ছাড়াই ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, 'আকাশে পাখি উড়ে' এ বাক্যে 'পাখি' এ মুক্ত রূপমূলটি অন্য কোন ভাষিক উপাদানের সাহায্যে ছাড়াই ব্যবহৃত হতে পারছে।
- বদ্ধ রূপমূল (Bound-morpheme): যে রূপমূল অন্য রূপমূলের সহায়তা ছাড়া স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে বদ্ধ রূপমূল বলে। যেমন, -রা, -এরা, -গুলো, -সমূহ, -কে, -দের ইত্যাদি বদ্ধ রূপমূল। এগুলো মুক্ত রূপমূলের সহায়তা ছাড়া ভাষায় স্বাধীনভাবে

ব্যবহৃত হতে পারে না। অনেক সময় দুটি বদ্ধ রূপমূল সহযোগে একটি শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন, বাংলা ভাষার 'স্বত্ব' শব্দটি স্ব এবং ত্ব এ দুটি বদ্ধ রূপমূল সহযোগে গঠিত হয়েছে। বদ্ধ রূপমূল মূলত দুই প্রকার। যথা, সম্প্রসারিত রূপমূল (Inflectional morpheme) এবং সাধিত রূপমূল (Derivational morpheme)।

যে বদ্ধ রূপমূল শুধুমাত্র শব্দের ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করে এবং নতুন শব্দ গঠন করে না তাকে সম্প্রসারিত রূপমূল (Inflectional morpheme) বলে। যেমন, পাখিগুলো শব্দের '-গুলো' বদ্ধ রূপমূলটি শব্দটির ব্যবহার সম্প্রসারিত করেছে, কিন্তু নতুন শব্দ গঠন করে নি। নতুন শব্দ গঠিত হলে শব্দের অর্থ বদলে যাবে। কিন্তু পাখি এবং পাখিগুলো শব্দ দুটি দ্বারা দুটি পাখা বিশিষ্ট ওড়ার ক্ষমতা সম্পন্ন কোন জীবকে বোঝায়। অন্যদিকে যে বদ্ধ রূপমূল নতুন শব্দ গঠন করে তাকে সাধিত রূপমূল (Derivational morpheme) বলে। যেমন, মামা+ই = মামি।

যে রূপমূল অন্য রূপমূলের সহায়তা ছাড়া স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে বদ্ধ রূপমূল বলে।

রূপমূলের শ্রেণীবিভাগ নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হচ্ছে।

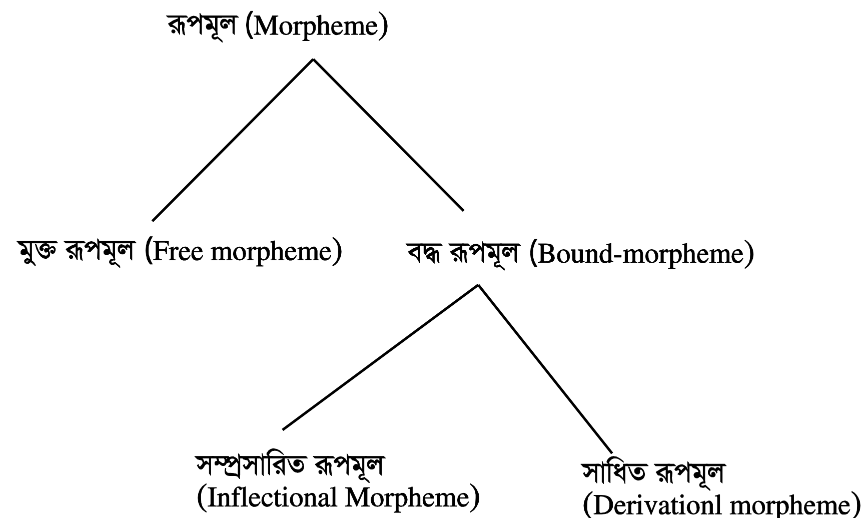

শব্দ: প্রকারভেদ

রূপমূলগত দৃষ্টিকোণের আলোকে শব্দকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। যথা, সরল শব্দ (Simple words), জটিল শব্দ (Complex words) এবং যৌগিক শব্দ (Compound words)

রূপমূলগত দৃষ্টিকোণের আলোকে শব্দকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ড় করা হয়। যথা, সরল শব্দ, জটিল শব্দ এবং যৌগিক শব্দ।

সরল শব্দ : যে শব্দ একটি মুক্ত রূপমূল দ্বারা গঠিত হয় তাকে সরল শব্দ বলে। সরল শব্দে সম্প্রসারিত রূপমূল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। যেমন, বাড়ি, পাখি, মানুষ, মাছগুলো, রহিমকে ইত্যাদি।

জটিল শব্দ: যে শব্দে একটি মুক্তরূপমূল এবং একটি সাধিত রূপমূল থাকে তাকে জটিল শব্দ বলে। যেমন, মানব+তা = মানবতা, ইতিহাস+ইক = ঐতিহাসিক।

যৌগিক শব্দ: যে শব্দ দুই বা ততোধিক রূপমূল দ্বারা গঠিত হয় তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যথা, বৌভাত, ঘরজামাই, রান্নাঘর, দেশপ্রেম ইত্যাদি।

শব্দ-গঠন প্রক্রিয়া

মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্যে ভাষা ব্যবহার করে। ভাব প্রকাশের নানা প্রয়োজনে প্রতিটি ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়। শব্দ গঠনের নানা প্রক্রিয়া রয়েছে। ভাষাভেদে এসব প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নে শব্দ গঠনের কয়েকটি প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো:

- একটি মুক্ত রূপমূল দিয়ে একটি শব্দ গঠিত হতে পারে। যথা, বই, গাছ, পাখি, আমি ইত্যাদি।
- একটি মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে আদ্যপ্রত্যয় (prefix) সহযোগে শব্দ গঠিত হতে পারে। যথা, পরা+জয়=পরাজয়, সু+নাম=সুনাম। এ দুটি শব্দে পরা-এবং সু-আদ্যপ্রত্যয়।
- দুটি মুক্ত রূপমূলের মাঝে মধ্যপ্রত্যয় (prefix) যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হতে পারে। শব্দ গঠনের এ প্রক্রিয়াটি ইংরেজি ভাষায় বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, son-in-law, Father-in-law, Sister-in-law ইত্যাদি। এসব শব্দে ধভ মধ্য প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- একটি মুক্ত রূপমূলের প্রথমে এবং শেষে পরিবেষ্টক প্রত্যয় (Circumfix) যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন, অসাবধানতা, অমানবিকতা, এ দুটি শব্দে অ-এবং -তা পরিবেষ্টক প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- একটি মুক্ত রূপমূলের শেষে অন্ত্যপ্রত্যয় (Suffix) যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন, মানবতা, গাছটি, ফুলগুলো ইত্যাদি। এ তিনটি শব্দে -তা, -টি এবং -গুলো অন্ত্যপ্রত্যয়।
- দুই বা ততোধিক মুক্ত রূপমূল পাশাপাশি অবস্থানের মাধ্যমেও নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন, নৃত্যশিল্পী, খেলাধুলা, পল্লীগীতিশিল্পী।
- অনেক সময় একটি রূপমূলের পুনরাবৃত্ত (reduplication)-এর মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন, টপ্ টপ্, ঝম্ ঝম্, ফিস্ ফিস্ ইত্যাদি।
- কোন কোন সময় দুটি স্বতন্ত্র শব্দের অংশ বিশেষের মিশ্রণ (Blends)-এর ফলে নতুন শব্দ জন্ম লাভ করে। যেমন ইংরেজি ভাষার ‘telecast’ শব্দটি television এবং broadcast শব্দ দুটির অংশ বিশেষ (tele- এবং -cast) নিয়ে গঠিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রূপমূল কাকে বলে? রূপমূলের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রূপতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করুন।
২. রূপতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।
৩. সহরূপমূল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. শব্দ কিভাবে গঠিত হয় বর্ণনা করুন।

নির্দেশ	উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

পাঠ - ৪

বাক্যতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- *বাক্যতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।*
- *বাক্য বিশ্লেষণের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।*
- *বাক্য সংগঠন (Sentence structure) বর্ণনা করতে পারবেন।*
- *বাক্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।*

ইংরেজি ভাষার Syntax শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় বাক্যতত্ত্ব শব্দটি প্রচলিত রয়েছে। বাক্যতত্ত্ব 'বাক্য' নামক ভাষার বৃহত্তম একক নিয়ে আলোচনা করে। ভাষাতাত্ত্বিক ডেভিড ক্রিষ্টাল (David Crystal) বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, Syntax is the way in which words are arranged to show relationships of meaning within (and sometimes between) sentences. বাক্যতত্ত্বের প্রধান কাজ হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বিন্যাস আলোচনা করা। জর্জ ইউলের মতে, If we concentrate on the structure and ordering of components within a sentence, we are studying what is technically known as the syntax of a language. অর্থাৎ বাক্য সংগঠন এবং বাক্যে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের ক্রম সংক্রান্ত আলোচনাই বাক্যতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বাক্য সংগঠন এবং বাক্যে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের ক্রম সংক্রান্ত আলোচনাই বাক্যতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাক্যকে কেন্দ্র করে বাক্যতত্ত্বের আলোচনা আবর্তিত হয়। কতিপয় শব্দ নিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ এলোমেলোভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হয় না। শব্দসমূহ বাক্যে ক্রম (order) অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে। বাংলা ভাষায় সাধারণত বাক্যের প্রথমে কর্তা (subject) থাকে' কর্তার পর কর্ম (object) এবং বাক্যের শেষে ক্রিয়া (verb) থাকে। যেমন, আমি বাড়ি যাই। এটি বাংলা ভাষার বাক্যের শব্দ ক্রম (word-order)-এর একটি উদাহরণ। বাক্যে শব্দসমূহ শুধুমাত্র সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে না, শব্দসমূহ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে। যেমন, 'সে গতকাল বাজারে গিয়েছিল'-এ বাক্যটিতে 'বাজারে' এবং 'গিয়েছিল' শব্দ দুটোর সাথে যেমন নিবিড় সম্পর্ক ঠিক তেমন সম্পর্ক 'সে' এবং 'বাজারে' শব্দ দুটোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। বাক্যস্থিত শব্দের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কিত আলোচনাও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

পরিধি

মানুষ ভাব বিনিময়ের জন্যে বাক্যের আশ্রয় নেয়। ধ্বনি, শব্দ, বাক্যাংশ (Phrase), খন্ডবাক্য (clause) এবং অর্থ বাক্যের মধ্যেই স্থাপিত থাকে। এসব কিছুকে ধারণ করে বাক্য ভাষার বৃহত্তম একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাক্য শুধুমাত্র ভাষার বৃহত্তম একক নয়, একই সঙ্গে বাক্য ভাষার সীমাহীন একক। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি এবং শব্দ সীমিত। কিন্তু বাক্য সীমাহীন। মানুষ প্রতিদিন ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে নিত্য নতুন বাক্য সৃষ্টি করে। বাক্যতত্ত্ব বাক্য সৃষ্টির কৌশল, বাক্য-সংগঠন এবং বাক্য গঠনে অংশগ্রহণকারী উপাদান নিয়ে আলোচনা করে। বাক্যতত্ত্বের এ আলোচ্য বিষয় পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই-

- বাক্যতত্ত্ব বাক্যের শ্রেণী বা প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করে। যেমন – সরল বাক্য, জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য।

- বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অবস্থান নিয়ে বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়ে থাকে। যেমন, বাংলা ভাষায় বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের আগে বসে।
- বাক্যতত্ত্বে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শব্দসমূহের ঘনিষ্ঠতা নির্দেশের লক্ষ্যে বাক্যতত্ত্ব অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent)-এর আশ্রয় নিয়ে থাকে। অব্যবহিত উপাদান বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করে।
- মানুষ কিভাবে বাক্য সৃষ্টি করে এবং রূপান্তর করে তা বাক্যতত্ত্বে নির্দেশের চেষ্টা করা হয়। যেমন, মানুষ প্রতিনিয়ত সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করছে, বর্ণনামূলক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করছে।

অব্যবহিত উপাদান কৌশল (Immediate Constituent Analysis)

কোন বাক্যিক সংগঠনকে বৃহত্তম কোন শ্রেণীতে বিন্যস্ড় করা হলে সেই বৃহত্তম শ্রেণীসমূহকে অব্যবহিত উপাদান বলা হয়।

সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিক ব্লুমফিল্ড বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অব্যবহিত উপাদান কৌশলের উল্লেখ করেছিলেন। বাক্যতত্ত্বের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাক্যে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করা। আধুনিক ভাষাতত্ত্বে বাক্যস্থিত শব্দসমূহের ঘনিষ্ঠতা নির্দেশের জন্যে অব্যবহিত উপাদান কৌশলের সাহায্য নেয়া হয়। অব্যবহিত উপাদান কৌশলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাক্যের অন্ত্য উপাদান (Ultimate constituent) খুঁজে বের করা এবং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ কোন শব্দের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত তা প্রকাশ করা। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি রূপমূল বা শব্দ হচ্ছে অন্ত্য উপাদান (Ultimate constituent)। কোন বাক্যিক সংগঠন (syntactic construction)-কে বৃহত্তম কোন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হলে সেই বৃহত্তম শ্রেণীসমূহকে অব্যবহিত উপাদান বলা হয়। অর্থাৎ কোন বাক্য, কোন বাক্যাংশ কিংবা কোন খন্ডবাক্যকে বৃহত্তর এককে ভাগ করা হলে বিভক্ত এককসমূহকে অব্যবহিত উপাদান (Immediate constituent) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সাধারণত বাক্যের ব্যবধানহীন ও সংলগ্ন দুটি উপাদান অব্যবহিত উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কোন বাক্যিক সংগঠনকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং এ দুটিকে অব্যবহিত উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন, 'নীলা ফুল ভালোবাসে' এ বাক্যে দুটি অব্যবহিত উপাদান রয়েছে। নীলা এবং ফুল ভালো বাসে। আবার 'ফুল ভালোবাসে' এ বাক্যিক সংগঠনের অব্যবহিত উপাদান দুটি হচ্ছে, ফুল এবং ভালোবাসে। 'নীলা ফুল ভালবাসে' এ বাক্যে তিনটি অন্ত্য উপাদান রয়েছে।

অব্যবহিত উপাদান কৌশল বাক্যের উপাদানসমূহের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের জন্যে বৃক্ষচিত্র (Treediagramme)-এর সাহায্য নিয়ে থাকে। নিম্নে বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে একটি বাক্যের অব্যবহিত উপাদানসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে-

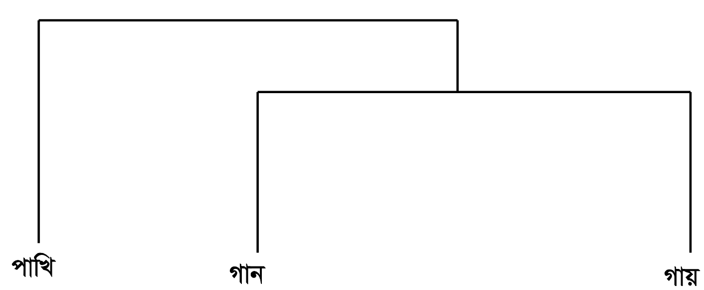

এ চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, গান ও গায় শব্দ দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং পাখি শব্দ দুটি গান গায় এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বাক্যের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। কোন বাক্যের একাধিক অর্থ থাকলে সে বাক্যকে দ্ব্যর্থবোধক বাক্য বলা হয়। যেমন 'নীলা চমৎকার গান গাইতে পারে' এ বাক্যে 'গান' শব্দের সঙ্গে 'গাইতে পারে' বাক্যাংশের সম্পর্ক দেখানো হলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে নীলার গান গাইবার ক্ষমতা চমৎকার। কিন্তু বাক্যটিতে চমৎকার এবং গান শব্দ দুটির ঘনিষ্ঠতা দেখানো হলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে নীলা সব গান নয়, কেবল চমৎকার গান গাইতে পারে। বিষয়টি বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে দেখানো হচ্ছে-

১.

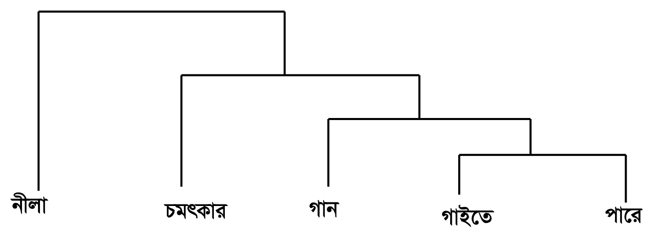

২.

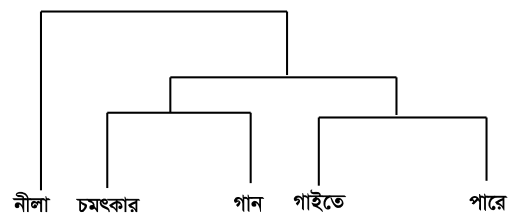

১ নং বৃক্ষচিত্রে বাক্যটি শব্দসমূহ যেভাবে সম্পর্কিত রয়েছে তাতে বাক্যটি 'নীলার গান গাইবার ক্ষমতা চমৎকার' এ অর্থ প্রকাশ করে। ২ নং বৃক্ষচিত্রের বাক্যটি 'নীলা কেবলমাত্র চমৎকার গান গাইতে পারে, অন্য কোন সাধারণ গান গাইতে পারে না' এ অর্থ প্রকাশ করছে।

অব্যবহিত উপাদান কৌশল বাক্যের দ্ব্যর্থতা মোচন করলেও এ কৌশল বাক্যে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের পরিচয় এবং ভূমিকা ব্যাখ্যা করে না। পরবর্তীকালে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাক্যের উপাদানসমূহের ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ ও দ্ব্যর্থতা মোচনের পাশাপাশি উপাদানসমূহের পরিচয় এবং ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা পদ সাংগঠনিক ব্যাকরণ (Phrase Structure Grammar)-এর পদচিত্র (Phrase-marker)-এর সাহায্যে বাক্যের উপাদান সমূহের পরিচয় ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

গভীরতল ও বহির্তল (Deep-Structure & Surface Structure)

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাক্য সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে বাক্যের দুধরনের সংগঠনের কথা বলেছেন। যথা, Deep Structure বা গভীরতল এবং Surface Structure বা বহির্তল। গভীরতল হচ্ছে বাক্যের বিমূর্ত (Abstract) সংগঠন। গভীরতল বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে। অন্যদিকে বহির্তল বাক্যের বিমূর্ত (Concrete) সংগঠন। কোন বাক্য উচ্চারিত হওয়ার পর শ্রোতা যে ভাষিক এককসমূহ শুনতে পান সে ভাষিক এককসমূহ বাক্যের বহির্তল। বাক্যের বহির্তলে ধ্বনি ও রূপমূল থাকে। অন্যদিকে বাক্যের গভীরতলে অর্থ (Meaning) থাকে। বাক্যের দ্ব্যর্থতা মোচনের জন্যে গভীরতল ও বহির্তল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন 'নীলা চমৎকার গান গাইতে পারে' এ বাক্যটির বহির্তল একটি, কিন্তু গভীরতল দুটি। গভীর তল দুটি হচ্ছে নীলার গান গাইবার ক্ষমতা চমৎকার এবং নীলা সব গান নয়, কেবল চমৎকার গান গাইতে পারে। অর্থাৎ কখনো কখনো বাক্যের একাধিক বর্হিতল এবং একটি গভীরতল থাকতে পারে। যেমন নীলা এ কাজটি করেছে এবং এ কাজটি নীলা কর্তৃক করা হয়েছে এ দুটি বাক্যের গভীরতল অভিন্ন

অর্থাৎ বাক্যদ্বয়ের অর্থ অভিন্ন। কিন্তু বাক্যদ্বয়ের বহির্তল ভিন্ন। সাধারণত কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের বাক্যসমূহের একটি গভীরতল এবং একাধিক বহির্তল থাকে।

বাক্যের প্রকারভেদ

প্রথাগত ভাষাতাত্ত্বিকেরা অর্থ (meaning) এবং গঠন (form) -এর ভিত্তিতে বাক্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁরা অর্থের ভিত্তিতে বাক্য শ্রেণীকরণ করার ক্ষেত্রে বাক্য কি অর্থ প্রকাশ করছে, তা লক্ষ্য করেছেন। অন্যদিকে গঠনের ভিত্তিতে বাক্য শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate) এবং খন্ডবাক্য (Clause)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গঠনের ভিত্তিতে বাংলা বাক্যকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। যথা–সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য (Simple Sentence): যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যথা, মৌসুমী বই পড়ে। সরল বাক্যের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় নানাভাবে প্রসারিত হতে পারে। যেমন, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নারী দক্ষ ও সুনিপুণভাবে যে কোন কাজ করতে পারে। এ বাক্যটি দীর্ঘ হলেও সরল বাক্য। এ সরল বাক্যে 'উচ্চ শিক্ষিত' অংশটি উদ্দেশ্যকে প্রসারিত করেছে এবং 'দক্ষ ও সুণিপুণ যে কোন' অংশটি বিধেয়কে প্রসারিত করেছে।

জটিল বাক্য (Complex Sentence): যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্য (Main Clause) থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খন্ডবাক্য (Dependent Clause) থাকে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন, আমি জানি যে শিলা একজন নৃত্যশিল্পী। এ বাক্যে 'আমি জানি যে' অপ্রধান খন্ডবাক্য এবং 'শিলা একজন নৃত্যশিল্পী' প্রধান খন্ডবাক্য।

যৌগিক বাক্য (Compound Sentence): যে বাক্যে দুই বা ততোধিক প্রধান খন্ডবাক্য (Main Clause) থাকে এবং এসব খন্ডবাক্য কোন সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন, আজাদ ভোরের কাগজ পত্রিকার একজন সাংবাদিক এবং সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ বাক্যটিতে দুটি প্রধান খন্ডবাক্য রয়েছে এবং এ প্রধান খন্ডবাক্যদ্বয় 'এবং' নামক সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাক্যের অর্থ অনুসারে বাক্যকে সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন।
যথা,

১. নির্দেশসূচক বাক্য (Indicative Sentence)
২. প্রশ্নবোধক বাক্য (Interogative Sentence)
৩. ইচ্ছাসূচক বা প্রার্থনাসূচক বাক্য (Optative or Precative Sentence)
৪. আজ্ঞা-সূচক বাক্য (Imperative Sentence)
৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য (Conditional Sentence)
৬. সন্দেহ-দ্যোতক বাক্য (Dubitative Sentence)
৭. বিস্ময়াদি-বোধক বাক্য (Interjective Sentence)

বাক্যে প্রকাশিত ভাব বা অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এসব বাক্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেমন যে বাক্য দ্বারা কোন প্রশ্ন প্রকাশ পায় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে।

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতত্ত্বের জনক আবরাম নোয়াম চমস্কি ভাষার বাক্যসমূহকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। যথা, মৌল বাক্য (kernel sentence) এবং আহরিক বাক্য (Derived Sentence)।

মৌল বাক্য: মৌল বাক্য হচ্ছে ভাষার মৌলিক এবং অপেক্ষাকৃত সহজ বাক্য। মানুষ প্রতিনিয়ত ভাষার বাক্যসমূহের রূপান্তর ঘটায়। এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে মানুষ একটি মৌল বাক্য থেকে অন্যান্য নতুন বাক্য সৃষ্টি

করে। যেমন, 'রিনি মেধাবী ছাত্রী' এ বাক্য থেকে রিনি কি মেধাবী ছাত্রী? রিনি মেধাবী ছাত্রী নয়, রিনি অন্যান্য ছাত্রীর তুলনায় মেধাবী ছাত্রী, এসব নতুন বাক্যের রূপান্তর ঘটে এবং যে বাক্য অরূপান্তরিত থাকে সে বাক্যেই মৌল বাক্য। কোন ভাষার সরল কর্তৃবাচ্য, হ্যাঁ-বোধক, বিবৃতিধর্মী বাক্যকে মৌল বাক্য বলা হয়।

আহরিত বাক্য: মৌল বাক্য ছাড়া ভাষায় অন্যান্য যেসব বাক্য রয়েছে সেসব বাক্যকে আহরিত বাক্য বলে। মৌল বাক্যের আলোচনায় আমরা দেখেছি মানুষ প্রতিনিয়ত ভাষায় ব্যবহৃত মৌল বাক্যের রূপান্তর ঘটাচ্ছে। মৌল বাক্যের রূপান্তরের ফলে যেসব বাক্যের সৃষ্টি হয় সেসব বাক্যই আহরিত বাক্য। নিচে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌল বাক্য ও আহরিত বাক্যের উদাহরণ দেয়া হচ্ছে।

মৌল বাক্য	**আহরিত বাক্য**
নীলা গান গায়	নীলা কি গান গায়?
	নীলা গান গায় না
	নীলা গান শুনে এবং গান গায়
	আমি শুনে আনন্দিত হলাম যে নীলা গান গায়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অব্যবহিত উপাদান কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. বাক্যের প্রকারভেদসমূহ বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাক্যতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করুন।

২. বাক্যতত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. গভীরতল ও বহির্তল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

নির্দেশ	উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

পাঠ - ৫

অর্থতত্ত্ব ও অর্থ পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি শেষে আপনি

- *অর্থতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।*
- *অর্থ পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করতে পারবেন।*
- *অর্থ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।*

ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের অর্থ নিয়ে অর্থতত্ত্ব আলোচনা করে।

বাংলা ভাষায় অর্থতত্ত্ব শব্দটি ইংরেজি ভাষার 'Semantics' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Semantics শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় অর্থতত্ত্ব শব্দটি ছাড়াও শব্দার্থবিজ্ঞান এবং বাগর্থবিজ্ঞান শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। অর্থ (meaning) ভাষার প্রাণ। অর্থতত্ত্বে ভাষা সংগঠনের প্রাণ অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভাষাতাত্ত্বিক জন লায়ন্স (John Lyons) -এর মতে 'Semantics is the study of meaning' অর্থাৎ অর্থতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অর্থ (meaning)। জন লায়ন্সের সংজ্ঞার সামান্য বিস্তৃতরূপ পাওয়া যায় ডেভিড ক্রিস্টাল (Davi Crystal)-এর সংজ্ঞায়। অর্থতত্ত্ব সম্পর্কে ডেভিড ক্রিস্টাল বলেছেন ' A major branch of linguistics devoted to the study of meaning in language' অর্থতত্ত্ব সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ ইউল (George Yule) এর বক্তব্য হচ্ছে 'Semantics is the study of the meaning of words, phrases and sentences. অর্থাৎ ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের অর্থ নিয়ে অর্থতত্ত্ব আলোচনা করে।

উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে ভাষায় ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের যেমন সংগঠন রয়েছে, তেমনি অর্থের সংগঠন রয়েছে। অন্যান্য সংগঠনের মতো অর্থ-সংগঠনেও কতগুলো নিয়ম রয়েছে এবং অর্থতত্ত্ব এসব নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে। যেমন বাংলাভাষায় 'করিম ভাত খায়' এ বাক্যটি অর্থবোধক হলেও 'টেবিল ভাত খায়' বাক্যটি কোন অর্থ প্রকাশ করে না। বাক্য গঠনের দিক থেকে দুটি বাক্যই শুদ্ধ। কেননা দুটি বাক্যেই প্রথমে উদ্দেশ্য (Subject) বসেছে, মাঝে কর্ম (object) বসেছে এবং শেষে ক্রিয়া (Verb) বসেছে। এ দুটি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যটি অর্থবোধক হলেও দ্বিতীয় বাক্যটি অর্থবোধক নয়। কেননা টেবিল কোন জিনিস খেতে পারে না। অর্থাৎ 'খাওয়া' এ ক্রিয়ার বা উদ্দেশ্য এমন একটি বিশেষ্য হতে হবে, যে বিশেষ্য কোন জিনিস খাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। এটি অর্থ-সংগঠনের একটি নিয়ম। মানুষ কিভাবে শব্দের অর্থ-উপলব্ধি করে, কোন ক্রমে, কোন ধ্বনিগত প্রতীক (Phonetic symbol) অর্থবহ হয়ে ওঠে তা অর্থতত্ত্ব আলোচনা করে। যেমন 'গাছ' এ শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনে গাছের একটি চিত্র ভেসে উঠে। কিভাবে এবং কেন শ্রোতার মনে গাছের ছবি ভেসে উঠে তা অর্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। 'গাছ' এ শব্দটি অর্থবহ হলেও 'আছগ' এ ধ্বনিগুচ্ছ কোন অর্থবহন করে না। অথচ গাছ এবং আছগ এ দুটি শব্দে ধ্বনির সংখ্যা সমান। অর্থাৎ ভাষার শব্দে ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহ সাজাবার একটি ক্রম রয়েছে। যেমন গাছ শব্দটির জন্য প্রথমে গ, পরে আ এবং সবশেষে ছ বসাতে হবে। গা+আ+ছ এ ক্রমে শব্দটি সাজাতে হবে। এ ক্রম রক্ষিত না হলে শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করে না। অর্থ প্রকাশের জন্যে ধ্বনির ক্রম বা বিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনাও অর্থতত্ত্বের আওতাভুক্ত। মোটকথা অর্থ প্রকাশের জন্যে বিভিন্ন ভাষার উপাদান কিভাবে বিন্যস্ত ও সংগঠিত হয় তা ভাষাতত্ত্বের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে অর্থতত্ত্ব নামে অভিহিত করা যায়।

অর্থ পরিবর্তন

ভাষা পরিবর্তনশীল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভাষার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাষার ধ্বনি সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে, ভাষার শব্দ সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে এবং ভাষার অর্থ সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অর্থের যে পরিবর্তন ঘটে সে পরিবর্তনকে অর্থ পরিবর্তন বলা হয়। ঐতিহাসিক অর্থতত্ত্ব (Historical Semantics)-এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অর্থ পরিবর্তন। অর্থের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনাকে ঐতিহাসিক অর্থতত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়।

ভাষা পরিবর্তনশীল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন ঘটে।

অর্থ পরিবর্তনের কারণ

- **অলঙ্কার-উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির প্রয়োগ:** মানুষ তাঁর মনোভাব যথাযথভাবে প্রকাশের জন্যে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের অলঙ্কার, উপমা এবং উৎপ্রেক্ষের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ অলঙ্কার, উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা অনেক সময়ই ভাষার অর্থ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন 'চাঁদ' শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করছে তার সঙ্গে ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত 'চাঁদ' শব্দের অর্থের সাদৃশ্য সামান্য।
- **ঐতিহাসিক কারণ:** ভাষাভাষীর অতীত ইতিহাস অর্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন ইংরেজি ভাষার 'Pen' শব্দের অর্থ কলম। পালক, ধাতু, প্লাস্টিক যে কোন বস্তুনির্মিত লেখার বস্তুই কলম। লাতিন 'Penna' শব্দ থেকে ইংরেজি 'Pen' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। 'Penna' শব্দের অর্থ পালক। প্রাচীনকালে লেখার উপকরণ হিসেবে পালক ব্যবহৃত হত। ফলে লেখার কাজে ব্যবহৃত পালককে 'পেন' হিসেবে অভিহিত করা হত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখার উপকরণের আকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হলেও এখনো লেখার উপকরণ অর্থে ইংরেজি ভাষায় 'Pen' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এভাবেই লেখার উপকরণের বিবর্তনের ফলে 'Pen' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এভাবেই লেখার উপকরণের বিবর্তনের ফলে 'Pen' শব্দটি পালক অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছেড়ে লেখার উপকরণ হিসেবে নতুন পরিচিতি লাভ করেছে।
- **সামাজিক কারণ:** সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা অর্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে থাকে। আমরা জানি শিক্ষা, অর্থ, পেশা ইত্যাদি কারণে সমাজে নানা শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এসব শ্রেণীবিন্যাস অনেক সময় শব্দের অর্থকে পরিবর্তিত করে। যেমন, ইংরেজি ভাষার 'arrive' শব্দটি প্রথমে নাবিকদের মধ্যে ব্যবহৃত হতো। নাবিকদের মধ্যে এ শব্দের অর্থ ছিল সমুদ্র বা নদীর তীরে পৌঁছানো। পরবর্তীকালে শব্দটি নাবিক শ্রেণীর গন্ডি ছাড়িয়ে সকল ইংরেজি ভাষাভাষীর মধ্যে ব্যবহৃত হবার ফলে ভিন্ন অর্থ লাভ করে। 'arrive' শব্দটি ব্যাপক ভাষাভাষীর মধ্যে 'যে কোন স্থানে পৌঁছানো' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **সুভাষণরীতির প্রয়োগ:** অনেক ভাষাতেই অকল্যাণমূলক বা নিন্দিত বা কুৎসিত অর্থকে সুভাষণরীতির সাহায্যে কল্যাণমূলক বা ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হয়। ফলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, বাংলা ভাষায় সুভাষণরীতির কারণে 'বাড়ন্ত' শব্দটি 'শেষ' অর্থে এবং 'আসি' শব্দটি 'যাই' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' এ বাক্যে 'বাড়ন্ত' 'শেষ' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া বাঙালিরা প্রতি নিয়ত কোন স্থান থেকে বিদায়কালে যাই-এর স্থলে 'আসি' শব্দটি ব্যবহার করে। কিন্তু এ 'আসি' শব্দ আসা অর্থে নয়, 'যাওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- **গৌণ অর্থের প্রাধান্য লাভ:** সাধারণত শব্দের দুধরনের অর্থ থাকে। একটি মুখ্য অর্থ অন্যটি গৌণ অর্থ। মুখ্য অর্থ হচ্ছে প্রধান অর্থ। মুখ্য অর্থ হতে যেসব অর্থের উদ্ভব ঘটে সেগুলো গৌণ অর্থ। যেমন, 'মাথা' শব্দের মস্তক, প্রধান, চিন্তাশক্তি, শীর্ষ, সম্মুখভাগ ইত্যাদি অর্থ বিদ্যমান। এসব অর্থের মধ্যে মাথা শব্দের মূখ্য অর্থ হচ্ছে মস্তক এবং অন্যান্য অর্থ শব্দটির গৌণ অর্থ। অনেক

সময় শব্দের গৌণ অর্থ প্রাধান্য লাভ করলে মূখ্য অর্থ চাপা পড়ে যায় এবং শব্দের অর্থ বদলে যায়। যেমন 'উজবুক' একটি দেশের নাম। সে দেশের লোক বাঙালির কাছে সামান্য বোকা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় বাংলা ভাষায় 'উজবুক' শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে বোকা বা নির্বোধ।

ঐতিহাসিক অর্থতাত্ত্বিকেরা অর্থ পরিবর্তনের আলাচনায় অর্থ পরিবর্তনের কারণ আলোচনার পাশাপাশি অর্থ কিভাবে পরিবর্তিত হয় সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন অর্থাৎ অর্থ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থ পরিবর্তনের তিনটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার, অর্থ সংকোচ এবং অর্থ সংক্রম বা অর্থ সংশ্লেষ।

অর্থ বিস্তার বা অর্থ প্রসার (Expansion of meaning)

অর্থ প্রসারের মাধ্যমে শব্দের অর্থের বিস্তৃতি ঘটে। শব্দের অর্থ বিশিষ্ট বা বিশেষ অর্থ থেকে সাধারণ বা ব্যাপক অর্থে প্রচলিত হলে তাকে অর্থ প্রসার বা অর্থ বিস্তার নামে অভিহিত করা হয়। মূলত রূপক বা অতিশয়োক্তির কারণে অর্থের প্রসার ঘটে। যেমন সংস্কৃত ভাষায় 'পরশ্ব' শব্দের অর্থ আগামীকালের পরের দিন। সংস্কৃতি ভাষার 'পরশ্ব' শব্দের থেকে বাংলা ভাষার পরশু শব্দটি এসেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় পরশু শব্দটির অর্থের প্রসার ঘটেছে। বাংলা ভাষায় পরশু শব্দের অর্থ আগামীকালের পরের দিন এবং গতকালের আগের দিন। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় শব্দটি কেবল ভবিষ্যৎকাল অর্থে ব্যবহৃত হত এবং বাংলা ভাষায় শব্দটি অতীতকাল এবং ভবিষ্যৎ কাল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'কালি' শব্দটি এক সময় 'কালো রঙের তরল পদার্থ' অর্থে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে 'কালি' বলতে শুধুমাত্র কালো রঙের তরল পদার্থ নয়, লেখার কাজে ব্যবহৃত যে কোন রঙের তরল পদার্থকে বোঝানো হয়। অর্থ প্রসারের ফলে অর্থ অনেক সময় প্রতীকস্থানীয় হয়ে পড়ে। যেমন, ভাত শব্দটির অর্থ 'সিদ্ধ চাল' কিন্তু এ শব্দটি জীবিকাসংস্থান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, এ অফিস থেকে তাঁর ভাত উঠে গেছে। এ বাক্যে ভাত সিদ্ধচাল বোঝাচ্ছে না, এখানে 'ভাত' শব্দটি জীবিকা নির্দেশ করছে।

অর্থ সংকোচ (Reduction of Meaning)

অর্থ প্রসারের বিপরীত প্রক্রিয়া হচ্ছে অর্থ সংকোচ। কোন শব্দের ব্যাপক, বিস্তৃত অর্থ থাকলে এবং সে অর্থ সংকোচিত হলে তাকে অর্থ সংকোচ বলা যায়। আমরা জানি অধিকাংশ শব্দের অর্থ সমষ্টির মধ্যে কোন একটি অর্থ প্রধান হয়ে উঠে এবং অন্যান্য অর্থগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্ত হতে পারে। যেমন, সংস্কৃত ভাষায় অন্ন শব্দটির অর্থ খাদ্য, যে কোন খাদ্য। কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্ন শব্দের অর্থ সংকোচ ঘটেছে। বাংলা ভাষায় অন্ন বলতে যে কোন খাদ্যকে বোঝায় না, ভাত নামক একটি নির্দিষ্ট খাদ্যকে বোঝায়। এক সময় মৃগ শব্দের অর্থ ছিল যে কোন পশু। কিন্তু শব্দটির অর্থ সংকোচের ফলে বর্তমানে শব্দটি 'হরিণ' নামক একটি নির্দিষ্ট পশু অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। একইভাবে 'জলপানি' শব্দটি তার মূল অর্থ লঘু আহার বা 'জল খাবার' হারিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রের বৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অর্থ সংক্রম বা অর্থ সংশ্লেষ (Transfer of Meaning)

অর্থের ক্রমম্বিত প্রসার ও সংকোচের ফলে অনেক সময় শব্দের এমন নতুন অর্থ দাঁড়ায় যার সঙ্গে শব্দের মূল অর্থের কোন যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের এ ধরনের প্রক্রিয়াকে অর্থ সংশ্লেষ বলে। যেমন, সংস্কৃত ভাষায় পাত্র শব্দটির অর্থ ছিল 'পান করার আধার'। পরবর্তীকালে অর্থ বিস্তারের কারণে শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে যে কোন রকমের আধার। এর পর অর্থ সংকোচের কারণে শব্দটি 'কন্যা দান করার আধার' এ অর্থ লাভ করেছে। পাত্র শব্দটির মূল অর্থের সঙ্গে সর্বশেষ অর্থের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থ সংশ্লেষের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের মধ্যবর্তী অর্থের বিলুপ্তি ঘটে। যেমন, পাষন্ড শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল ধর্ম সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বিরুদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়। সর্বশেষে শব্দটির 'ধর্মজ্ঞানহীন, অত্যাচারী–এ অর্থ লাভ করে। শব্দটির সর্বশেষ অর্থের সঙ্গে মৌলিক অর্থের কোন সাদৃশ্য নেই এবং শব্দটির মধ্যবর্তী অর্থ 'বিরুদ্ধ ধর্ম সম্প্রায়' লোপ পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থ পরিবর্তন কাকে বলে? অর্থ পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অর্থতত্ত্বের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করুন।

২. অর্থসংকোচ ও অর্থ প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

নির্দেশ	উত্তরগুলো নিজে নিজে তৈরি করুন।

পাঠ - ৬

ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি অনুশীলনের পর আপনি-

- *প্রথাগত ব্যাকরণের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।*
- *প্রথাগত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।*
- *ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ নির্দেশ করতে পারবেন।*

প্রথম পাঠের আলোচনায় আমরা ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীকরণ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। সে আলোচনায় আমরা দেখেছি, ভাষার একটি সংগঠন আছে এবং ভাষা সংগঠন সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব (Theory) ব্যবহার করে সুনিয়ন্ত্রিত ও তথ্য-যাচাই-সম্ভব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভাষা সংগঠন নিয়ে গবেষণা করা হলে তাকে ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) বলে। ভাষাতত্ত্ব হচ্ছে ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং ভাষাতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষা সংগঠন সম্পর্কিত সূত্র প্রদান করা । এবার দেখা যাক প্রথাগত ব্যাকরণ (Traditional Grammar) বলতে কি বোঝায়। প্রথাগত ব্যাকরণ সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক ডেভিড ক্রিষ্টাল (David Crystal) বলেছেন, 'The Pharase tradition grammar is an attempt to summaries the range of attitudes and methods found in the pre-linguistic era of grammatical study. প্রথাগত ব্যাকরণ সম্পর্কে বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক হুমায়ুন আজাদের বক্তব্য হচ্ছে, প্রাচীন গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষাচিন্তা থেকে উৎসারিত ব্যাকরণ হচ্ছে প্রথাগত ব্যাকরণ। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের আবির্ভাবের পূর্বে গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে ভাষার যে চর্চা তাকে প্রথাগত ব্যাকরণ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

প্রথাগত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য: প্রথাগত ব্যাকরণ চর্চার ইতিহাস, প্রায় আড়াই হাজার বছরের ব্যাকরণ চর্চার ইতিহাস। প্রথাগত ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিক, লাতিন এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণবিদরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রথাগত ব্যাকরণের ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা লক্ষ্য করলে প্রথাগত ব্যাকরণের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:

- প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থকে প্রাথমিক কৌশল (Primary tool) হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ প্রথাগত ব্যাকরণ অর্থের মানদন্ডে ভাষা বিশ্লেষণ করে। যেমন, প্রথাগত ব্যাকরণ বিশেষ্যের সংজ্ঞা প্রদান করে এভাবে–যে শব্দ দ্বারা কোন কিছুর নাম বোঝানো হয় তাকে বিশেষ্য বলে। অর্থাৎ শব্দের অর্থ থেকে বুঝতে হবে কোন কোন শব্দ নাম প্রকাশ করে।
- প্রথাগত ব্যাকরণ অনুশাসনিক ব্যাকরণ (Prescriptive Grammar) এ ব্যাকরণ ভাষা কিভাবে বলা উচিত, ধ্বনি কিভাবে উচ্চারণ করা উচিত, শব্দ কিভাবে গঠন করা উচিত, বাক্যে শব্দক্রম (word-order) কিভাবে করা উচিত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ এ ব্যাকরণ উচিত-অনুচিতের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা আলোচনা করে।
- প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষার লিখিত রূপ (Written form of language)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
- প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষার বিভিন্ন নিয়ম ও সূত্র প্রদানের ক্ষেত্রে লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা থেকে উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এবং অর্থ নিয়ে ভাষা সংগঠন। প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষা সংগঠনের এসব স্তরের (level) মধ্যে শব্দ নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছে।

প্রথাগত ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা

ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকদের দৃষ্টিতে প্রথাগত ব্যাকরণের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়তে থাকে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষাতত্ত্বের অগ্রগতিতে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের অনেক তত্ত্ব প্রথাগত ব্যাকরণের ধারণা থেকে উৎসারিত হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে ভাষাতাত্ত্বিকেরা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথাগত ব্যাকরণকে মূল্যায়ন করছেন এবং এ ব্যাকরণকে ভাষিক চিন্তার ইতিহাস (The history of linguistic ideas) -এর অংশ হিসেবে বিবেচনা করছেন। শিক্ষার্থীরা আসুন এবারে প্রথাগত ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতাসমূহ লক্ষ করি-

প্রথাগত ব্যাকরণ মূলত গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত এ তিনটি ভাষা চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

- আমরা জেনেছি প্রথাগত ব্যাকরণ মূলত গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত এ তিনটি ভাষা চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এ ব্যাকরণে বিভিন্ন নিয়ম ও সূত্রের প্রয়োগ দেখানোর জন্যে এ তিনটি ভাষা থেকে দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ গৃহীত হয়েছে। এ কারণে প্রথাগত ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম ও সূত্র ঐ তিনটি ভাষার জন্যে যথাযথভাবে প্রযোজ্য হয়। ঐ তিনটি ভাষার সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ভাষাসমূহের সংগঠন বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যাকরণ তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না।
- প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরসমূহ (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে এবং এসব স্তরসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়।
- এ ব্যাকরণ ভাষার বর্ণনামূলক আলোচনার উপর কম গুরুত্ব আরোপ করে এবং ভাষা কিভাবে ব্যবহার করা উচিত তার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। অথচ ভাষার নিরপেক্ষ বর্ণনাই ব্যাকরণ-চর্চা বা ভাষা চর্চার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।
- প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার পরিবর্তনকে বিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ভাষা বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করে। অথচ ভাষা পরিবর্তন এবং ভাষা-বৈচিত্র্য (varities of Language) ভাষা আলোচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়।
- প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ (Diachronic Analysis)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং কালকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ (Synchronic Analysis) -এর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে। ভাষার কালানুক্রমিক বিশ্লেষণে কালের বিবর্তন ভাষা সংগঠনে যে পরিবর্তন ঘটায় তা আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে ভাষার কালকেন্দ্রিক বিশ্লেষণে একটি নির্দিষ্ট কালের ভাষা সংগঠন বর্ণনা করা হয়।
- প্রথাগত ব্যাকরণ প্রচলিত বা জীবিত ভাষাসমূহ (living Language)-এর তুলনায় মৃত ভাষাসমূহ (Dead Language) বিশ্লেষণে বেশি আগ্রহ প্রদর্শন করে। শুধু তাই নয় এ ব্যাকরণ জীবিত ভাষাসমূহ এবং মৃত ভাষাসমূহ অভিন্ন মানদন্ডে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে।
- অর্থ ভাষার প্রাণ। প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষা বিশ্লেষণে অর্থকে প্রধান মানদন্ড হিসেবে ব্যবহার করলেও স্বতন্ত্রভাবে অর্থ নিয়ে কোন আলোচনা করে না। অর্থাৎ ভাষা সংগঠনের অংশ হিসেবে অর্থ সম্পর্কিত আলোচনা এ ব্যাকরণে পরিলক্ষিত হয় না।
- মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে ভাষা উৎপন্ন হয়। অথচ প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার মৌখিক রূপ (Spoken form) বর্ণনা ও বিশ্লেষণে কোন আগ্রহ প্রদর্শন করে না।
- প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার ব্যাকরণ-কে ঈশ্বর প্রদত্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে এবং ভাষা পরিবর্তনের কারণে ভাষার ব্যাকরণও পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক তা অস্বীকার করে।

ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণ: সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

ভাষাতত্ত্বে বৈজ্ঞানিকভাবে ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভাষাতত্ত্বের আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকালের ভাষা চর্চা প্রথাগত ব্যাকরণ নামে পরিচিত হয়ে থাকে। ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণের মধ্যে অন্যতম প্রধান সাদৃশ্য হচ্ছে উভয়ের আলোচ্য বিষয় ভাষা। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষা-চর্চা তথা ভাষার আলোচনা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব ও প্রথাগত ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় অভিন্ন হলেও ভাষা

বিশ্লেষণের রীতি বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এসব পার্থক্যসমূহ হচ্ছে-

- ভাষাতত্ত্ব বর্ণনামূলকভাবে ভাষা নিয়ে আলোচনা করে। ভাষাতত্ত্ব মানুষ কিভাবে ভাষা ব্যবহার করছে, কিভাবে শব্দ গঠন করছে, বাক্যে শব্দ বিন্যস্ত করছে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে। অন্যদিকে প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষা সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও আদর্শ কোন সূত্র প্রদান করে সে সূত্র মোতাবেক ভাষা ব্যবহার করা উচিত বলে পরামর্শদান করে। এজন্য এ ব্যাকরণকে আনুশাসনিক ব্যাকরণ (Prescriptive Grammar) হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- ভাষাতত্ত্ব ভাষা বর্ণনার ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষা (Spoken Language)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে ভাষাতত্ত্ব মৌখিক ভাষা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারছে। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণ এ সুবিধার অভাবে লিখিত ভাষা (Written Language) এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মৌখিক ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। অন্যদিকে ভাষাতত্ত্ব প্রথমে মৌখিক ভাষা এবং পরে লিখিত ভাষা নিয়ে আলোচনা করে।
- ভাষাতত্ত্ব গ্রিক-ল্যাটিন-সংস্কৃত ভিত্তিক কাঠামোতে সকল ভাষা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে না। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণবিদরা মনে করতেন এ তিনটি ভাষার ব্যাকরণ কাঠামো সার্বজনীন। অর্থাৎ এ তিনটি ভাষা এমন একটি ব্যাকরণ কাঠামোর অধিকারী যে কাঠামোর সাহায্যে পৃথিবীর সকল ভাষা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা ঐ তিনটি ভাষার ব্যাকরণ কাঠামোতে ফেলে সকল ভাষা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সচেষ্ট হন। এ প্রচেষ্টার ফলে প্রথাগত ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে ব্যর্থ হয় এবং ভাষাতত্ত্ব এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে।
- ভাষাতত্ত্ব ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সকল ভাষাকে সমান গুরুত্ব দান করে। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণ শুধুমাত্র সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও গুণসম্পন্ন ভাষাসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রথাগত ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রথাগত ব্যাকরণের সংজ্ঞা প্রদান করুন।
২. প্রথাগত ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের মধ্যে কোন সাদৃশ্য রয়েছে কি?
৩. প্রথাগত ব্যাকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

নির্দেশ	উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

৭

বাংলা পরিভাষা

যে কোন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ঐ বিশেষ শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু অত্যন্ত দরকারি শব্দের প্রয়োজন হয়, যে শব্দগুলো হয়তো আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ কথাবার্তায় তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ বিশেষ ধরনের জ্ঞানের আলোচনার জন্য তা অনিবার্যভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ শব্দটি ছাড়া যেন সমস্ত আলোচনাই অসম্পূর্ণ। পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে এমন শব্দ যার সাহায্যে সংক্ষেপে কোন বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায়। পরিভাষার কোন অর্থান্তর থাকে না, তা কেবল একটি মাত্র ভাবকেই প্রকাশ করে, একাধিক ভাবকে প্রকাশ করে না।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ ১. বাংলা পরিভাষা - ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা
- পাঠ ২. বাংলা পরিভাষার ইতিহাস
- পাঠ ৩. বাংলা পরিভাষা নির্মাণ কৌশল

পাঠ - ১

বাংলা পরিভাষা : ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *পরিভাষা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;*
- *পরিভাষার সংজ্ঞা দিতে পারবেন;*
- *বাংলা পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *পরিভাষা কীভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তা বলতে পারবেন।*

আপনি যদি কম্পিউটার সম্পর্কে কোন ধারণা না রাখেন তবে আপনার কাছে ফাইল, প্রোগ্রাম ইত্যাদি শব্দ হয়ত অপরিচিত মনে হবে, আবার আপনার সঙ্গে যদি অর্থনীতির কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে আপনি হয়ত চাহিদা, যোগান, মুদ্রা, বাজার এসব কথার ঠিক ঠিক অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না, যে অর্থে আলোচকেরা শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকেন। কখনও কখনও হয়ত দেখা যাবে ঐ সব শব্দ ছাড়া অর্থনীতির বা কম্পিউটারের আলোচনা করাই যাচ্ছে না। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় চাবি শব্দ, ইংরেজিতে যাকে Key words বলা হয়। এই কী-ওয়ার্ডগুলোই হচ্ছে পরিভাষা। আবার অনেকের মতে বিশেষ বা বিশিষ্টার্থবোধক শব্দের নাম পরিভাষা। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই কোন কোন শব্দ ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। যেমন রসায়ন বিজ্ঞানের পরিভাষা, গণিতের পরিভাষা, সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষা ইত্যাদি। যেমন 'শব্দ' কথাটির অর্থ ধ্বনি বা আওয়াজ। কিন্তু ব্যাকরণে শব্দ বলতে বোঝায় অর্থবহ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ওয়ার্ড'। এভাবে অনেক উদাহরণ দেয়া যায়, আমরা আলোচনার প্রয়োজনে ক্রমশ আপনাদের সামনে সেগুলো উপস্থাপন করব।

এবার আসুন পরিভাষার একটি সংজ্ঞার্থ তৈরি করতে আমরা চেষ্টা করি। আলোচনার শুরুতে দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি পরিভাষার যে সংজ্ঞার্থ প্রদান করেছেন তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব, তারপর তাদের সংজ্ঞার্থের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের মত করে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

- "অভিধানে 'পরিভাষা' অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণত 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পন্ডিতগণের সম্মতিতে স্থীরিকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।" [রাজশেখর বসু]
- "ইংরেজিতে কথাটি যা বোঝায় তা হচ্ছে– A word (=team) connected with methods or objects used by experts in science, technology or arts by way of abbreviation, অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা, চারু ও কারুকলা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যবহৃত বস্তু অথবা তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতির সহিত সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত শব্দ। উদাহরণস্বরূপ লাতিন 'ইফবট-বর্টণর' কথার উল্লেখ করা যায়। এর মৌলিক অর্থ 'সদাশয় জননী' হলেও, বর্তমানে এতে যা বোঝায় তা হচ্ছে, 'ছাত্রদের সেই বিদ্যালয় যাতে তারা শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছে।' মূলের সঙ্গে "Technical Term" এর কোন প্রকারের সম্বন্ধ থাকা প্রত্যাশিত হলেও, তার সাথে কোন সম্বন্ধ না থাকলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।"

[মুহম্মদ এনামুল হক]

এবার আসুন ঐ দু'জন খ্যাতনামা পন্ডিতের বক্তব্য থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেদের মত করে আমরা পরিভাষার একটি সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করতে চেষ্টা করি। 'পরিভাষা' শব্দটি আসলে ইংরেজি 'defination' শব্দের বাংলা অনুবাদ। এর কাছাকাছি আরেকটি ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'technical term'-যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে

'পারিভাষিক শব্দ'। 'পরিভাষা' শব্দটি এদেশে ইংরেজরা আসবার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল সংজ্ঞাবাচক বিশেষ অর্থে। 'বাচস্পত্য' অভিধান অনুসারে 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ হল 'শাস্ত্রাকারে সংজ্ঞা বিশেষ। এছাড়া অন্য প্রাচীন অভিধানগুলোতেও শব্দটির যে অর্থ দেয়া হয়েছে তার সার কথা হচ্ছে 'অর্থান্তর নেই এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নাম পরিভাষা'। বস্তুত, পরিভাষা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত এমন বিশেষ কিছু শব্দ যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ধারণাকে যথার্থভাবে, নির্ভুলভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বা সংজ্ঞাকে পরিভাষা বলে। পন্ডিতেরা একমত হয়ে একটি বিশেষ ধারণার (Concept) জন্য একটি বিশেষ শব্দকে বেঁধে দেন– যে শব্দটি সংশয়হীনভাবে কেবল ঐ বেঁধে দেয়া অর্থকেই বোঝাবে, অন্য কোন অর্থ বোঝাবে না। 'পরিভাষা' হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের কাছে হাতিয়ার স্বরূপ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক কথাকে ঠিকমত বোঝান; ইংরেজিতে যাকে বলে hiting the nail on the head। সাধারণ শব্দের সঙ্গে পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য এখানেই। সাধারণ প্রয়োগে একই শব্দ দিয়ে একাধিক ভাব প্রকাশ করা যায় আবার একাধিক শব্দ দিয়েও একটি মাত্র ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন– 'মাথা' শব্দটি দিয়ে বোঝান যায় গ্রামের মাথা, রাস্তার মাথা, চৌমাথা, দলের মাথা, মাথা খাওয়া, মাথা ধরা ইত্যাদি। এখানে 'মাথা' এই শব্দটি নানা অর্থে নানাভাবে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার প্রেম, ভালবাসা, সম্প্রীতি, সখ্য, হৃদ্যতা, প্রণয়, আন্তরিকতা শব্দগুলো প্রায় একই রকম ভাব বোঝানোর (শব্দগুলোর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য আছে তা যদি বিবেচনা না করি) জন্য এতগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পরিভাষার ঐ দুটো কোনটিই হবার উপায় নেই– 'পরিভাষা' বা 'পারিভাষিক শব্দ' একাধিক অর্থে যেমন ব্যবহৃত হতে পারবে না, তেমনি একাধিক ভাব নির্দেশের জন্য একই পরিভাষা ব্যবহৃত হতে পারবে না। যেমন, সমাস বলতে পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। তাই 'সমাস' বা 'কারক' বাংলা ব্যাকরণ শাস্ত্রের দুটি পারিভাষিক শব্দ। তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, যোগাযোগ, বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হয় অসংখ্য পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ।

পরিভাষা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত এমন বিশেষ কিছু শব্দ যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ধারণাকে যথার্থভাবে, নির্ভুলভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বা সংজ্ঞাকে পরিভাষা বলে।

মনে রাখবেন

পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ:

- সংক্ষেপে কোন বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করে;
- পন্ডিতগণের সম্মতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়;
- একটি মাত্র ভাবকেই কেবল প্রকাশ করে;
- একাধিক ভাবকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় না;
- মূলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলেও তার প্রযুক্ত অর্থই শব্দটির যথার্থ পারিভাষিক অর্থ।

পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ: সংক্ষেপে কোন বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করে; পন্ডিতগণের সম্মতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়; একটি মাত্র ভাবকেই কেবল প্রকাশ করে; একাধিক ভাবকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় না; মূলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলেও তার প্রযুক্ত অর্থই শব্দটির যথার্থ পারিভাষিক অর্থ।

প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিভাষার ভূমিকা কী? জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিভাষাগুলো পালন করে নানাবিধ ভূমিকা। কী সে ভূমিকা এবার আসুন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, জ্ঞানের চর্চা ও আলোচনার জন্য পরিভাষা তৈরি করে একটি বিশেষ ভাষারীতি; যা জ্ঞানচর্চাকারী বা আলোচনাকারীর কাছে বিষয়বস্তু অনুধাবনের ক্ষেত্রে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পরিভাষা জ্ঞান জাগতিক বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য এবং বিশেষায়িত করে তোলে। যেমন একজন ডাক্তার যখন 'টেনশন' বা 'প্রেশার' বলেন তখন যে অর্থে তিনি শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা হিসেবেই তিনি ব্যবহার করেন। কিন্তু একজন প্রকৌশলীর কাছে ঐ দুটো শব্দ প্রকৌশল বিদ্যার পারিভাষিক অনুষঙ্গে একই অর্থে ধরা দেয় না; প্রকৌশলী তাঁর নিজস্ব বোধ নিয়ে একটা বিল্ডিং বা একটা ব্রিজের 'টেনশন' বুঝবেন, বা পানির 'প্রেশার' বুঝবেন। একইভাবে, আমি বা আপনি চাহিদা বলতে যা বুঝি একজন অর্থনীতিবিদ কিন্তু সব সময় তা বোঝেন না। তাঁর অর্থনীতির আলোচনায় ঐ শব্দটি বিশেষ একটি ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে বলেই শব্দটির একটি বিশেষায়িত অর্থ তাঁর কাছে বর্তমান। এই যে শব্দের বিশেষায়ন এটা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি জ্ঞান জগতের প্রতিটি শাখার জন্য স্বতন্ত্র ভাষারীতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, পরিভাষা জ্ঞানের আলোচনাকে কৌশলগত দিক থেকে সরলীকরণ ও সংক্ষিপ্ত করে। যেমন একজন পদার্থবিদ তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় পরিভাষা ব্যবহার করে যত দ্রুত ও সংক্ষেপে তার বক্তব্য পাঠকশ্রেণীর কাছে

পৌঁছে দিতে পারেন, পরিভাষা ব্যবহার না করে তেমনটি সম্ভব হয় না; তবে এক্ষেত্রে তাঁর পাঠকশ্রেণীও কিন্তু সীমাবদ্ধ। তিনি যদি সাধারণ পাঠকের জন্য ঐ বিষয়টি লিখতে চান তবে তিনি পরিভাষা ব্যবহার না করে লিখতে গেলে অবশ্যই বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমেত তা লিখতে হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার লেখার আয়তন বেড়ে যাবে।

তৃতীয়ত, পরিভাষাগুলো মূলত এক একটি বোধের ধারক; ঐ-বোধ হয়ত সব সময় অন্যের কাছে সাধারণ ভাষায় যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা বা বোঝানো অসম্ভব। যেমন, সমাস কিংবা কারক এগুলো এক একটি বোধের ধারক। আপনি যদি বাংলা ভাষা সম্পর্কে সাধারণভাবে শিক্ষিত কাউকে ঐ শব্দদুটো বলেন তবে যত সহজে তাঁরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন তা হয়তো অন্য কোন ভাবেই অত দ্রুত ও যথার্থভাবে বোঝান সম্ভব নয়। সুতরাং জ্ঞান জগতে পরিভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

কিভাবে চিনবেন পারিভাষিক শব্দ

আজকাল আমরা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক পদে পদে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ সব পারিভাষিক শব্দ আপনি চিনবেন কি করে? একটু আগেই আমরা বলেছি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই রয়েছে কিছু নিজস্ব পারিভাষিক শব্দ। যে শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কথাবার্তায় তেমন প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু ঐ বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় শব্দটি যদি অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলেই বুঝতে হবে শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। মনে করুন আপনি সমাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তাহলে অবশ্যই 'পূর্বপদ', 'পরপর', 'সমস্যমান পদ', ব্যাসবাক্য এসব সাহায্য ছাড়া আপনি আলোচনাই করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ধরে নেবেন ঐ শব্দগুলো পারিভাষিক শব্দ।

সব সময় পারিভাষিক শব্দ আবার এতো সহজে চেনা যায় না। কারণ পারিভাষিক শব্দটির বহুল ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা। উকিল, মোক্তার, আবাসিক, অনাবাসিক এগুলো যে পারিভাষিক শব্দ তা আজ আর আমাদের মনেই হয় না। এ কারণে পারিভাষিক শব্দ চেনার জন্য আমাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত সতর্কতা। যখনই কোন পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবেন, শব্দটি একাধিকবার আবৃতি করে মনে গেঁথে নিন, প্রয়োজনে নোট খাতায় আপনার পরিচিত পারিভাষিক শব্দগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিভাষা কি? বাংলা পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পারিভাষিক শব্দ কীভাবে চেনা যায়?

২. প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এমন দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

নির্দেশ	মূলপাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন

পাঠ - ২

বাংলা পরিভাষার ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস জানতে পারবেন;*
- *বিভিন্ন ধরনের পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত হবেন;*
- *যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে জড়িত তাদের নাম বলতে পারবেন।*

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করতে গিয়ে যখন প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি পরিভাষার। প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী- একথাটি যেন পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো বেশী সত্যি। যে দেশ বা জাতি নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যত বেশী নিবেদিত তাদের জন্য পরিভাষার প্রয়োজন তত বেশী এবং তাঁরা তৈরি করেন বা করতে বাধ্য হন নতুন সব পরিভাষিক শব্দ। বিগত দুশো বছরে দেশী ও বিদেশী প্রশাসক, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে বাংলা পরিভাষা এবং এখনো সে চেষ্টা শেষ হয় নি। ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয় প্রথমে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গপ্রদেশে। শাসন যন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। ইংরেজি ভাষায় রচিত বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই অনুবাদকেরা অনুভব করেন পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা। এ জন্যই বলা যায়, আইন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলা পরিভাষা চর্চার সূত্রপাত। ১৭৮৪ সালে জনাথান ডানকান 'সপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম নামে' একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশ করেন। ঐ বছরকে বাংলা পরিভাষা নির্মাণের একক বা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূচনা বছর বলে বিবেচনা করা হয়। ডানকানের পর এডমন স্টোন, ফরস্টার, উইলিয়াম কেরী প্রমুখের অনুবাদের মাধ্যমে বৃটিশ ইংরেজি আইন বাংলায় রূপান্তর ঘটে। এই সব বিদেশীদের প্রয়োজনের হাত ধরেই বাংলা ভাষায় আইনের আলোচনায় পরিচিত হয়ে ওঠে হাকিম, আদালত, ইজারা, জজ, গয়রহ, তহশীল, তহশীলদার প্রভৃতি পরিভাষিক শব্দ। ইংরেজ অনুবাদকদের হাতে সৃষ্ট ঐ সব পারিভাষিক শব্দ এখন বাংলা ভাষার প্রায় নিত্য পরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছে। মাঝে মাঝে ঐ সব পারিভাষিক শব্দকে সাধারণ শব্দ বলে মনে হয়।

> *আইন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলা পরিভাষা চর্চার সূত্রপাত। ১৭৮৪ সালে জনাথান ডানকান 'সপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম নামে' একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশ করেন। ঐ বছরকে বাংলা পরিভাষা নির্মাণের একক বা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূচনা বছর বলে বিবেচনা করা হয়।*

এখন আমরা 'গভর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ তাবৎ আইন'(১৭৯৩) নামে ফরস্টার-কৃত একটি আইনের বাংলা অনুবাদ নমুনা হিসেবে উপস্থিত করছি। এই আইনটির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, এমন পারিভাষিক শব্দগুলো আপনারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন; তবে মনে রাখবেন এখানে যে গদ্যের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হবেন তা প্রায় দুশো বছরের বলে তা আপনাদের কাছে একটু খটোমটো, কোথাও বা গদ্য অশুদ্ধ বলেও মনে হতে পারে। আপনি নমুনা লক্ষ করুন :

> "হাকিমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষত: দুঃস্থ ও গরীবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়ের ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানে সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যাধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহার দিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।"

কি খুঁজে বের করতে পেরেছেন এখানে কি কি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? নিশ্চয়ই পেরেছেন। তবুও আমার সঙ্গে একটু মিলিয়ে নিন। এখানে যে সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল: হাকীম, মফস্বলী, তালুকদার, প্রজা, জমিদার, হুজুরী তালুকদার, মোকররী জমা ও ওজর।

ডানকানের অনুবাদের পর আইন বিষয়ক অন্য যে সব অনুবাদমূলক গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ড. রত্না ঘোষের অনুসরণে এখানে দেয়া হল:

১৭৮৫ : ডানকান-কৃত ‘দেওয়ানী আদালতের বিচার পরিচালনের নিয়মাবলী’।

১৭৯১ : এডমনস্টোন-কৃত‘বাংলা-বিহার-উরিষ্যার ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধির অনুবাদ’।

১৭৯২ : এডমনস্টোন-কৃত ‘বেঙ্গল ট্রানস্লেশন অফ রেগুলেশনস ফর দি গাইডান্স অফ দি ম্যাজিস্ট্রেটস’।

১৭৯৩ : ফরস্টার-কৃত শ্রীযুক্ত নবাব গভর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন’।

১৭৯৮ : কোলব্রুক-কর্তৃক জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন-সংকলিত ‘বিবাদ-ভঙ্গার্ণব’- এর অনুবাদ এ ডাইজেস্ট অব হিন্দুল অন কনট্রাকটস অ্যান্ড সাকসেশন’।

১৮৫৫ : উইলসন কর্তৃক ‘গ্লসারি অভ জুডিশিয়াল অ্যানড রিভিনিউ টার্মস’ প্রকাশ।

১৮৬০ : জন রবিনসন-কৃত ‘ডিকসনারী অভ ল অ্যানড আদার টার্মস’।

বাংলা ভাষায় ব্রিটিশ আইন অনুবাদের এই ধারা বেশ অনেক বছর চলেছিল। ঐ অনুবাদের সুবাদে বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলো ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিতি লাভের সুযোগ পেয়েছিল।

আইনের অনুবাদের মাধ্যমে পরিভাষা তৈরির যে সূচনা ঘটে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। তিনি বাংলাতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার কিছু অংশ বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ‘বিদ্যাহারাবলি’ নাম দিয়ে। তাঁর অপর মূল্যবান গ্রন্থ ‘ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা’ প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ঐ বইতে যে সব পরিভাষা তৈরি করেছিলেন সেগুলো এখনো আমরা ব্যবহার করছি। কয়েকটি উদাহরণ:

আইনের বাংলা অনুবাদ যে সব বিদেশীরা করেছেন তাঁরা কিন্তু পারিভাষিক শব্দের জন্য প্রধানত আরবি ও ফারসি শব্দের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের জন্য অনুবাদকেরা প্রধানত নির্ভর করেছেন সংস্কৃতমূল শব্দের ওপর। অক্ষয় কুমার দত্ত বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা তৈরিতে মনোযোগী হন।

Anatomn	ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা	Solid	ঘন
Muscle	মাংশ পেশী	Surgery	অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা
Nerve	নাড়ী	Vein	শিরা
Chemistry	রসায়ন	Neurology	শিরাবিদ্যা
Economics	অর্থশাস্ত্র		

উল্লেখ্য যে, আইনের বাংলা অনুবাদ যে সব বিদেশীরা করেছেন তাঁরা কিন্তু পারিভাষিক শব্দের জন্য প্রধানত আরবি ও ফারসী শব্দের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের জন্য অনুবাদকেরা প্রধানত নির্ভর করেছেন সংস্কৃতমূল শব্দের ওপর। ফেলিকস কেরীর পর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণে অন্য যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন, জন ম্যাক, পীটার বৃটন, পীয়ারসন প্রমুখ। বাঙালিদের মধ্যে যিনি প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা তৈরিতে মনোযোগী হন তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের তিনিই একমাত্র বিজ্ঞান মনস্ক সাহিত্যিক। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক যে চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলো হচ্ছে:

১. ভূগোল (১৮৪১); ২. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (প্রথমভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩); ৩. চারুপাঠ (প্রথম ভাগ ১৮৫৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯); ৪. পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬)। এ সব বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি তৈরি করেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ। তাঁর সৃষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের নমুনা এখানে দেয়া হল:

Magnet	চুম্বক	Compass	দিগ্‌দর্শন
Solid	কঠিন	Biology	প্রাণিবিদ্যা
Microscope	অণুবীক্ষণ যন্ত্র	Botany	উদ্ভিদ বিদ্যা
Telescope	দুরবীক্ষণ যন্ত্র	South pole	কুমেরু

Astrology	জ্যোতিষবিদ্যা	North pole	সুমেরু
Coral	প্রবাল	Solar Rainbow	সৌর রামধেনু
Coral Island	প্রবাল দ্বীপ	Mesmerism	মৈস্নারতত্ত্ব
Meteorological Office	মানমন্দির	Fog	কুজ্বটিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অধিকাংশই পরবর্তীকালে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে–আজো ব্যবহৃত হচ্ছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী দাস, রাজেন্দ্রলাল সিব, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশ চন্দ্র রায়, বি.এন.শীল, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলা পরিভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে এরং সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা।

শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই নয় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও বাংলা পরিভাষা প্রণয়ণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই। পরিভাষা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যোগ্য নেতৃত্বে একদল কৃতবিদ্য বাঙালি সম্মিলিতভাবে পরিভাষা তৈরির যে চেষ্টা করেছিলেন তা দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে (১৮৯৪-১৯৩৫) পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠন করে (১৯৩৪) বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে খন্ডে খন্ডে তা প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন করেন পরিভাষা সংসদ (১৯৪৮)। সংসদ বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা নির্মাণে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার ভাষা কমিটি (১৯৪৮), বাংলা একাডেমি (১৯৫৭), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৩), সরকারী শিক্ষা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলা পরিভাষা বহুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটিও (১৯৭৪) বাংলা পরিভাষা তৈরিতে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছে।

পরিভাষা তৈরি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ঘটছে নতুন নতুন শব্দের আর আমরা পরিচিত হচ্ছি সেসব শব্দের সঙ্গে, ফলে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে শব্দটির একটি বাংলা পরিভাষার।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন পরিভাষা তৈরি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ঘটছে নতুন নতুন শব্দের আর আমরা পরিচিত হচ্ছি সেসব শব্দের সঙ্গে, ফলে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে শব্দটির একটি বাংলা পরিভাষার। যখনই প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তখনই হয়তো আমরা তৈরি করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছি নতুন একটি পরিভাষা। সঙ্গে সঙ্গে যোগ হচ্ছে আমাদের ভাষায় একটি নতুন শব্দ এবং সবার অজান্তেই ভাষা হয়ে উঠছে সমৃদ্ধ।

মনে রাখবেন

বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা পরিভাষা প্রণয়ণের প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে জনাথান ডানকানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আইনের অনুবাদের পর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে অক্ষয়কুমার দত্ত অগ্রগণ্য। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঐ চারটি বইতে তিনি যে সব বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা এখনও সাদরে গ্রহণ ও ব্যবহার করে থাকি। অক্ষয়কুমার দত্তের পর ব্যক্তিগত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল সিম, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি যে সব প্রতিষ্ঠান পরিভাষা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছে সেগুলো হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা পরিভাষা তৈরির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আইন আদালতের সঙ্গে জড়িত দশটি পরিভাষা লিখুন।
২. বিজ্ঞান বিষয়ক দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

নির্দেশ	মূলপাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন

পাঠ - ৩

বাংলা পরিভাষা নির্মাণ কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *পরিভাষা নির্মাণের পূর্বশর্তগুলো বলতে পারবেন;*
- *পরিভাষা নির্মাণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *বাংলা পরিভাষা নির্মাণের পদ্ধতিগত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারাহিকতা প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে এবং বিস্তৃত হচ্ছে এর শাখা প্রশাখা; একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আগামীকালই হয়তো আমরা সেখানে থাকব না। পৃথিবী এগিয়ে যাবে এবং সে সঙ্গে তাল মেলাতে হবে আমাদেরও; পেছনে পড়ে থাকার কোন সুযোগ নেই, অবসরও নেই। জ্ঞান জগতের অধিকার কোন বিশেষ দেশের নয়, কোন বিশেষ জাতির নয়, কোন বিশেষ সময়ের নয়; তা সব দেশের, সব জাতির এবং সব কালের। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে সব ধরনের জ্ঞানেরই থাকে দুটো প্রান্ত, যার একদিকে অবস্থান করে ঐ- জ্ঞানের ক্লাসিক্যাল অংশ, যে অংশের কোন রূপ বা প্রকৃতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় না, যাকে বলা যায় ঐ বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তি; কিন্তু অন্য অংশের, যাকে বলা যায় জ্ঞানের প্রায়োগিক বা সমকালীন, তার পরিবর্তন বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিন ঘটে। গতকাল যা সত্য বলে প্রমাণিত ও অভিনন্দিত ছিল, নতুন গবেষণার তথ্য উপাত্তে তা হয়ে যায় পুরনো, কখনো বা বাতিল ও নিন্দিত। কোন বিষয়ের এই যে ক্ল্যাসিক্যাল অংশের কথা বলা হলো তার পরিভাষা প্রতিদিন নির্মাণের প্রয়োজন হয় না; একবার তা নির্মিত হয়ে সর্বস্তরে স্বীকৃতি পেলে কোন বিশেষ ভাষায় সেটাই হয়ে যায় সংযোজিত সুস্থির পরিভাষা। কিন্তু প্রতিদিনের চর্চায় ও প্রয়োগে বিষয়ের বা দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটে, তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বা তাকে আত্মস্থ করতে হলে পরিভাষা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সাধারণের কাছে তা কখনো গৃহীত হয়, কখনো হয় বর্জিত; কখনো সেটা অর্জন করে একটি উৎকৃষ্ট পারিভাষিক শব্দের মর্যাদা, কখনো বা শব্দটির সচেতন বর্জনের মাধ্যমে তা বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যায়।

সাধারণত পরিভাষা নির্মিত হয় দুটো ভিন্নতর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে; জ্ঞানের চর্চাকারী যাঁরা তাঁদের প্রয়োজনে পরিভাষা নির্মাণ করেন বা করতে বাধ্য হন এবং ক্রমশ সেটা অন্যান্যদের মধ্যে তা ব্যবহৃত হতে হতে এক সময় পরিভাষাটি সর্বসাধারণের কাছেও পৌঁছে যায়; সাধারণের কাছে তা কখনো গৃহীত হয়, কখনো হয় বর্জিত; কখনো সেটা অর্জন করে একটি উৎকৃষ্ট পারিভাষিক শব্দের মর্যাদা, কখনো বা শব্দটির সচেতন বর্জনের মাধ্যমে তা বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যায়। ব্যক্তিক প্রচেষ্টা ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেও পরিভাষা সৃষ্টি হতে পারে। ফ্রান্সে ফরাসি একাডেমি এ ধরনের কাজের জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে সম্মানিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফরাসিরা কোন শব্দ, কোন শব্দের অর্থ, উচ্চারণ এমনকি পরিভাষা কি হবে তার জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপে নির্ভর করে ফরাসি একাডেমির কর্তৃত্বের উপর, একাডেমি যে মতামত দেয় তা তাঁরা গ্রহণ করে প্রায় নির্দ্বিধায়। ইংরেজরা তেমনি ভাষা সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর লাভের ক্ষেত্রে নির্ভর করে অক্সফোর্ডের ওপর। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমি- এ ধরনের দুটো প্রতিষ্ঠান, যারা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা ধরনের প্রশাসনিক ও জ্ঞান জাগতিক পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও আজকাল এগিয়ে এসেছে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তাদের মতামত নিয়ে। তবে পরিভাষা প্রণয়ন ও এর প্রচলনের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন পরিভাষা টিকবে কি টিকবে না তা নির্ভর করে ভাষা ব্যবহারিকারীরা শব্দটিকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন বা করছেন তার উপর। যদি পরিভাষাটি সাধারণের কাছে সহজ বোধ্য এবং ব্যবহার উপযোগী

হয়ে ওঠে তবেই সেটি টিকে যায়, সেটা কোন প্রতিষ্ঠান না ব্যক্তি নির্মিত তা অবিবেচ্য। দেখা গেছে, অনেক বিখ্যাত লোকও যে সব পরিভাষা তৈরি করেছেন সাধারণ ভাষীরা তা গ্রহণ না করায় ক্রমশ তা হারিয়ে গেছে; আবার সাধারণের সৃষ্ট কোন পরিভাষা প্রয়োজনের পরীক্ষায় উতরে যাওয়ায় তা টিকে গেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় Advocate শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'অধিবক্তা' শব্দটি প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ শব্দটির পরিভাষা হিসেবে 'উকিল' শব্দটি সহজে গ্রহণ করায় 'অধিবক্তা' একেবারে হারিয়ে গেছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Resident এবং Non-Resident শব্দ দুটির পরিভাষা তৈরি করেছিলেন 'আবাসিক' ও 'অনাবাসিক'-এই চমৎকার দুটো পরিভাষা আমরা কিন্তু সহজেই গ্রহণ করে নিয়ে, আজও তা স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করে চলেছি। সুতরাং পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিভাষা তৈরির নিয়ম পদ্ধতি

নিয়ম: যে কোন পারিভাষিক শব্দেরই থাকতে হয় চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সে গুলো হচ্ছে, সর্বজন স্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থ, আড়ষ্টহীনতা। কিন্তু এই সব গুণ সম্পন্ন শব্দ তৈরি করতে হলে, যিনি পরিভাষা তৈরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই মেনে নিতে হয় ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো। তা ছাড়া ভাষা বিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও পরিভাষা সৃষ্টিকারীর থাকতে হয় পরিষ্কার ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই তিনি নির্বাচন করবেন এমন শব্দ যা সহজেই সমাজে গৃহীত হবে দুরূহ ও দুরুচর্চায় শব্দে পরিভাষা তৈরি হলে তা জনসাধারণের কাছে গৃহিত হয় না। তাছাড়া, আমরা আগেই বলেছি (পাঠ-১) যে শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে তার থাকবে সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে তাকে দ্বিতীয় কোন অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না।

যে কোন ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরন করে। পদ্ধতি তিনটি হলো- ঋণ, ঋণ অনুবাদ ও নির্মাণ।

পদ্ধতি: যে কোন ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরন করে। পদ্ধতি তিনটি হলো- ঋণ, ঋণ অনুবাদ ও নির্মাণ। আসুন আমরা ঐ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

১. **ঋণ:** পৃথিবীর সব ঋণেই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; একমাত্র ভাষার ঋণে মানুষ ধনী ও সমৃদ্ধ হয়। যে ভাষায় যতো বেশী ঋণকৃত শব্দ আছে সে ভাষা ততো সমৃদ্ধ। বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানে অন্য সবার মত বাঙালিরও সমান অধিকার আছে। তাই যে ভাষা থেকে আমরা জ্ঞান আহরণ করবো তার শব্দ, ভাব, প্রেরণা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। উগ্রস্বাদেশিকতা দ্বারা তাড়িত হয়ে হাউড্রো অক্সাইডকে 'অম্লজামূলক উদ্বায়ী গ্যাস', টেলিফোনকে 'দূরালাপনী', বুনসেন বার্ণারকে 'পিনাল-দাহক', ইনজেকশকনকে 'সূচিকাভরণ' না লেখাই সঙ্গত। আজকাল আমরা সবাই লোডশেডিং, চ্যারিটি বা ওয়ার্স-আপ ম্যাচ, বাস, স্টেশন, অক্সিজেন এসব পারিভাষিক শব্দ অপরিবর্তিত ভাবেই গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ এসব শব্দ আমরা ঋণ করে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছি এবং ঋণশোধ না করলেও কেউ কখনো তাগাদা দিতে আসবে না; বরং বাংলা ভাষাকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ করবে।

২. **ঋণ অনুবাদ:** পুরনো, ভুলে যাওয়া কোন বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। শব্দের আগের অর্থটা জানা থাকলে বা বহাল থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন অর্থটাই সবার কাছে পরিচিত পেয়ে, নতুন অর্থ ধারণ করে ফেলে। ঋণ অনুবাদ হতে পারে দু'ধরনের। সংস্কৃত বা দেশী এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ অর্থ একটিই কিন্তু শব্দ অনেক। এ ধরনের শব্দ গুলোর ভেতর থেকে একটি বেছে নিয়ে আমরা নতুন অর্থে প্রয়োগ করে গড়ে তুলতে পারি একটি পরিভাষা। 'বিজ্ঞান', 'ইতিহাস', 'পদার্থ' প্রভৃতি শব্দ এমন ধরনের ঋণ অনুবাদের উদাহরণ। বিজ্ঞান শব্দটি বোঝাতো বিশেষ জ্ঞান' - তা সে যে কোন জ্ঞানকেই বোঝাতো কিন্তু এখন science এর পরিভাষা হিসেবে আমরা বিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার করছি।

৩. **নির্মাণ:** শব্দ নির্মাণের মত পরিভাষা নির্মাণের বেলাতেও ভাষার মূল প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী–থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ হতে গৃহীত পরিভাষা -যেমন, 'দ্রাঘিমা', 'বিষুবরেখা', ল.সা.গু. (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক), গ.সা.গু(গরিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক) ইত্যাদি শব্দ পরিভাষা হিসাবে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বংলা পরিভাষা নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পরিভাষা নির্মাণের পূর্বশর্ত কী? আলোচনা করুন।

২. বাংলা পরিভাষা তৈরির নিয়মগুলো লিখুন।

নির্দেশ	মূলপাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

৮

অনুবাদ : ইংরেজি থেকে বাংলা

মানুষ শুধুমাত্র একটি ভাষা ব্যবহার করে না। সামাজিক, ধর্মীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য মানুষের ভাষায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাষার ভিন্নতার জন্য মানুষ প্রয়োজনানুযায়ী একাধিক ভাষা শিখে থাকে। একটি ভাষা থেকে অন্য একটি ভাষা শিখতে গেলেই অনুবাদের বিষয়টি সামনে চলে আসে। বর্তমান বিশ্বের ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজির গুরুত্ব অপরিসীম। অনুবাদ সম্পর্কিত ধারণার পাশাপাশি ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের বিষয়টি সে জন্য এ ইউনিটে আলোচিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ ১. অনুবাদ : ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা
- পাঠ ২. ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ/কৌশল
- পাঠ ৩. নির্ধারিত পাঠের ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

পাঠ - ১

অনুবাদ-ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- *অনুবাদ বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন।*
- *কেন অনুবাদ করা দরকার তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*
- *অনুবাদ সাধারণত কত রকম হতে পারে তা লিখতে পারবেন।*
- *একজন অনুবাদকের করণীয় নির্দেশ করতে পারবেন।*
- *ব্যবহারিক জীবনে অনুবাদের গুরুত্ব বিবৃত করতে পারবেন।*

কোন ভাবকে এক ভাষা থেকে অন্যভাষায় ব্যক্ত করা হয় অনুবাদের মাধ্যমে। সেদিক থেকে অনুবাদকে ভাবের ভাষান্তরও বলা চলে। আসলে কোন ভাবের মৌলিকত্ব বজায় রেখে ভাষিক রূপান্তরকেই অনুবাদ বলা হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুটো ভাষার সংশ্লিষ্টতা জরুরি। আর যা আবশ্যক তা হলো একটি ভাব। মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। এই ভাবকে অনুবাদের মাধ্যমে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব।

পৃথিবীতে বহু ভাষায় মানুষ কথা বলে। এক একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা এক-এক রকম। তাদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছেদের মতো ভাষারও কোন মিল নেই। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষের প্রবণতা একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এই মনের ভাব এক মানুষ থেকে ভিন্নভাষী অন্য মানুষের অনুবাদের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হতে পারে। অনুবাদ কোন নির্দিষ্ট ভাষার জন্য নয়। যে কোন ভাষা থেকে অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ হতে পারে। এ-কারণে অনুবাদের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তবে অনুবাদে ভাবের আনুগত্য জরুরি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে দুয়ের অধিক ভাষায় সংশ্লিষ্টতা এসে যায়। ধরা যাক, কোন একটি নাটক গ্রীক ভাষা থেকে প্রথমে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হল এবং ঐ নাটকটিই ইংরেজি থেকে পরে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হল। এখানে আমরা লক্ষ করি, নাটকটি অনুবাদের অনুবাদ হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে। এক্ষেত্রে একটি মধ্য-ভাষা বা তৃতীয়-ভাষা কার্যকর; এবং তা হলো ইংরেজি। এই তৃতীয় বা মধ্য-ভাষা অনেক সময় একাধিক হতে পারে। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে অনুবাদ প্রায়ই মূল থেকে দূরে সরে আসে। এ ধরনের অনুবাদকে দূরবর্তী অনুবাদ বলা হয়। এ জন্যে অনুবাদে উল্লিখিত তৃতীয় বা মধ্যভাষার উপস্থিতি যতো কম হবে ততোই অনুবাদ হবে মূলানুগ।

অনুবাদ সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে: মূলানুবাদ, মৌলিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ।

অনুবাদ সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে: মূলানুবাদ, মৌলিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। কোন বক্তব্য বা গ্রন্থের তথ্য, তত্ত্ব এবং পরিচ্ছেদ-বিভাজন ও গঠনের কোন ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে যে অনুবাদ করা হয়, তাকেই বলা হয় মূলানুবাদ। বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই অনুবাদ দেখা যায়। মৌলিক অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক মূল বিষয়ের বক্তব্য অক্ষুণ্ন রেখে নিজের সৃজনশীলতা ও পরিশীলনের স্বাক্ষর রাখবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি মৌলিক অনুবাদের সার্থক উদাহরণ। অন্যদিকে বক্তা বা গ্রন্থকারের ভাবকে অবিকৃত রেখে অনুবাদক নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজস্ব উপস্থাপনায় যে অনুবাদ করেন তা-ই হলো ভাবানুবাদ। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ অধিক প্রার্থনীয়। অন্যক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্টতা নেই।

তবে অনুবাদে যথার্থতা ও সৌন্দর্য এই দুই লক্ষণ একত্রে রক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রায়শ দেখা যায়, অনুবাদ যথার্থ হলে তার সৌন্দর্য থাকে না; আবার সুন্দর হলে যথার্থতা হারায়। তবে সাধারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল রচনার বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে ভাষিক চলমানতা রক্ষা করতে পারলে অনুবাদ হয়ে

ওঠে জীবন্ত। এক্ষেত্রে অনুবাদকের ভাষাজ্ঞান জরুরি। অনুবাদে যে দুটি ভাষার সংশ্লিষ্টতা থাকবে– উভয় ভাষাতেই অনুবাদকের পাণ্ডিত্য থাকতে হবে। কোন বিষয়ে নিজের ধারণার অস্পষ্টতা দূর করতে তিনি অভিধানের শরণাপন্ন হতে পারেন। অনুবাদককে মূলপাঠটি একাধিকবার পড়তে হবে এবং তা সহজবোধ্য ও স্বাভাবিকভাবে অনুবাদ করার ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এর পর তিনি অনুবাদের কাজে হাত দেবেন।

আজকের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের যুগে মানুষ বেশি বহির্মুখী হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর এক কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা দর্শনভাবনা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অন্য প্রান্তের মানুষকে আলোড়িত করছে। আর এ কারণেই মানুষ অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিন্তায় নিজেকে শাণিত করতে সক্ষম হচ্ছে। অনুবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও দর্শনচিন্তার যে বিকাশ ঘটছে তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক যুগেই যে এ কার্য সাধিত হচ্ছে তা নয়। চিন্তা বা ভাবপ্রবাহে ভাষা যখন প্রধান সমস্যা হয়ে ওঠে–অনুবাদ তখন সমাধানের পথ দেখায়। উনিশ শতকের শুরুতে বঙ্গদেশে ইংরেজ পাদ্রীরা আগমন করেন। ধর্ম প্রচারের জন্যে। সাধারণ বাঙালিদের বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় দখল না থাকায় ইংরেজ পাদ্রীরা বাইবেল বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজে হাত দেন। অনূদিত বাইবেল পাঠ করে সাধারণ বাঙালি সে-দিন খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। এ-শুধু বাইবেল বা খ্রিষ্ট ধর্মের ব্যাপারে নয়। ভারতীয় প্রাচীন দুই মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' সহ সংস্কৃতভাষায় রচিত বহুগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে সাধারণ বাঙালির পক্ষে এগুলোর রসাস্বাদান সহজ হয়েছে। পারসি ভাষা না জেনেও পারসি কবি ওমর খৈয়াম বা হাফিজের বিখ্যাত কবিতাগুলো বাংলায় ভাষান্তরের মাধ্যমে এর ভাব ও সৌন্দর্য অনুধাবন করা গেছে। আজ ল্যাটিন আমেরিকা বা ফ্রান্স অথবা আফ্রিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের শ্রেষ্ঠ আধারগুলো অনুবাদের ফলেই বহুভাষা না জেনেও সহজে আত্মস্থ করা সম্ভব। অনুবাদের কল্যাণের জন্য আনাতোলে ফ্রাসেঁ বা জ্যাক দেরিদার রচনা পাঠ করার জন্যে ফরাসি ভাষা না শিখলেও চলে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ব্যবহারিক জীবন উন্নতর বিজ্ঞানমুখী মানসগঠন করতে হলে আধুনিকতর জ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিচয় হওয়ার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে অনুবাদ নিঃসন্দেহে প্রধান সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন মানুষের পক্ষে যেহেতু পৃথিবীর সব ভাষা শেখা সম্ভব হয়ে উঠে না, তাই অনুবাদই হতে পারে একজন জ্ঞানানুসন্ধানী মানুষের প্রকৃত সহযোগী। আর যিনি অনুবাদ করে থাকেন, সেই অনুবাদক থাকেন এর আড়ালে, অনেকটা সূত্রধরের মতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অনুবাদের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অনুবাদ বলতে কি বোঝেন?
২। একজন অনুবাদকের করণীয় নির্দেশ করুন।
৩। ব্যবহারিক জীবনে অনুবাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ২

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

- *ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় কতিপয় দিক সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।*

বাংলা ও ইংরেজি উভয়ই জীবন্ত ভাষা এবং ভাবপ্রকাশের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই দুটো ভাষার পৃথক শব্দভাণ্ডার এবং বাক্যিক উপাদান ও কাঠামো রয়েছে। এ কারণে এর একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্য সচেতনতা জরুরি। উপরন্তু উভয় ভাষারই রয়েছে নির্দিষ্ট ব্যাকরণরীতি। অনুবাদের সময় অনুবাদককে সে-ব্যাপারে অধিক সচেতন থাকতে হয়। নিচে ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষণীয় কতিপয় দিক উল্লেখ করা হলো:

কাঠামোগত দিক

- প্রচুর বাংলা ও ইংরেজি শব্দ আয়ত্বকরণ
- একটি ইংরেজি শব্দের সর্বাধিক বাংলা প্রতিশব্দ শেখা
- মূল ইংরেজি পাঠটি একাধিকবার পড়া এবং তার ভাব বা মর্ম উদ্ধার করা
- ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের ক্ষেত্রে যথাযথ বাংলা পরিভাষা ব্যবহার; অন্যথায় উদ্ধৃতচিহ্নে ওই শব্দের ইংরেজি উচ্চারণ লিখা।
- ইংরেজি বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রে সঠিক বাংলা বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন খুঁজে বের করা
- অনুবাদের সময় বাংলায় সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ না ঘাটানো।

অভ্যন্তরীণ দিক

- ইংরেজি বাক্যে verb উহ্য থাকে না, কিন্তু বাংলা গঠনে 'আছে', 'যায়', 'হয়' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যেমন: Sultana is a good girl. এর বঙ্গানুবাদ: সুলতানা ভালো মেয়ে। এখানে ধ্র-এর বাংলা 'হয়' উহ্য।
- A অথবা An verb এবং Compliment অংশ হলে বঙ্গানুবাদে তা উল্লেখ করার দরকার হয় না। যেমন: Poet Mohitlal Majumdar was a teacher of department of Bengali of University of Dhaka. এর বঙ্গানুবাদ: কবি মোহিতলাল মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এখানে 'একজন শিক্ষক ছিলেন' লেখার প্রয়োজন নেই।
- ইংরেজি বাক্যের শুরুতে Introductory it বা there থাকলে এর শাব্দিক বঙ্গানুবাদ হয় না। যেমন: It's good run. এর বঙ্গানুবাদ: সন্তোষজনক রান (ক্রিকেটে)। অথবা, There was fifteen students in the library. এর বঙ্গানুবাদ: লাইব্রেরিতে পনেরজন ছাত্র ছিল।

- সকর্মক ক্রিয়ার পর ইংরেজি বাক্যে verb বসে, কিন্তু ক্রিয়ার পর বাংলায় কর্ম বসে। যেমনঃ Hasna has a nice pen-এর বঙ্গানুবাদঃ হাসনার একটি চমৎকার কলম আছে। যদি ইংরেজি বাক্যের গঠন অনুসারে 'হাসনার আছে একটি চমৎকার কলম'– এমন অনুবাদ করা হয়, তা হবে বাংলা বাক্য গঠনরীতি অনুসারে ভুল।

- ইংরেজি জটিল বাক্যকে একাধিক সরল বাংলা বাক্যেও অনুবাদ করা চলে। যেমনঃ Rabindranath was a great poet, who wrote "Gitanjali" and also novel of 'Shesher Kabita'. এর বঙ্গানুবাদ তিনটি সরল বাক্যে করা যায়। যথাঃ রবীন্দ্রনাথ মহান কবি ছিলেন। তিনি 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেন। ' শেষের কবিতা' উপন্যাসও তাঁর রচনা।

- বাংলায় পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার কম, শ্রুতিমধুরও তেমন নয়। ইংরেজি Psssive Voice -এর অনুবাদের ক্ষেত্রে তাই বাংলা কর্তৃবাচ্য ব্যবহার করাই ভালো। যেমনঃ The work is done by Mr. Goldsmith.- এর হুবহু বঙ্গানুবাদঃ 'মি. গোল্ডস্মিথ কর্তৃক কাজটি কৃত হয়েছে।' কিন্তু 'মি. গোল্ডস্মিথ কাজটি করেছেন'-এরূপ অনুবাদই অধিক শ্রুতিমধুর এবং শোভন।

- বাংলায় একটি সরল বাক্যেই অনেক সময় ইংরেজি যৌগিক বা জটিল বাক্যকে অনুবাদ করা চলে। সে ক্ষেত্রে অনুবাদটি অনেক বেশি প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর হয়।

যেমন, Opi will go to field and play cricket. এর বঙ্গানুবাদঃ 'অপি মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলবে' এই অনুবাদ করাই সঙ্গত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ কৌশল সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের সময় কাঠামোগত কোন কোন দিকে বিশেষ সচেতন থাকতে হয় লিখুন।

২. ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদকালে বাক্যের অভ্যন্তরীণ যে দিকগুলোর প্রতি নজর রাখতে হয় তার কয়েকটি লিপিবদ্ধ করুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

নির্ধারিত পাঠের ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

- *ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।*
- *নির্দিষ্ট অনুবাদগুলো নিজেই লিখতে পারবেন।*
- *এই রীতি অনুসারে ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ অনুশীলন করতে পারবেন।*

১. Best Books introduce us into the society. They bring us into the presence of the greatest minds, that have ever lived, we hear what they said and did, we see them as if they said and did, we see them as if they were really alive. We are participators in their thoughts, we sympathies with them, grieve with them and we feel as if were in a measure actors in scenes which they describe. The great and the good do not die, even in this world.

বঙ্গানুবাদঃ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। সেগুলো আমাদেরকে চির অমর ও মহৎ মনের সান্নিধ্যে এনে দেয়। তাঁর কি করেছিলেন ও বলেছিলেন সে সব আমরা শুনতে পাই এবং দেখি যেন তাঁরা জীবন্ত। আমরা তাঁদের চিন্তাধারায় অংশ গ্রহণকারী, তাঁদের সঙ্গে সমব্যথী, তাঁদের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই এবং আমরা অনুভব করি যে তাঁদের বর্ণিত দৃশ্যগুলোতে যেন অভিনয় করছি। এ পৃথিবীতে সুন্দর ও মহত্ত্বের মৃত্যু নেই।

২. As Ceaser loved me. I weep for him. As he was Fortunate. I rejoice at it. As he was valiant, I honor him; but as he was ambitions, I slew him.

বঙ্গানুবাদঃ সিজার আমাকে ভালোবাসতেন। তাই তার জন্যে আমি কাঁদি। যেহেতু তিনি ছিলেন ভাগ্যবান, তাই আমি উল্লসিত। তিনি সাহসী ছিলেন বলে আমি তাঁকে সম্মান করি। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ছিলেন বলে আমি তাঁকে হত্যা করেছিলাম।

৩. A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country they are fighting for.

বঙ্গানুবাদঃ যে দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্যে কাজ করে এবং এর জন্যে লড়তে ও মরতে ইচ্ছুক সে-ই দেশপ্রেমিক। প্রতিটি সৈন্য তার কর্তব্য পালনে বাধ্য, কিন্তু সর্বোত্তম সৈন্যরা তার চেয়ে বেশি কিছু করে থাকে। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে। তারা দেশকে ভালোবেসেই দেশের জন্যে যুদ্ধরত।

৪. No person can be happy without friends. The heart is formed for love and cannot be happy without the opportunity of giving and receiving affection. But you cannot receive affection unless you also give it.

বঙ্গানুবাদঃ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কোন লোকই সুখী হতে পারে না। হৃদয় গঠিত হয়েছে ভালোবাসার জন্যে এবং স্নেহের লেনদেন ছাড়া তা সুখী হতে পারে না। যদি স্নেহ না দাও, তবে তা তুমি পেতে পার না।

৫. Rivers come to our use in many ways. We bathe in the water of the river. We drink it and use it in many ways for agriculture with the help of irrigation.

বঙ্গানুবাদ: নদ-নদী নানাভাবে আমাদের প্রয়োজনে আসে। আমরা নদীর পানিতে গোসল করি। এই পানি পান করি এবং সেচের সাহায্যে কৃষির নানা কাজে ব্যবহার করি।

৬. The life of a student is a life of preparation for the struggle of life. To make him well-fitted for struggle, education is necessary. Students of today will lead the nation tomorrow. But if their education is not complete, would they be to lead the country to peace and prosperity?

বঙ্গানুবাদ: ছাত্রজীবন হচ্ছে জীবনসংগ্রামের প্রস্তুতিকাল। তাকে জীবনযুদ্ধের জন্যে সুযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা অত্যন্ত দরকার। আজকের ছাত্রসমাজই ভবিষ্যতে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু তাদের শিক্ষা যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তবে কি তারা দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে?

৭. A garden is not a source of beauty only. It is also a source of income. A home without any garden looks bare and poor. A garden is useful for other purpose too.

বঙ্গানুবাদ: বাগান শুধু সৌন্দর্যেরই উৎস নয়। এটি আয়েরও উৎস। বাগানশূন্য কোন বাড়ীকে নগ্ন ও শ্রীহীন দেখায়। অন্যান্য কাজের জন্যেও বাগান দরকারী।

৮. The world is like a looking glass, if you smile, it smiles, if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass all seem red and rosy, if through a blue, all blue, if through a smoked one all dull and dirty.

বঙ্গানুবাদ: পৃথিবীটা যেন দর্পণতুল্য। আপনি যদি হাসেন, পৃথিবীও হাসবে; যদি ভ্রুকুটি করেন, পৃথিবীও পাল্টা ভ্রুকুটি করবে। আপনি যদি একটি লাল গ্লাসের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখেন তবে সব কিছু লাল আর গোলাপী মনে হবে। যদি নীল কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকান, তবে সব নীল মনে হবে। যদি ধোঁয়াটে কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকান তবে সব কিছু ঝাপসা ও মলিন লাগবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

নিম্নোক্ত ইংরেজি অংশের বঙ্গানুবাদ লিখুন:

a. Students have youth and energy. They are filled with high ideals. They are free from the responsibility of maintaining families. So it is easy for them to devote themselves to social service besides their normal duty of acquiring knowledge.

b. A newspaper is storehouse of knowledge. We can know the condition, manners, customs of other countries of the world from a newspaper. It is, infect, the summary of all current history.

C. The sun looks like a dise. But it is much bigger than the earth. The sun gives us heat. The moon is much smaller than the sun.

d. You must remember that there are more people looking for employment than there are opportunities for employment. ManÕs dignity depends on his will and ability to work.

e. Walking is best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their body function as long as they live. On the other hand, Gymnastic exercises are best suited to young people only.

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

নিচের ইংরেজি অংশের বাংলায় অনুবাদ করুন:

Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our work from our boyhood. Boyhood is the seed time. The habit formed at this time will continue all through our life. "Everything at the right time" should be our motto.

নির্দেশ	উত্তরগুলো নিজে লিখুন। প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সাহায্য নিন।

৯

পত্র রচনা

একজন মানুষ অপর একজন মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নানা মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির জন্য মানুষের যোগাযোগ মাধ্যমেরও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ গাছের পাতা, ভূর্জপত্র, গাছের ছাল, চামড়া কিংবা ধাতব পাত্রে লিখতো। এই পাত্র, পাতা বা পত্রে লেখা হতো বলে এর নাম 'পত্র'। আধুনিককালে যা চিঠি নামে পরিচিত। বিষয়বস্তু ও কাঠামো অনুসারে পত্রের ভিন্নতা আছে। এ ইউনিটের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীবৃন্দ পত্রলিখন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ ১. পত্র রচনা-ভূমিকা, প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা
- পাঠ ২. ব্যবহারিক পত্র ও দলিল রচনার কৌশল
- পাঠ ৩. সংবাদপত্রে পত্র রচনার কৌশল
- পাঠ ৪. স্মারকলিপি, মানপত্র ইত্যাদি রচনার কৌশল

পাঠ - ১

পত্র রচনা - ভূমিকা, প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *পত্র বলতে কি বোঝায়, তা বলতে পারবেন।*
- *পত্রের প্রকারভেদ বিবৃত করতে পারবেন।*
- *পত্ররচনার কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।*
- *পত্র লেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।*

সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনে একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ রাখতে হয়। এই যোগাযোগের একটি মাধ্যম হলো পত্র। প্রাচীনকালে মানুষ গাছের পাতা, ভূর্জপত্র, গাছের ছাল, চামড়া বা ধাতব পাত্রে লিখতো। এই পাত্র, পাতা বা পত্রে রচনা হতো বলে এর নাম 'পত্র'; আধুনিককালে যা 'চিঠি' নামেও পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক জীবনে দূরের কোন ব্যক্তির সঙ্গে ভাব বা সংবাদ আদানপ্রদানের জন্যে লিখিত সামগ্রীকেই পত্র বলা হয়। আজ টেলিফোন ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে চিঠিপত্রের ব্যবহার হ্রাস পেলেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মোটেই কমে নি। এক সময় এই চিঠিপত্রই হয়ে উঠেছিলো দূরের মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। কিছুদিন আগেও অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে পত্র প্রেরণ করার পরও মৌখিকভাবে অনুরোধ করা না হলে প্রাপক মনঃক্ষুণ্ন হতেন। আজ অবশ্য এর উল্টোটি দেখা যায়। নিকটজনও অনুষ্ঠানাদিতে চিঠি না পেলে অসম্মানিত বোধ করেন; গলবস্ত্রে অনুনয় করেও তার ক্রোধ নির্বাপন করা যায় না। অতএব, বোঝা যাচ্ছে, আজকের এই ইলেক্ট্রনিক যুগেও চিঠিপত্রের গুরুত্ব কম নয়। এ কারণেই পত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও কাঠামো অনুসারে পত্রকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ব্যক্তিগতপত্র, ব্যবহারিক পত্র, বাণিজ্যিক পত্র।

তাছাড়া এখনো আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিফোন বা ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম পৌঁছে নি। এ অবস্থায় নিকটাত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পত্র লিখাই অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। বিষয়বস্তু ও কাঠামো অনুসারে পত্রকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১) ব্যক্তিগত পত্র ২) ব্যবহারিক পত্র ৩) বাণিজ্যিক পত্র।

মানুষ তার বিচিত্র কর্মকান্ডে যে পত্র রচনা করেন, তা উপরিউক্ত তিন ধরনের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পত্রে সাধারণত দুটো পক্ষ থাকে : প্রেরক ও প্রাপক। 'প্রেরক'-এর দিক থেকে চিঠি 'প্রাপক'-এর অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। পত্ররচনার সময় তাই পত্রে প্রাপক ও প্রেরকের নাম ও ঠিকানা থাকা আবশ্যক। প্রতিটি পত্রকে একটি লিখিত দলিলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর একটি কাঠামোগত শৃঙ্খলা বা অঙ্গ-বিন্যাস রয়েছে। ছয়টি অংশ নিয়ে কোন চিঠির কাঠামোগত পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে:

১. পত্রপ্রেরকের নাম, ঠিকানা ও তারিখ
২. সম্বোধন/সম্ভাষণ
৩. প্রেরকের বক্তব্য
৪. প্রেরকের নিবেদন
৫. প্রেরকের স্বাক্ষর
৬. পত্র প্রাপকের নাম ও ঠিকানা

নিচে একটি চিঠির অঙ্গ-বিন্যাস দেখানো হলো:

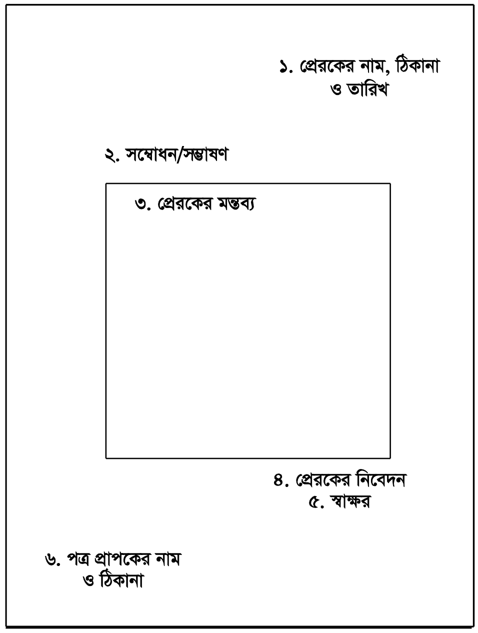

বিষয়বস্তু অনুসারে যেমন পত্রের বিভক্তি রয়েছে তেমনি এর অভিবাদন বা সম্বোধন এবং নিবেদন বা ইতিকরণ রীতিও পৃথক। নিচে বিভিন্ন পত্রের অভিবাদন ও পত্রশেষে 'ইতি' করার রীতি উল্লেখ করা হলো:

প্রাপক	অভিবাদন/সম্বোধন	প্রেরকের নিবেদন/ইতি
১. আত্মীয় স্বজন		
ক. বয়ো:জ্যেষ্ঠ	পাক জনাবেষু, শ্রীচরণেষু, শ্রদ্ধেয় আব্বাজান, প্রিয় বাবা, প্রিয় মা, শ্রদ্ধাভাজন কাকিমা, প্রিয় খালামণি ইত্যাদি	আপনার স্নেহের, স্নেহধন্য, স্নেহসিক্ত, স্নেহের ইত্যাদি
খ. বয়ো:কনিষ্ঠ	কল্যাণীয়াসু, স্নেহভাজনেষু, প্রিয় কমল, স্নেহের ভাই স্বপন, আদরের বোন আমার ইত্যাদি	দোয়াসহ, আশীর্বাদান্তে, স্নেহাশিসহ, আদরসহ ইত্যাদি
২. বন্ধু - বান্ধব	বন্ধুবরেষু, হৃদিসরোসিজ, প্রিয় বন্ধু, বন্ধু আমার, প্রাণের দোসর ইত্যাদি	প্রীতিমুগ্ধ, তোমার প্রীতিধন্য, তোমার অভিন্নহৃদয়, তোরই., ইত্যাদি
৩. অল্পপরিচিত/ অপরিচিত ব্যক্তি/ সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রমুখ	মি. মজুমদার, জনাব, মহোদয়, প্রিয় সম্পাদক ইত্যাদি	আপনার গুণমুগ্ধ, আপনার বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত, ধন্যবাদসহ ইত্যাদি
৪. অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক	মাননীয়, বরাবর ইত্যাদি	আপনার অনুগত ছাত্র, আপনার বাধ্যগত ছাত্রী ইত্যাদি
৫. বাণিজ্যিক/প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্তব্যক্তি	বরাবর, মাননীয় ইত্যাদি	ধন্যবাদসহ, নিবেদন, শুভেচ্ছাসহ ইত্যাদি।
৬. যাদের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি মানপত্র, অভিনন্দনপত্র	একই পত্রে বহু সম্বোধন থাকবে: হে বিদায়ী, হে কর্মবীর, হে মহান, হে শিক্ষাগুরু ইত্যাদি	আপনার স্নেহসিক্ত, আপনার গুণমুগ্ধ, আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী ইত্যাদি।

পত্র রচনার পর তা প্রাপকের কাছে প্রেরণের জন্যে বাহক অথবা ডাক বিভাগ বা কুরিয়ার সার্ভিসের শরণাপন্ন হতে হয়। এক্ষেত্রে পত্রের মোড়ক বা খামের উপর প্রাপক ও প্রেরকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখিত থাকা বাঞ্ছনীয়। খামের বাম দিকে প্রেরক ও ডানদিকে প্রাপকের নাম ঠিকানা লিখা উচিত। অবশ্য ইদানিং ডাক টিকেট সংযুক্ত পৃষ্ঠায় প্রাপক ও অপর পৃষ্ঠায় প্রেরকের নাম ও ঠিকানা লিখার নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। প্রাপক ও প্রেরক উভয়ের ঠিকানায় পোষ্টকোড নম্বর লিখা দরকার। খামে ঠিকানা লেখার নমুনা:

প্রচলিত নিয়ম

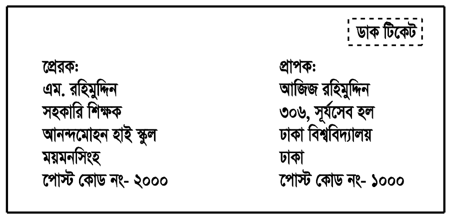

সাম্প্রতিক নিয়ম

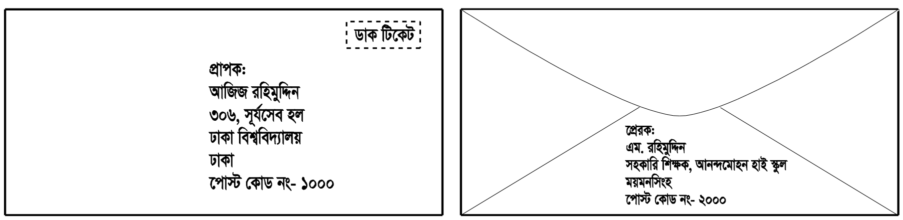

পত্ররচনার সময় স্মরণযোগ্য কয়েকটি বিষয়:

১. কোন পত্ররচনার আগে প্রেরককে মনে রাখতে হবে কার উদ্দেশ্যে পত্ররচনা এবং কেন। এতে পত্রের বিষয়বস্তু স্পষ্ট হবে।

২. সহজ সরল ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করাই হলো সর্বোত্তম পন্থা।

৩. পত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলো হবে সহজ সরল ও যথাযথ। প্রথাগত কোন পত্রে অপভাষা বা দুর্বোধ্য এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয় যার অর্থ উদ্ধার করতে প্রাপককে অভিধানের আশ্রয় নিতে হয়।

৪. ব্যক্তিগত পত্রে প্রেরকের আবেগময় ভাষা ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপনের স্বাধীনতা থাকলেও এর পরিসীমা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৫. বাণিজ্যিক পত্র লেখার ব্যাপারে ভদ্র ও মোলায়েম উপস্থাপনা হতে হবে। তবে ‘অতি বিনয়’ বা বাড়াবাড়ি করলে চলবে না। যেমন: ‘ভি.পি. করে বইগুলো প্রেরণ করলে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে চিরদিন আবদ্ধ থাকবো।’ - এ রকম বাক্য ব্যহার অনুচিত। লিখতে হবে : ‘অনুগ্রহপূর্বক ভি.পি. করে বইগুলো পাঠাবেন।’

৬. চিঠির প্রাপককে যদি প্রেরকের জন্যে কোন রকম শ্রম বা কষ্ট স্বীকার করতে হয়, চিঠিতে প্রেরক বুঝিয়ে দেবেন এ জন্যে তিনি কৃতজ্ঞ। এ কারণে তিনি প্রাপককে লিখতে পারেন : ‘আপনাকে বিব্রত করার জন্য আমি দু:খিত’, ‘যদি এ কষ্ট স্বীকার করেন, তাহলে আমার খুব উপকার হয়’ ইত্যাদি।

৭. হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। বানানশুদ্ধতা ও যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পত্র রচনা কাকে বলে? পত্র রচনার প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পত্র বলতে কি বোঝেন?
২. পত্র কত প্রকার ও কি কি লিখুন?
৩. একটি পত্রের কাঠামোগত দিক বর্ণনা করুন।
৪. পত্ররচনার সময় স্মরণযোগ্য বিষয়গুলো কি কি লিখুন।
৫. পত্র লেখার প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ করুন।

নির্দেশ	প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

পাঠ - ২

ব্যবহারিক পত্র ও দলিল রচনার কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *ব্যবহারিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলো শনাক্ত করতে পারবেন।*
- *ব্যবহারিক পত্ররচনার কৌশল বিবৃত করতে পারবেন।*
- *ব্যবহারিক পত্ররচনার অনুশীলন করতে পারবেন।*

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে লিখিত পত্রকে ব্যবহারিক পত্র বলে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে লিখিত পত্রকে ব্যবহারিক পত্র বলে। এরূপ সাধারণত: ১) আমন্ত্রণপত্র ২) আবেদনপত্র ৩) দাপ্তরিকপত্র ৪) সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্র বা খোলাচিঠি ৫) স্মারকলিপি, মানপত্র, অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি।

ব্যক্তিক, সমষ্টিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে লিখিত এ চিঠিগুলো প্রধানত একমুখী। সাধারণত প্রেরকের পত্রোত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে না। এ পত্রগুলো তথ্যবহুল ও আবেগহীন ভাষার রচিত হয়ে থাকে। এই ধরনের চিঠি যেমন: আমন্ত্রণপত্র, আবেদনপত্র ও দাপ্তরিকপত্রের আকার সংক্ষিপ্ত হয়।

উল্লিখিত রূপভেদ ছাড়াও চুক্তিপত্র, ক্ষতিপূরণ দাবি সংক্রান্ত, গৃহীত ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে লেখা পত্র বা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত চিঠিপত্রও ব্যবহারিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এসব চিঠি একবারের জন্যে লেখা অথবা একমুখী হয়ে থাকে। এর উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন সাধারণত হয় না।

এ ধরনের চিঠিতে সহজ, সরল ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করতে হয়। কোন অপ্রচলিত বা অভিধান আশ্রিত কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা অনুচিত। ভাষা হবে আবেগহীন, প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রকাশে যথাযথ এবং যুক্তিপূর্ণ। অতি বিনয় বা অসৌজন্য প্রকাশ দুই-ই পরিত্যাজ্য। নিচে ব্যবহারিক পত্রের কয়েকটি নমুনা দেয়া হলো:

১. স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র।

সুধী,

আগামী ২৬ মার্চ ২০১৯, মঙ্গলবার, বিকেল চারটায় অরুণোদয় সংঘের পক্ষ থেকে সংগঠনের কার্যালয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের মহাসচিব জনাব চৌধুরী আবদুল হাই প্রধান অতিথি এবং শেরপুরের জেলা প্রশাসক জনাব নওফেল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সহৃদয় উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

নিবেদক-

তারিখ : ০৫ মার্চ ২০১৯

আজাহার আলী
সাধারণ সম্পাদক
অরুণোদয় সংঘ, শেরপুর

২. সেলস্‌ম্যান পদের জন্যে দরখাস্ত

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রংধনু এন্টারপ্রাইজ (প্রা.) লিমিটেড
মহাখালী, ঢাকা।

বিষয় : সেলস্‌ম্যান পদে নিযুক্তি লাভের জন্যে আবেদন।

মহোদয়,
দৈনিক কালস্রোত পত্রিকায় গত ১৫ মে ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন সূত্রে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে সেলস্‌ম্যান পদে চাকরি লাভের জন্যে আবেদন করছি। নিম্নে আমার প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করা হলো-

১.	নাম	:	কাঞ্চন চৌধুরী স্বপন
২.	পিতার নাম	:	তিতাস চৌধুরী
৩.	বর্তমান ঠিকানা	:	২৭/১ খাজে দেয়াল, বক্সিবাজার, ঢাকা
৪.	স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম ও ডাকঘর- পোয়াপুকুর, জেলা- চট্টগ্রাম-৪৮৩২
৫.	জন্ম তারিখ	:	১০ জুন ১৯৯২
৬.	জাতীয়তা	:	বাংলাদেশী
৭.	বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
৮.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	ক. মাধ্যমিক- কুমিল্লা বোর্ড, ২০০৮, জিপিএ ৪.২০ খ. উচ্চমাধ্যমিক- কুমিল্লা বোর্ড, ২০১০, জিপিএ ৪.১০ গ. স্নাতক (পাস)- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, ৩য় বিভাগ
৯.	অভিজ্ঞতা	:	গত দুই বছর যাবৎ 'কহিল এন্ড কোং' প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমান সেলস্‌ম্যান হিসেবে কর্মরত।

উল্লিখিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার প্রতিষ্ঠানে সেলস্‌ম্যান পদে নিয়োগদানের বিষয়টি সদয় বিবেচনা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক-
আপনার বিশ্বস্ত

তরিখ: ২২ মে ২০১৯
ঢাকা

(কাঞ্চন চৌধুরী স্বপন)

সংযুক্তি:
১. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি- ৩ ফর্দ
২. অভিজ্ঞতার সনদপত্র- ১ ফর্দ
৩. পাসপোর্ট সাইজের ফটো- ১ ফর্দ
৪. অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র- ১ ফর্দ

৩. টেলিফোন স্থানান্তরিত করার জন্যে দরখাস্ত

বরাবর

প্রধান প্রকৌশলী
টেলিফোন ভবন
ঢাকা।

বিষয়: ৯৬৩২৫১১ নং টেলিফোন স্থানান্তরিত করা প্রসঙ্গে।

মহোদয়

আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছি যে, আমি সম্প্রতি ২২, দীননাথ সেন রোড থেকে বাসা বদল করে ৪০৮/ক, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি সড়কে বসবাস করছি। টেলিফোন স্থানান্তরিত করার জন্য আমি ব্যাংকে নির্ধারিত ফিস জমা দিয়েছি এবং টাকা জমা দেয়ার রশিদ বর্তমান আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। সুতরাং আমার টেলিফোনটি (নং-৯৬৩২৫১১) নতুন ঠিকানায় যথাসম্ভব শীঘ্র স্থানান্তরিত করার জন্যে আপনাকে অনুরোধ জানাই।

আশা করি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদসহ-

তরিখ: ১৮ জুন, ২০১৯
ঢাকা

আপনার বিশ্বস্ত,

(মিসেস আকলিমা খাতুন)
৪০৮/ক, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক
ঢাকা-১০১২

৪. অবিক্রিত মাল ফেরৎ পাঠিয়ে চিঠি

স্বপন এন্টারপ্রাইজ
বকশিগঞ্জ, জামালপুর

স্মারক নং- ৪২৮/৯৯ তারিখঃ ৩০-০৮-২০১৮

প্রাপক

ম্যানেজার
হাটখোলা ট্রেডিং সেন্টার
ঢাকা।

বিষয় : অবিক্রীত মাল ফেরৎ প্রসঙ্গ

মহোদয়

বিগত ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরকৃত আমাদের উভয় প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক চুক্তিমত যে সব মাল (পৃথক পৃষ্ঠায় তালিকা সংযোজিত) আমাদের প্রতিষ্ঠানে অবিক্রীত পড়েছিল তা ৭৫, রামকৃষ্ঞ মিশন রোড, ঢাকার ট্রানস্পোর্টের মাধ্যমে গত ২৮-০৮-২০১৮ তারিখে আপনার নিকট ফেরৎ পাঠানো হয়েছে।

সুতরাং ফেরৎ দেয়া উক্ত মালের প্রাপ্তিস্বীকার করে একটি পত্র প্রেরণ এবং ঐ মালের টাকা আমাদের নামে জমা করার জন্যে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে, ইতি
আপনার বিশ্বস্ত,

ম্যানেজার
স্বপন এন্টারপ্রাইজ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যবহারিক পত্র ও দলিল রচনার কৌশল সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যবহারিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলো কি কি?
৩. কোন প্রতিষ্ঠানে 'অফিসার' পদে চাকরির আবেদন করে একটি দরখাস্ত লিখুন।

নির্দেশ	প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

পাঠ - ৩

সংবাদপত্রে পত্ররচনার কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *সংবাদপত্রের পত্র কাকে বলে, এর উত্তর দিতে পারবেন।*
- *সংবাদপত্রে পত্ররচনার কৌশলগুলো লিখতে পারবেন।*
- *সংবাদপত্রে পত্ররচনার অনুশীলন করতে পারবেন।*

সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্তে যে চিঠি লেখা হয় তাকে এক কথায় সংবাদপত্রের পত্র বলে। স্থানীয় সমস্যার প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ, জাতীয় কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কিংবা পত্রিকায় প্রকাশিত কোন সংবাদের প্রশংসা/নিন্দা ইত্যাদি এই পত্রের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। অর্থাৎ পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে লিখিত প্রতিকারমূলক, প্রতিবাদমূলক, অভাব-অভিযোগমূলক বা আলোচনমূলক চিঠিকে এই শ্রেণীর পত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পত্রিকায় পাঠানো পত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট কলামে ছাপা হয়। এই পত্রের নিচে সাধারণত প্রেরক বা লেখকের নাম ও ঠিকানা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় পত্রের দায়-দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদক বহন করেন না, পত্র লেখককেই এর দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা অনুচিত। এই পত্রের ভাষা হবে সংহত, আবেগবর্জিত ও সুলিখিত।

পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে প্রেরককে দুটি চিঠি লিখতে হবে। এর প্রথমটি, যে বিষয়কে তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে সবার দৃষ্টিতে আনতে চান সেটি। আর অন্যটি সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জ্ঞাপক চিঠি। প্রথম চিঠিটি লিখতে হবে নির্দিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে, তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণভাবে। এই ধরনের চিঠিতে প্রেরক বা লেখক কারো প্রতি কোন কটূক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে এমন অথবা আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে- এ জাতীয় কোন বিষয় নির্বাচন করতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, পত্রিকায় পাঠানো পত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট কলামে ছাপা হয়। এই পত্রের নিচে সাধারণত প্রেরক বা লেখকের নাম ও ঠিকানা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় পত্রের দায়-দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদক বহন করেন না, পত্র লেখককেই এর দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা অনুচিত। এই পত্রের ভাষা হবে সংহত, আবেগবর্জিত ও সুলিখিত। পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে মূল চিঠির সঙ্গে অতিসংক্ষেপে পত্রিকার সম্পাদকের বরাবরে আর একটি চিঠি লিখতে হবে। এখানে পত্রলেখক পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জানাবেন, যাতে তিনি প্রেরিত চিঠিটি প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে প্রেরক নিজের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন। এমন কোন চিঠি যদি তিনি পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠান, যা প্রকাশিত হলে পত্রলেখকের প্রতি হুমকি আসতে পারে সে সব ক্ষেত্রে তিনি তার পত্রে সম্পাদককে পত্রিকায় তার নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানাতে পারেন। যেমন: এলাকার সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নিয়ে পত্র লিখে পুলিশ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পত্রলেখক ওই সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজদের হুমকির সম্মুখীন হতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে সম্পাদককে অনুরোধ জানালে পত্র প্রেরকের নাম গোপন করে চিঠি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে নিজের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা অবশ্যই সম্পাদককে জানাতে হবে। নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পাঠানো পত্র রচনার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

১. জনস্বার্থে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্পাদক
দৈনিক প্রাত্যহিক সংবাদ
১২৩. রামকৃষ্ণ মিশন রোড
ঢাকা-১২০৫।

মহোদয়,

জনস্বার্থে লিখিত এবং এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত চিঠিটি আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের 'চিঠিপত্র' কলামে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত

তরিখঃ ২৮ জুন, ২০১৯

শাহীন হাসান
মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ

মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী সমীপে

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার উত্তরাংশে বাইন-চাপড়া হাওর অবস্থিত। এ হাওরে প্রায় ২ শ' হতে ৩ শ' বিঘা বোরোধানের জমি আছে। এ হাওরের চতুর্দিকে বংশিকুন্ডা ইউনিয়ন, চামারদানি ইউনিয়নের চারখোলা গ্রাম, বায়েতকান্দা, আটপাটন ও গজারিয়া গ্রাম অবস্থিত। হাওরটির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে সোমেশ্বরী নদী। উত্তর নদী নামে আর একটি জলধারা সোমেশ্বরীতে পড়েছে। উত্তরে টাঙ্গা হাওরের নিম্নাংশ অবস্থিত। পূর্বে খাসি বংশিকুংরার উচ্চভূমি আছে। এ হাওরের চতুর্দিকে ৭/৮ ফুট উঁচু করে জাঙ্গাল বাঁধ দিলে হাওরটি কোন সময়ে বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হবে না। এর ফলে উক্ত হাওরে তিন ফসল উৎপাদন করা যাবে। জাঙ্গালের উপরে এবং উঁচু স্থানগুলোতে হিজল, জাম, মেহগনি, জামরুল, তেঁতুল, শিশু ইত্যাদি গাছ লাগানো যাবে। এখানে মাছের চাষও সম্ভব। আর ১৫/২০ বছর পর গাছ বিক্রি করে সরকার প্রচুর রাজস্ব আয় বাড়াতে পারে। বিষয়টি জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ ব্যাপারে আমি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শাহীন হাসান
মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ

২. পশু চিকিৎসালয়, চেয়ে চিঠি

সম্পাদক
দৈনিক বর্তমান
৯৮. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২০০।

মহোদয়,

আমাদের এলাকায় পশু চিকিৎসালয় স্থাপন সংক্রান্ত সংযুক্ত পত্রটি আপনার পত্রিকার 'চিঠিপত্র' কলামে প্রকাশ করলে কৃতার্থ হবো।

বিনীত

তরিখঃ শেরপুর
২৬ জুন, ২০১৯

(ম. আনোয়ার হোসেন)
সজবরখিলা, শেরপুর-২১০০।

পশু চিকিৎসালয় চাই

শেরপুর জেলার সজবরখিলা থানাধীন ৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত গৌরীপুর একটি বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল গ্রাম। এই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ১৫ থেকে ২০ হাজার লোক বাস করে। এদের অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের কৃষি কাজের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে গৃহপালিত গরু, ছাগল ও মহিষ। এই গৃহপালিত পশুগুলো অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রামের লোকের দুঃখের সীমা থাকে না। এখানে একটি বাজার, একটি হাইস্কুল, একটি মাদ্রাসা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ গ্রামে এবং আশেপাশের গ্রামে পশুচিকিৎসার জন্যে কোন ডাক্তার বা চিকিৎসালয় নেই। পশুর জন্যে ডাক্তার ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা পেতে হলে ৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী জেলা শহরে যেতে হয়। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে অসুস্থ অনেক পশুরই মৃত্যু ঘটে থাকে। তাই এই গ্রামে একটি সরকারি পশু চিকিৎসালয় স্থাপন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকবার আবেদন করা হলেও তাতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনতিবিলম্বে উক্ত গ্রামে একটি পশু চিকিৎসালয় স্থাপনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি।

ম. আনোয়ার হোসেন
সজবরখিলা, শেরপুর-২১০০।

২. সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্যে পুলিশ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ।

সম্পাদক মহোদয়
দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা
২৬. ফুলার রোড
ঢাকা-১২৮০।

মহাত্মন,

মিরপুর থানার কদমতলি মহল্লায় ইদানীং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি পত্র লিখেছি। আপনার পত্রিকার 'চিঠিপত্র' কলামে পত্রটি প্রকাশ করলে খুশি হবো। এই সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই যে, চিঠিটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে উক্ত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দ্বারা আমার জীবন ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আমার নিরাপত্তার স্বার্থে পত্রিকায় আমার নাম প্রকাশ না করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতি-

ভবদীয়,

তরিখ: ০৯/১০/২০১৮

ইফতেখারুল আলম
৩২৬. কদমতলি, মিরপুর, ঢাকা-১২০২।

কদমতলিতে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে পুলিশ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ

মিরপুর থানার অধীন কদমতলি মহল্লায় ইদানিং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্ধ্যার পর এই এলাকায় কোন মহিলা, এমন কি পুরুষও একা পথে বের হতে পারেন না। সন্ত্রাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্রের মুখে রাস্তা থেকে তাদের অলঙ্কার ও নগদ অর্থ ছিনতাই করে। কদমতলিতে বেশ কিছু অর্পিত সম্পত্তি আছে। সেখানে এই সন্ত্রাসীরা বস্তি বানিয়ে নিম্নবিত্ত লোকদের কাছে ভাড়া দিচ্ছে। কেউ ভাড়ার টাকা সময় মতো পরিশোধ করতে না পারলে তার সব মালামাল রেখে শূন্য হাতে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। গত বছর ডিসেম্বর মাসে সন্ত্রাসীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এক ব্যক্তি খুন হয়। পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছিল এখন দিব্যি তারা প্রকাশ্যে ঘোরা-ফেরা করছে। এই সংঘবদ্ধ দলটি নানা অনুষ্ঠানের নামে মহল্লার দোকানগুলোতে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে। এই দাবি নিয়ে তারা কোন কোন বসতবাড়িতেও ঢুকে পড়ে। এই প্রতিকার দাবি করে থানায় আবেদন করেও কোন লাভ হয় নি।

সম্মানিত বিভাগীয় পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ, কদমতলিতে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের এই দৌরাত্ম্য প্রতিরোধের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জনমনে শান্তি ফিরে আসবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কদমতলির স্থানীয় জনৈক বাসিন্দা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংবাদপত্রে পত্ররচনার কৌশল উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংবাদপত্রে পত্ররচনার কৌশলগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
২। এলাকায় একটি হাসপাতাল চেয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখুন।

নির্দেশ	প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

পাঠ - ৪

স্মারকলিপি, মানপত্র ইত্যাদি রচনার কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *স্মারকলিপি রচনার কৌশল আয়ত্ত করে তা লিখতে পারবেন।*
- *মানপত্র রচনার কৌশল অবগত হয়ে তা বলতে পারবেন।*
- *ব্যক্তিগত অভিনন্দনপত্র রচনার কৌশল জেনে তা চর্চা করতে পারবেন।*

একটি মানপত্র সাধারণত একক কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোন সংস্থা/সংগঠন বা তাদের পক্ষে কোন বিশিষ্টজনের নামে লেখা হয়। এখানে অত্যন্ত বিনয়ী ভাষায়, একাধিক বার সম্বোধন কৃতী ব্যক্তির প্রতি সম্মিলিতজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। মানপত্রের শিরোনামায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পদবী স্পষ্ট করে লিখতে হয়। পত্রের নিচে বাম দিকে তারিখ ও ডান দিকে পত্রদাতাদের নাম থাকে। স্মারকলিপি ও মানপত্র সাধারণ আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনানো হয়।

কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে যে পত্র লিখা হয় তাকে স্মারকলিপি বলে। এই ধরনের পত্র রচনার ক্ষেত্রে একটি বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করতে হয়। সেই বিষয়ের নির্দিষ্টতায় তত্ত্ব ও যুক্তির মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে পত্রটি সুদীর্ঘ হবে, কিন্তু তাতে থাকবে ভাব ও ভাষার সার্বিক সংহতি। স্মারকলিপি সাধারণত কোন সংগঠন বা বহু মানুষের একত্রিত কোন সংস্থা বা পক্ষ থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত হয়। এই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সরকারের কোন মন্ত্রী বা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যে-কেউ হতে পারেন। তবে যে বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করে স্মারকলিপি রচিত হবে তার সঙ্গে ওই ব্যক্তিটির কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে। স্মারকলিপির শিরোনামায় কার কাছে, কোন বিষয়ে দেয়া হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। আর পত্রের নিচে বাম দিকে তারিখ ও ডান দিকে যাদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিটি দেয়া হচ্ছে সেই পক্ষের উল্লেখ থাকবে। মানপত্রকে সম্মানপত্রও বলা যেতে পারে। কোন সম্মানিত ও কৃতী ব্যক্তির বিশেষ কৃতিত্ব, বিশেষ স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে উৎসাহী হয়ে ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সন্মান জানানোর জন্যে পত্র লিখা হয় তাকে মানপত্র বলে। একটি মানপত্র সাধারণত একক কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোন সংস্থা/সংগঠন বা তাদের পক্ষে কোন বিশিষ্টজনের নামে লেখা হয়। এখানে অত্যন্ত বিনয়ী ভাষায়, একাধিক বার সম্বোধন কৃতী ব্যক্তির প্রতি সম্মিলিতজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। মানপত্রের শিরোনামায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পদবী স্পষ্ট করে লিখতে হয়। পত্রের নিচে বাম দিকে তারিখ ও ডান দিকে পত্রদাতাদের নাম থাকে। স্মারকলিপি ও মানপত্র সাধারণ আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনানো হয়। ব্যক্তিগত অভিনন্দনপত্র লেখার ক্ষেত্রে এবং তা প্রদানের জন্যে কোন আয়োজনের দরকার হয় না। পরিচিত কোন ব্যক্তির বিশেষ কৃতিত্বে খুশি হয়ে বা গর্ববোধ করে তাকে যে পত্র লেখা হয় তাকেই ব্যক্তিগত অভিনন্দনপত্র বলে। এই ধরনের চিঠি 'ব্যক্তিগত চিঠি'র পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। এর আকার সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাষা ও উপস্থাপনা অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে থাকে। নিচে স্মারকলিপি, মানপত্র ও ব্যক্তিগত অভিনন্দনপত্রের নমুনা দেয়া হলোঃ

১. নদীতে সেতু নির্মাণের দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি

ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণের দাবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী জনাব হোসেনুর রহমান সমীপে জামালপুর জেলার জনগণের পক্ষ থেকে

স্মারকলিপি

মাননীয়
যোগাযোগ মন্ত্রী সমীপেষু
মহোদয়,

সন্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা জামালপুর জেলার অধিবাসীবৃন্দ একটি বিশেষ দাবি আপনার সমীপে পেশ করতে চাই। আপনার কর্মনিষ্ঠতা, বদান্যতা ও উদারতা সর্বজনবিদিত। এই মহৎ গুণই আপনার কাছে সরাসরি দাবি উত্থাপন করতে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে।

জামালপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলবর্তী জেলা। এই নদের অন্য কূলে শেরপুর জেলা অবস্থিত। ইতঃপূর্বে শেরপুর জেলার জনসাধারণ রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাসহ প্রাত্যহিক নানা প্রয়োজনে ব্রহ্মপুত্র নদের ফেরিঘাট বহু কষ্ট করে পার হয়ে জামালপুর জেলার সড়ক পথ ব্যবহার করতো। এতে পার্শ্ববর্তী জেলা দুটোর অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ও অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিলো। সম্প্রতি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু সহকারে বহু সেতু নির্মিত হবার ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ময়মনসিংহের ফুলপুরে চিন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু নির্মাণের ফলে শেরপুরের জনগণ এখন ফেরি পারাপারের বিড়ম্বনা এড়িয়ে ওই পথে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। এ কারণে সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরের সঙ্গে কুঁড়িগ্রামসহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার যোগাযোগ সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। ওই সব জেলার জনগণ শেরপুর-ময়মনসিংহ রোডে দেশের অন্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের জামালপুর বন্দরের মাধ্যমে যে পাথর ও কয়লা আমদানী হচ্ছে সেগুলোও একই পথে ঢাকায় চলে যায়। অন্যদিকে, যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হবার ফলে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু এই পথও জামালপুর জেলার পার্শ্ববর্তী টাঙ্গাইল জেলার উপর দিয়ে। এ কারণে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের সুফল কার্যত জামালপুরবাসীদের ভাগ্যে জোটে নি।

একটি প্রাচীন শহর হওয়ার পরও আজ জামালপুর অবহেলিত ও অনুন্নত জনপদে পরিণত হয়েছে। একদিকে চিন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ার কারণে যোগযোগের ক্ষেত্রে এই প্রাচীন জেলাটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অথচ উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে অনেকে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ এগুলো স্থানান্তরিত করছেন পার্শ্ববর্তী জেলা শেরপুর বা টাঙ্গাইলে। এমতাবস্থায় জামালপুর জেলার অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাপন সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এ অবস্থা থেকে জামালপুর জেলাবাসীকে পরিত্রাণ করার জন্যে শেরপুর-জামালপুর জেলা সীমান্ত মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্রনদের উপর সেতু নির্মাণ করার জোর দাবি পেশ করছি। এই সেতু নির্মিত হলে জামালপুরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত দিয়ে আমদানীকৃত পাথর ও কয়লা অল্পসময়ে উত্তরবঙ্গ সহ রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। কুঁড়িগ্রাম জেলা ও ওই অঞ্চলের লোকজনও আর একটি বিকল্প পথে অল্প সময়ে দেশের নানা স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে। তাছাড়া শেরপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের উপর থেকে যানবাহনের চাপ কমবে ও দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাবে।

এমতাবস্থায়, আশাকরি যে আমাদের দাবি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কৃপা দৃষ্টি লাভে ব্যর্থ হবে না। বিনীত-

তারিখ: জামালপুর
২৬ আগস্ট, ২০১৮

আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী
জামালপুর জেলার অধিবাসীবৃন্দ

২. ১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত এক অভিনন্দন সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে প্রদত্ত মানপত্রঃ

সুহৃদত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র,

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি, তোমার জীবনের ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্য গগণে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

অজয়,

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা বিদ্বৎ সমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃত রস চির সঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজয়, কীর্তিতে তুমি অমর। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনের প্রিয় তুমি,

মাধুর্য ধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিসিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর। তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি। পূর্ব দিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নব প্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি,

এই রথটিকে নিরন্তর বিজয় পথে চালনা করিয়াছ। এই দু:সাধ্য কার্যে তুমি আক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ। ক্ষমা দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, ধৈর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়ানবং ত্বাপ্রিয় পতিং হবামহে
নিধিনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে-

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

০৫ই ভাদ্র ১৩২১ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. ব্যক্তিগত, অভিনন্দনপত্র

অধ্যাপক আহমদ আলি খান
ডিন, কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

বন্ধুবরেষু,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন পদে নির্বাচিত হওয়ায় তুমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর। আজকের দৈনিক সংবাদপত্রে তোমার এই সাফল্যের খবর পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। একই স্কুল ও কলেজে আমাদের ছাত্রজীবনের মধুর দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে। তখন থেকেই তোমার মেধা ও যোগ্যতা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার একাগ্রতা, কর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সেই মেধা ও যোগ্যতার সম্মিলন ঘটিয়ে ভবিষ্যতে তুমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অধিক মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে।

তোমার জীবনের কর্মময় দিনগুলো সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে, তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

তোমার বন্ধু,

তরিখঃ ১৮ই মার্চ, ২০১৯

অতীশচন্দ্র রায়
অধ্যাপক, প্রাচ্যভাষা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি কলেজে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে একটি মানপত্র লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. স্মারকলিপি ও মানপত্র রচনার কৌশলসমূহ লিখুন।
২. ব্যক্তিগত অভিনন্দনপত্র কিভাবে লিখতে হয়, তার একটি নমুনা দিন।

নির্দেশ	প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন।

১০

অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা

ইংরেজি Paragraph শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'অনুচ্ছেদ'। আর ইংরেজি Essay শব্দের বাংলা রূপ হলো 'প্রবন্ধ'। মানুষের ভাব প্রকাশ করার বিষয়– বৈচিত্র্যময় ও সীমাহীন। অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ বৈচিত্রপূর্ণ ভাব মাধ্যমগুলোর মত একটি মাধ্যম। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনায় সূত্রপাত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। মানুষের মননের গঠনমূলক যুক্তি ও পরামর্শ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের প্রাণ হলো যৌক্তিক শৃঙ্খলা। মূলত শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ সাহিত্যের ও অনুচ্ছেদের গঠনরীতির সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যই এ ইউনিটে আলোচিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ ১. অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ - ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ
- পাঠ ২. অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার কৌশল
- পাঠ ৩. নির্ধারিত বিষয়ে অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা করা

পাঠ - ১

অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ : ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ কাকে বলে বলতে পারবেন;*
- *অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজনীয়তা কী তা বলতে পারবেন;*
- *অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।*

ভূমিকা

'অনুচ্ছেদ' ইংরেজি Paragraph শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ; আর প্রবন্ধ হচ্ছে Essay শব্দের বাংলা রূপ। তবে প্রবন্ধের আরো একাধিক সমার্থক ইংরেজি শব্দ হতে পারে। যেমন Article; Paper ইত্যাদি।

'অনুচ্ছেদ' ইংরেজি Paragraph শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ; আর প্রবন্ধ হচ্ছে Essay শব্দের বাংলা রূপ। তবে প্রবন্ধের আরো একাধিক সমার্থক ইংরেজি শব্দ হতে পারে। যেমন Article; paper ইত্যাদি।

মানুষের বলবার কথার কোন সীমা নেই; আর তার বিষয় বৈচিত্র্যও সীমাহীন। মানুষের সহজাত প্রবণতাই হচ্ছে সে তার অভিজ্ঞতা বা বোধকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। কিংবা বলা যায় তার ভাবনার জগতকে অন্যের সামনে খুলে দিতে চায়, যাতে করে অন্যেরা সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, ধারণা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। সৃষ্টিশীল মানুষেরা তাদের ভাবনাকে, জীবন দর্শনকে গল্প, কবিতা, নাটক বা উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। তারপরও অনেক কথা থেকে যায়– যা প্রকাশের জন্য মানুষ আশ্রয় নেয় প্রবন্ধের। আর সে প্রবন্ধেরই একটি অংশ হচ্ছে অনুচ্ছেদ (asection)।

প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদ অন্য প্রকাশ মাধ্যমগুলোর মত একটি মাধ্যম। তবে অন্য মাধ্যমগুলোর সঙ্গে বিষয়বস্তুগত, আকৃতি ও আঙ্গিকগত কিছু পার্থক্য একে অন্য মাধ্যম থেকে আলাদা করেছে। চিন্তার 'প্রকৃষ্টবন্ধনযুক্ত' রচনাকর্মকে সংস্কৃতে প্রবন্ধ আখ্যা দেয়া হতো। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মতে 'এক সময় ছিল যখন গদ্য বা পদ্য উভয় রীতিতেই প্রবন্ধ রচনার প্রচলন ছিল'। কিন্তু আজ আমরা পদ্যে প্রবন্ধ রচনার কথা ভাবতেও পারি না। আমরা জানি এবং মানি যে একমাত্র গদ্যেই প্রবন্ধ রচিত হয় এবং সেটাই স্বাভাবিক।

এক সময় ছিল যখন গদ্য বা পদ্য উভয় রীতিতেই প্রবন্ধ রচনার প্রচলন ছিল। কিন্তু আজ আমরা পদ্যে প্রবন্ধ রচনার কথা ভাবতেও পারি না। আমরা জানি এবং মানি যে একমাত্র গদ্যেই প্রবন্ধ রচিত হয় এবং সেটাই স্বাভাবিক।

মানব সমাজে চিন্তার বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে প্রবন্ধের বিস্তার ও বিকাশের ইতিহাস পরস্পর বিজড়িত ও সংলগ্ন। একটু আগেই বলেছি, মানুষের বলবার কথার বহুত্ব সম্পর্কে। সে কথাগুলো যখন সে অন্যকে বলতে চেয়েছে বা অন্যকে তার মত করে বুঝাতে চেয়েছে তখনই সে আবিষ্কার করেছে প্রবন্ধের রীতি। সে বুঝেছে এই মাধ্যমটির সাহায্যে সে সরাসরি তার বলবার কথাগুলো অন্যকে বুঝাতে বা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধের সূত্রপাত হয়েছে এখন থেকে প্রায় তিনশত বছর আগে। ফরাসি লেখক মঁতেন এর অনুসরণে ফরাসিতে এবং ফ্রান্সিস বেকনের অনুসরণে ইংরেজিতে প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছিল। ঐ দুই ভাষার প্রবন্ধ সাহিত্য আজ সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছেছে। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। বাংলাদেশে তখন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার চলছে। রাজা রামমোহন রায় তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাঁর ধর্ম মতের এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা নিবারণের বিষয় নিয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আর সেগুলো প্রকাশ করছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী' ও তৎকালের অন্যসব পত্র-পত্রিকায়। রাম মোহন প্রবর্তিত ধর্মমত যেহেতু সংস্কারাবদ্ধ হিন্দু সমাজে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি

করেছিল ফলে গোঁড়া হিন্দুরা গড়ে তুলেছিল রাম মোহনের বিরুদ্ধে শক্ত সমর্থ বিরোধী পক্ষ। তাঁরাও রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন এবং ধর্ম মতকে অসার প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁরাও নিজেদের মতের সপক্ষে পত্রিকায় লিখে চলেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাঙালি সমাজে যে তর্ক-বিতর্ক, উত্তর-প্রত্যুত্তরের সাহিত্য রচিত হতে শুরু করেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই মূলত বাংলা ভাষায় প্রবন্ধের সূত্রপাত ঘটে।

রাজা রামমোহনের পর অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এঁদের চিন্তাশীল রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার একটি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি তৈরি হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের রচনায় মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ পুষ্প শোভিত হয়ে ওঠে।

রাজা রামমোহনের পর অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এঁদের চিন্তাশীল রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার একটি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি তৈরি হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের রচনায় মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ পুষ্প শোভিত হয়ে ওঠে। আজ বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ সাহিত্য পৃথিবীর যে কোন ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সমান মর্যাদা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজনীয়তা

ছাত্র-ছাত্রীদের যে ধরনের প্রবন্ধ রচনা করতে হয় তার প্রকৃতি প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল চরিত্র থেকে খানিকটা ভিন্ন। চিন্তার যে সু-শৃঙ্খল বিন্যাস প্রবন্ধের সৌন্দর্যবিধান করে এবং চিন্তার যে সারবস্তু পাঠকের সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়, ছাত্রদের রচনায় তা আশা করা হয় না। তাদের রচনার মাধ্যমে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয় তা হলো, প্রবন্ধ সাহিত্যের বা অনুচ্ছেদের বিশেষ ধরনের গঠনরীতির সঙ্গে তারা পরিচিত হয়ে উঠতে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে। প্রবন্ধের প্রাণ হচ্ছে যৌক্তিক শৃঙ্খলা, আর সে যুক্তি পরামর্শ সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু ভাষার ওপর দখল না থাকলে প্রবন্ধের সৌসাম্য নির্মাণ করা অসম্ভব। সুতরাং প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে ছাত্ররা যুক্তিকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করতে শেখে এবং সেই সঙ্গে অর্জন করে ভাষাগত দক্ষতা ও সাবলীলতা।

কেবল যুক্তি উপস্থাপন এবং ভাষার সাবলীলতা অর্জনের জন্যই ছাত্রদের প্রবন্ধ রচনা করতে দেয়া হয় না; বরং বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা প্রকার তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কেও তাদের উৎসাহী করে তোলা হয়।

সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদ রচনা প্রধানত কয়েকটি কারণে প্রয়োজনীয় :

ক. নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের উৎসাহী করে তোলা;

খ. প্রবন্ধের গঠনরীতির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া;

গ. অনুচ্ছেদের গঠনরীতি সম্পর্কে অবহিত করা;

ঘ. চিন্তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস সাধন করতে শেখানো;

ঙ. ভাষার ওপর দক্ষতা ও সাবলীলতা অর্জনে সহায়তা করা।

প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা নানা দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক পার্থক্যের বিষয়টি নির্দেশ করেছেন। ঐ সব সূক্ষ্ম বিতর্কে না গিয়ে আমরা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রধানত দুটি বিভাজন মেনে নিতে পারিঃ

ক. চিন্তাশ্রিত প্রবন্ধ (Formal essay)

খ. ভাবাশ্রিত প্রবন্ধ (Familiar essay)

চিন্তাশ্রিত প্রবন্ধে লেখক প্রধানত একটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করেন এবং ঐ বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। যেমন একজন প্রবন্ধকার যদি বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় আকাশ সংস্কৃতি বা স্যাটেলাইট কালচার আমাদের চিন্তা, চেতনা ও ঐতিহ্যের ওপর কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে সে সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তবে একথা মেনে নিতেই হবে যে, তাঁর প্রকাশিত মত বা অবলম্বিত

দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সকলে একমত হবেন এমন নয়; বিপক্ষবাদীও থাকবেন। কিন্তু প্রবন্ধকার অবশ্যই তাঁর বক্তব্যকে বা চিন্তাকে যুক্তিপূর্ণভাবে, একটি শৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করবেন। বক্তব্য উপস্থাপনের এই কৌশলটি চিন্তাশ্রিত প্রবন্ধের বেলাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে ভাবাশ্রিত প্রবন্ধে লেখকের বিশিষ্ট মনোভাব প্রকাশিত হয়। ভাবাশ্রিত প্রবন্ধে বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ কোন অবস্থা লেখকের মনে যে ধরনের ভাবের উদ্রেক ঘটায় তাকেই প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' ভাবাশ্রিত প্রবন্ধের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। বর্ষার প্রথম দিন ও প্রথম বর্ষণ তাঁর মনে যে ধরনের ভাবাবেগ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে দেখা যায় নববর্ষের আলোচনা সূত্রে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছেন; সেখান থেকে নানা উদ্ধৃতি উল্লেখ করে, কালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভব মন্থন করে তুলে এনেছেন বর্ষা সম্পর্কিত নানা চিত্রের উল্লেখ। ঐ প্রবন্ধের মধ্যদিয়ে বোঝা যায় বর্ষা কবির চিত্তপটে কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং কোন ধরনের ভাবের সৃষ্টি করেছিল।

আমরা যে চিন্তামূলক প্রবন্ধের কথা একটু আগে বলেছি, সেটিই হল প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রধান ধারা। ঐ ধরনের প্রবন্ধই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রচিত হয়। এ কারণে চিন্তামূলক প্রবন্ধের পরিসর অনেক বিস্তৃত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করে চিন্তামূলক প্রবন্ধকে আরো কয়েকটি উপবিভাগে বিভাজন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে :

ক. বিবৃতিমূলক (Narrative)
খ. ব্যাখ্যামূলক (Expository)
গ. বর্ণনামূলক (Descriptive)
ঘ. তত্ত্বমূলক (Aurgumentive)
ঙ. ভাবমূলক (Reflective)
চ. তথ্যমূলক (Informative)

নিচে প্রত্যেক প্রকার প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করে তাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক।

বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ : এ ধরনের প্রবন্ধে প্রবন্ধকার তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে কোন একটি বিষয়ের পরিচিতি উপস্থাপন করেন এবং বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁর অবস্থানও ঘোষণা করেন। অর্থাৎ তিনি যদি বিষয়ের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন তবে যুক্তিসহ তাঁর অবস্থানকে কার্যকরণাত্মক করে তোলেন; আর যদি বিপক্ষে অবস্থান নেন তবে সেক্ষেত্রেও তিনি বিস্তার করেন বিপক্ষের যুক্তিজাল।

ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ : এ ধরনের প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বিষয়ের আপাত সত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে বরং তার ভেতরে প্রবেশ করে উদ্‌ঘাটন করতে চান প্রকৃত সত্যকে। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। আমাদের সমাজে দুর্নীতি আজ সর্ববিস্তারি। এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কিন্তু ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা ঐ স্বীকৃতি সত্যের সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কারণ অনুসন্ধান ও তাকে ব্যাখ্যা করে পৌঁছাতে চাইবেন একটি গভীরতর সত্যে।

বর্ণনামূলক প্রবন্ধ : এ ধরনের প্রবন্ধে তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তুলনায় বিষয়বস্তুর লক্ষ্য যোগ্য বর্ণনাই প্রাধান্য পায়। প্রবন্ধকার তাঁর খোলা চোখে বিষয়ের যতটুকু দেখতে পান সে সম্পর্কে একটি সরল বর্ণনা উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠকের সামনে এক ধরনের সত্যদৃষ্টির উন্মোচন ঘটাতে চান। বর্ণনামূলক প্রবন্ধের তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণ সে কারণে অনেকখানি পাঠকের প্রাজ্ঞতা ও বোধের ওপর নির্ভর করে।

তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ : তত্ত্বমূলক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার প্রথমেই নির্বাচিত বা নির্ধারিত বিষয়ের সব পক্ষের যুক্তি, পাল্টা যুক্তিকে একত্র করে নেন। তারপর সেগুলোকে শ্রেণীকরণ করেন অর্থাৎ যে যুক্তিগুলো অধিক তাৎপর্যপূর্ণ সেগুলোকে তিনি আলোচনার শুরুতে উপস্থাপন করেন এবং গুরুত্বের বিবেচনায় অবশিষ্ট যুক্তি বা পাল্টা যুক্তিকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন। এখানে প্রবন্ধকার বিষয়বস্তুর

পক্ষে ও বিপক্ষের সকল যুক্তিকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে পৌঁছাতে চান একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে। এ ধরনের প্রবন্ধ আজকালকার বিতর্কমূলক প্রতিযোগিতার তত্ত্বকাঠামোকে অনুসরণ করে যেন গড়ে ওঠে।

তথ্যমূলক প্রবন্ধ : এ ধরনের প্রবন্ধে প্রচুর পরিমাণ তথ্যের সমাবেশ ঘটে থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবন্ধকার সে সব তথ্যের কোন গভীরতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন না। গঠনের দিক থেকে একে পরিচিতি মূলক প্রবন্ধও বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে আমরা তথ্যমূলক প্রবন্ধের সমাবেশ বেশি দেখতে পাই। মনে করা যাক, একালের একটি জনপ্রিয় যন্ত্র কম্পিউটার, তাকে নিয়ে লেখা হতে পারে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ। ঐসব প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞদের উপযোগী কোন তথ্য হয়তো খুব বেশি থাকে না কিন্তু সাধারণ পাঠক তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। তাঁরা ঐ প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে যে সাধারণ ধারণা পেয়ে থাকেন তার মাধ্যমে উৎসাহী হয়ে আরো গভীরভাবে বিষয়টি জানবার চেষ্টা করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ রচনার বেলাতে উপর্যুক্ত বিভাজনগুলো সবক্ষেত্রে মেনে চলা সম্ভব হয় না। কারণ অনুচ্ছেদ মূলত ছোট পরিসরে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে টুকরো অনুভূতি দেবার চেষ্টা করে পাঠককে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রবন্ধ রচনার প্রকারভেদ সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।

২। অনুচ্ছেদ কাকে বলে? অনুচ্ছেদ ও প্রবাদ রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য কি?

২. প্রবন্ধকে কতভাগে ভাগ করা যায়? সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন

পাঠ - ২

অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *অনুচ্ছেদ রচনার কৌশল বলতে পারবেন;*
- *প্রবন্ধ রচনার কৌশল বলতে পারবেন।*
-

অনুচ্ছেদ এবং প্রবন্ধ দুটো ভিন্ন বিষয়; তাদের মধ্যে প্রকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে মিলের তুলনায় অমিলই বেশি। তবে একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, তা হলো দুটো বিষয়ই রচনামূলক, যদিও দুটোর আয়তনে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

অনুচ্ছেদ এবং প্রবন্ধ দুটো ভিন্ন বিষয়; তাদের মধ্যে প্রকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে মিলের তুলনায় অমিলই বেশি। তবে একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, তা হলো দুটো বিষয়ই রচনামূলক, যদিও দুটোর আয়তনে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এ পাঠটিতে প্রথমে আমরা অনুচ্ছেদ রচনার কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করবো, তারপর মনোযোগী হব প্রবন্ধ রচনার কৌশল সম্পর্কে।

অনুচ্ছেদ রচনার কৌশল

আয়তনের দিক দিয়ে অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অনুচ্ছেদটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেবে নাকি বিষয়বস্তুর একটি দিক নিয়ে অনুচ্ছেদ রচিত হবে? এ তর্কের মীমাংসা দেয়া খুব কষ্টকর। তবে একথা মনে রাখা দরকার, অনুচ্ছেদ রচনার অর্থ এ নয় যে, তা হয়ে উঠবে একটি পূর্ণ আকারের প্রবন্ধের যে কোন একটি অনুচ্ছেদ। এ ধরনের অনুচ্ছেদ সমগ্র প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য কিন্তু আলাদাভাবে তা পড়তে গেলে স্বাভাবিকভাবেই খাপছাড়া মনে হবে। বিষয়টিকে আরেকটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলা যাক।

উপন্যাস এবং ছোটগল্পের সঙ্গে আমাদের সবারই পরিচয় আছে। আমরা কেউই কিন্তু এ কথা মানবো না যে, একটি উপন্যাসের যে কোন অংশই হতে পারে একটি ছোটগল্প। উপন্যাসের কিছু কিছু উপাদান হয়তো পাওয়া যাবে ছোটগল্পেও কিন্তু উপন্যাস এবং ছোটগল্প প্রকৃতির দিক দিয়ে ভিন্ন, কেবল আকৃতির দিক দিয়ে নয়। উপন্যাস একটি বড় আয়তনের মধ্য দিয়ে যেমন সম্পূর্ণতা অর্জন করে ছোটগল্পও তেমনি তার ঐ ছোট আয়তনের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ।

সুতরাং আয়তনের দিক দিয়ে ছোট হলেও ঐ ছোট আয়তনের মধ্যদিয়েই অনুচ্ছেদকে হয়ে উঠতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেমন ছোটগল্প ছোট হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অনুচ্ছেদের ভাষাভঙ্গি হবে সরাসরি, প্রত্যক্ষ এবং অহেতুক অলঙ্কার বর্জিত।

অনুচ্ছেদ রচনার ক্ষেত্রে উপমাবহুল বা অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা যতদূর সম্ভব বর্জন করাই ভালো। কারণ ছোট আয়তনের কারণে ভাষার বাহুল্য প্রয়োগের ফলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাগুলো পাঠকের কাছে হয়ে উঠতে পারে দুর্বোধ্য এবং ধোঁয়াচ্ছন্ন। সুতরাং অনুচ্ছেদের ভাষাভঙ্গি হবে সরাসরি, প্রত্যক্ষ এবং অহেতুক অলঙ্কার বর্জিত।

তবে কোন বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচিত হচ্ছে তার ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করে অনুচ্ছেদটির ভাষাভঙ্গি কি হবে। যেমন, যদি বিষয় হয় 'নির্জন রাতে একাকী' তাহলে ভাষাশ্রিত এ বিষয়টির ভাষাভঙ্গি অবশ্যই হতে হবে খানিকটা কবিত্বময় (Poetic)। কিন্তু 'বাংলাদেশের শিল্প কারখানা' সম্পর্কে যদি একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হয়, তবে তার ভাষাভঙ্গি হতে হবে অবশ্যই প্রত্যক্ষ ও তত্ত্ব-তথ্যনির্ভর।

অনুচ্ছেদের আয়তন কোনভাবেই বড় হওয়া সমীচীন নয়। আয়তন ঠিক কতটুকু হবে তা নির্ভর করে লেখকের বিচার বিবেচনার ওপর। তবে অনুচ্ছেদটির আয়তন যেন অর্ধপৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

অনুচ্ছেদে যেন লেখকের চিন্তার মৌলিকতা ফুটে ওঠে, যাতে তা সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে। তবে কোনভাবেই তাতে যেন প্রতিষ্ঠিত সত্যের অপলাপ না ঘটে, সে ব্যাপারেও লেখককে সতর্ক থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ কেবল একটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কোনভাবেই তাকে একাধিক অনুচ্ছেদে বা Paragraph-এ বিভক্ত করা যাবে না।

যে বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে সে বিষয় সম্পর্কে লেখকের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিখুঁত অনুচ্ছেদ রচনার পূর্বশর্ত।

অনুচ্ছেদ যেহেতু আকৃতির দিক দিয়ে ছোট, সুতরাং সরাসরি সম্পর্ক নেই, কিংবা ততোটা প্রাসঙ্গিক নয়, এমন বিষয়ের অবতারণা না করা উচিত। অর্থাৎ অনুচ্ছেদ রচনার সময় সর্বতোভাবে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিহার করতে হবে।

এবারে আসুন একটি সার্থক অনুচ্ছেদ রচনার জন্য অবশ্যপালনীয় শর্তগুলো সূত্রাকারে আরেকবার দেখে নিইঃ

- ক) অনুচ্ছেদ আয়তনে ছোট হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে;
- খ) অনুচ্ছেদ রচনার ভাষা হতে হবে প্রত্যক্ষ, অহেতুক অলঙ্কারবর্জিত;
- গ) অনুচ্ছেদের আয়তন সম্পর্কে লেখকের বিবেচনাবোধ বাঞ্ছনীয়;
- ঘ) অনুচ্ছেদ রচনায় লেখকের মৌলিক চিন্তার প্রকাশ থাকতে হবে;
- ঙ) একটি অনুচ্ছেদে একাধিক Paragraph করা যাবে না;
- চ) বিষয়বস্তু সম্পর্কে রচনাকারীর স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে; এবং
- ছ) অনুচ্ছেদ রচনায় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা অনাকাঙ্ক্ষিত।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে একটি চমৎকার ও সার্থক অনুচ্ছেদ রচনা করা সম্ভব। তবে মনে রাখা উচিত সকল রচনাকর্মেরই সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রতিনিয়ত ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ওপর। পর্যাপ্ত অনুশীলনই একজন রচনাকারীকে দিতে পারে ভাষার ওপর পূর্ণ দক্ষতা এবং অর্জন করতে পারেন ভাষিক সাবলীলতা। তাই অনুচ্ছেদ রচনার মূল কৌশল হিসেবে আমরা অনুশীলনকে চিহ্নিত করতে পারি।

প্রবন্ধ রচনার কৌশল

যে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার শুরুতেই রচনাকারীকে বিষয়বস্তুটি ভালভাবে লক্ষ করতে হয়। বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্ধারণ করতে হয় তারপরই। তারপর প্রবন্ধকার বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্যগুলো নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে তার কী বলবার আছে সেগুলোকে নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় নোট সংগ্রহ করবেন। তারপর তিনি কোন পদ্ধতিতে তার যুক্তিগুলো উপস্থাপন করবেন তা নির্ধারণ করবেন। কারণ তথ্য ও যুক্তির পারম্পর্য সফল ও সার্থক প্রবন্ধের পূর্বশর্ত।

প্রবন্ধকে তিনটি অংশে বিভাজন করে নেয়া প্রয়োজন; সূচনা, মূলবক্তব্য ও উপসংহার। সূচনা অংশে প্রবন্ধকার তাঁর বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। কেন তিনি বিষয়টি নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে যাচ্ছেন তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করবেন। মূল বক্তব্য অংশে প্রবন্ধকার তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করবেন এবং ধাপে ধাপে তাঁর বক্তব্যকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করবেন। এ অংশে তিনি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি অর্থাৎ রেফারেন্স ও ক্রস রেফারেন্স প্রদান করবেন। এবং সেই সঙ্গে পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা করবেন। আর উপসংহার অংশে প্রবন্ধকার তাঁর মতামতসহ সমগ্র বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এ অংশে প্রবন্ধকার বিষয়বস্তুর দাবী অনুযায়ী আলোচনালব্ধ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করতে পারেন।

প্রবন্ধের যে তিনটি অংশের কথা বলা হল, তা যেন একটি জৈবিক ঐক্যে গ্রথিত হয়। অর্থাৎ সূচনা, মূলবক্তব্য ও উপসংহার অংশ তিনটি যেন পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হয়– সেগুলো যেন কোনভাবেই তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত না হয়। মনে রাখা দরকার, সূচনা অংশেরই বিবর্ধিত রূপ পাওয়া যাবে মূল

বক্তব্য অংশে। আবার একইভাবে, উপসংহার অংশে থাকতে হবে সূচনা ও মূলবক্তব্য অংশের অর্থাৎ সমগ্র অংশের সংক্ষিপ্ত সার।

প্রবন্ধের ভাষা নির্ধারিত হবে বিষয়বস্তু অনুসারে। অনুচ্ছেদ রচনার ক্ষেত্রে আমরা যেমন বলেছি, যে বিষয় অনুসারে যদি প্রয়োজন হয় তবে ভাষাকে খানিকটা Poetic বা কাব্যিক করে তোলা যেতে পারে। একই কথা বলা যায় প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও। প্রবন্ধের বিষয়টি যদি হয় ভাবমূলক (Reflective) তবে ভাষাকে খানিকটা কাব্যিক করে তোলার অবকাশ থাকে। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়টি যদি হয় তত্ত্বমূলক (Argumentive) সেখানে ভাষাকে হতে হয় প্রত্যক্ষ, যুক্তি প্রকাশের উপযোগী।

প্রবন্ধ মূলত ভাষা ও যুক্তির শিল্পরূপ। এ কারণে রচনাকারের ভাষাগত দক্ষতা ও সাবলীলতা একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ রচনার পূর্বশর্ত।

প্রবন্ধে ব্যবহারের জন্য নানা উৎস থেকে তথ্য আহরণ করার প্রয়োজন হতে পারে। সম্ভব হলে যথাস্থানে সে সব উৎসের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যদি তথ্যের যথাযথ উল্লেখ বা সূত্র নির্দেশ করা সম্ভব না হয়, তবে ঐ ধরণের তথ্য প্রবন্ধে যত কম ব্যবহার করা যায় ততোই ভাল।

মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা বিষয় প্রবন্ধের উপকরণ হয়। ফলে প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্য মানব জীবনের মতই বহুবিচিত্র। একেক ধরনের বিষয় একেক ধরনের রচনা রীতির উপযোগী। প্রবন্ধকার তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে নির্ধারণ করবেন কোন ধরনের রচনারীতি কোন বিষয়ের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও উপযোগী। যেসব প্রবন্ধ তথ্যমূলক সেখানে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও সাম্প্রতিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটানো প্রয়োজন।

প্রবন্ধ মূলত ভাষা ও যুক্তির শিল্পরূপ। এ কারণে রচনাকারের ভাষাগত দক্ষতা ও সাবলীলতা একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ রচনার পূর্বশর্ত। আর ভাষাগত দক্ষতা ও সাবলীলতা অর্জিত হয় ভাষার নিয়মিত ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে। এজন্য সার্থক প্রবন্ধকার হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নিয়মিত ভাষার অনুশীলন করতে হবে।

এবারে আসুন প্রবন্ধ রচনার কৌশল বা পূর্বশর্তগুলোকে আমরা সূত্রাকারে উপস্থাপিত করি।

ক. প্রবন্ধ রচনার শুরুতে মূল বক্তব্য স্থির করতে হবে;
খ. বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের নোট সংগ্রহ করতে হবে;
গ. যুক্তির পারস্পর্য সাজিয়ে নিতে হবে;
ঘ. প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত করতে হবে;
ঙ. প্রবন্ধের তিনটি অংশ জৈবিক ঐক্যে সংগ্রথিত হতে হবে;
চ. প্রবন্ধের ভাষা নির্ধারিত হবে বিষয়বস্তু অনুসারে;
ছ. প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য ও তত্ত্বের যথাযথ সূত্র নির্দেশ করতে হবে; এবং
জ. রচনারীতির ব্যাপারে লেখকের বিবেচনা বোধ প্রখর হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদ রচনার কৌশলগুলো কী? সেগুলো অনুচ্ছেদ রচনায় কীভাবে সাহায্য করতে পারে?
২. প্রবন্ধ রচনার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। প্রবন্ধ রচনার কৌশল বা পূর্বশর্ত কি কি?
২। অনুচ্ছেদ রচনার শর্তগুলো কি কি?

নির্দেশ	মূল পাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন

পাঠ - ৩

নির্ধারিত বিষয়ে অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা করা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- *কয়েকটি অনুসরণযোগ্য অনুচ্ছেদের সঙ্গে পরিচিত হবেন*
- *কয়েকটি অনুসরণ যোগ্য প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হবেন*
- *নিজে নিজে অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ লিখতে পারবেন।*

অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার জন্য কোন বিষয়গুলোর প্রতি রচনাকারীর নজর দিতে হয়। পূর্ব পাঠে আমরা সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, রচনার সময় ঐ বিষয়গুলো স্মরণ রাখা বা ঐ বিষয়গুলোকে কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা প্রবন্ধকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সব বিষয়ের অনুসরণের মধ্য দিয়ে রচনাকারী একটি পূর্বনির্ধারিত উপায়ে তাঁর বক্তব্যকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করতে পারেন। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, লেখা-লেখিতে দক্ষতা ও সাবলীলতা এক দিনে গড়ে উঠে না। তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ও সুশৃঙ্খল অনুশীলন। পর্যাপ্ত অনুশীলন ছাড়া ভাষার ওপর দক্ষতা জন্মে না; আর ভাষাগত দক্ষতা ছাড়া এ ধরনের লেখায় সাফল্য অর্জন করা যায় না।

নিচে কয়েকটি অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ নমুনা দেয়া হল। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং লক্ষ্য করতে চেষ্টা করবেন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে এগুলো রচিত হয়েছে। এগুলো পড়া শেষ করে যে সব বিষয়ে আপনাদের অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছে, সেগুলো লিখতে চেষ্টা করবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংকেত (Hints) দেয়া হলোঃ

শ্রমের মর্যাদা

মনীষী কার্লাইল তাঁর একটি রচনায় বলেছিলেন, যাঁদের হাতের ছোঁয়ায় পৃথিবী সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে এবং যাঁদের প্রচন্ড কায়িক পরিশ্রমে সভ্যতার চাকা এখনো সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারছে তিনি কেবল তাঁদেরকে এবং কেবল তাদেরকেই শ্রদ্ধা করেন। শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ থেকেই এ কথাগুলো বলেছিলেন। উন্নত বিশ্বে শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা দেয়া হয় এবং শ্রমজীবী মানুষকে তাঁরা সম্মানের চোখেই দেখে থাকে। অথচ আমাদের মত এই হতভাগ্য দেশে বিষয়টি ঘটছে সম্পূর্ণ উল্টো। এখানে তারাই শ্রদ্ধা পান যারা অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করেন। শ্রমজীবী মানুষ যেমন, তেমনি শ্রমও অত্যন্ত অসম্মানের ও লজ্জার বিষয় বলে আমরা মনে করি। বস্তুত, স্বল্প মূল্যে পর্যাপ্ত শ্রম এদেশে সুলভ বলেই আমাদের মানসিকতার এই দৈন্য দশা ঘটেছে; আমরা শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখি নি। আজকের পৃথিবীতে সমাজের প্রয়োজনেই ঘটে গেছে নানা রকম শ্রমবিভাগ। আমাদের মধ্যে যদি এই চেতনা থাকতো যে, বৃত্তি যাই হোক না কেন, সবার সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে; আমাদের জীবন সবার ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে, তাহলে সম্ভবত আমরা শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে পারতাম। তবে আশার কথা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার বুঝতে শিখছে, তারা আদায় করে নিচ্ছে তাদের প্রকৃত মযাদা। আর শ্রমবিমুখ মানুষেরা বাধ্য হচ্ছে নিজেদের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াতে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শাসক ও শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য কতিপয় কেরানী সৃষ্টি করা। তারা সে কাজে সফল হয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে আমরা বেরিয়ে এলাম বটে কিন্তু ঐ কেরানী তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ভাঙতে পারলাম না। এ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এখনো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিসহ অসংখ্য বেকার সৃষ্টি করছে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি বৃত্তিমূলক হতো, যদি আমরা আমাদের সম্পদ ও চাহিদার দিকে তাকিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে জাতি হিসেবে আজ যে ভাঙনের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি, তেমনটি হতো না। স্বাধীন দেশের অধিবাসী হয়েও আমরা এ সত্য উপলদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি যে ডিগ্রি অর্জনই বড় কথা নয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণরসের সংস্থান করতে পারার প্রশিক্ষণই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমরা এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই যে শিক্ষা বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী না করে। আমরা মেনে নিচ্ছি প্রতিভাবানের সোনালী স্পর্শে দেশ স্বর্ণময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ধরনের প্রতিভা সুলভ নয়। সব দেশেরই অধিকাংশ লোক সাধারণ মানের; তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষা একটি মূল্যহীন বিলাস মাত্র- তাদের জীবনকে ঐ শিক্ষা সম্ভাবনাময় করে তোলে না । আধুনিক সভ্য দেশে মানুষকে বিবেচনা করা হয় তার সামর্থ দিয়ে। যার সামর্থ যেমন তাকে সেই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। আমাদের দেশেও প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। রয়েছে বিপুল জনসংখ্যা। সেই বিপুল জনসংখ্যাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলে আমাদের সামগ্রিক মুক্তি সম্ভব। তাই সামগ্রিক মুক্তির জন্য, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পথ প্রশস্ত করার জন্য আমাদের চাই বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কেরানি তৈরির এবং শিক্ষিত বেকার তৈরির শিক্ষা নয়।

সংবাদপত্র

আধুনিক সভ্যতা মূলত সংবাদপত্র সৃষ্ট– এ ধরনের একটি কথা প্রায়ই উচ্চারিত হয়ে থাকে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে। কথাটার মধ্যে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকলেও সত্যের অভাব নেই। কারণ আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে সংবাদপত্র এবং তার প্রভাব জড়িয়ে আছে নানা দিক দিয়ে। নাগরিক মানুষের দিনই যেন শুরু হয় সংবাদপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় সংবাদ পত্রের ইতিহাস কিন্তু খুব পুরাতন নয়। সংবাদপত্রের সূত্রপাত হয়েছিল চীন দেশে। আধুনিক ইউরোপে একে জনপ্রিয় করে তোলে ইতালীয়রা। আমাদের দেশে জনসাধারণের জন্যে সংবাদ পত্রের সূচনা হয় ১৮১৮ সালে– প্রথম সংবাদপত্রের মর্যাদা প্রাপ্য 'সমাচার দর্পণের আর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের মর্যাদা প্রাপ্য 'সংবাদ প্রভাকরের– যা প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সালে। এই দেড় বা দুশো বছরের মধ্যে সংবাদপত্র যে আমাদের সমাজে তার বহু-বিস্তৃত প্রভাব দৃঢ় করতে পেরেছে তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। আমাদের সমাজে সংবাদপত্র মানুষের চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা দেয়। সাধারণ মানুষের রুচি গঠনেও সংবাদপত্র পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গণতান্তিক রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষকেই নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনগণ সে সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সংবাদপত্রই জনমত গড়ে তোলে কোন সমস্যার সমাধান কল্পে। আবার সংবাদপত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবই এর বড় দুর্বলতা। কারণ সংবাদপত্র যদি সরকার, ব্যক্তি বা গোষ্ঠির মতামত সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হয় তবে তা দেশ বা জাতির প্রতি দায় বদ্ধ না হয়ে ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির কাছে দায়বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে সাধারণ মানুষ সত্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তাছাড়া ইয়োলো জার্নালিজমের কু-প্রভাবে সংবাদপত্র হয়ে উঠতে পারে মারাত্মক ক্ষতিকর একটি প্রতিষ্ঠান। তবে আশা করা যায় সংবাদপত্র সেবী হিসেবে অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তিদের আত্মনিয়োগ এবং সামগ্রিক সমাজ চেতনার মাধ্যমে সংবাদপত্র তার প্রধান উদ্দেশ্যকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে।

বিজ্ঞাপন

প্রচারেই প্রসার– আর বিজ্ঞাপন হচ্ছে তার প্রধান মাধ্যম। আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য বিপননের অন্যতম উপায় হচ্ছে বিজ্ঞাপন। কারণ এর মাধ্যমেই ক্রেতা পণ্যের গুণাগুণ জানতে পারে এবং পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিজ্ঞাপন প্রচারের অনেক মাধ্যম রয়েছে– রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিলবোর্ড ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোন পদ্ধতিটি কখন সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত হবে সে ব্যপারে বিজ্ঞাপনী সংস্থাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপর বিজ্ঞাপনকে করে তুলতে হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার হৃদয়গ্রাহী। সেই সঙ্গে থাকতে হবে পণ্যের যাবতীয় গুণাগুণ। তবে আজকাল বিজ্ঞাপন কেবল পণ্য বিপননের জন্যেই ব্যবহৃত হয় না, কর্মখালির বিজ্ঞাপন, দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞাপন, হারানো বা প্রাপ্তির বিজ্ঞাপন, এমনকি পাত্র পাত্রি অনুসন্ধানের জন্যেও বিজ্ঞাপন ব্যবহৃত হয়। মূলত বিজ্ঞাপন সমাজে চাহিদা সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাজারের সম্প্রসারণ ঘটায় ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন খরচ কমে গিয়ে তা ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে। অর্থাৎ শিত্ম ও বাজারের অনুচ্ছেদ্য সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বিজ্ঞাপন। কিন্তু কেবল বিজ্ঞাপনের চটকদারিত্বের কারণে অনেক সময় ক্রেতা সাধারণ প্রতারিত হতে পারেন। সুতরাং পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবল বিজ্ঞাপন নয় তার গুণাগুণ বিবেচনাটাই মুখ্য হওয়া দরকার।

সময়ানুবর্তিতা

মহাকালের তুলনায় আমাদের জীবনের পরিসর অত্যন্ত ছোট কিন্তু আমাদের কর্মের ব্যাপ্তি বিশাল। ফলে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন , সময়ের যথাযথ ও পরিকল্পনামূলক ব্যবহার আমাদেরকে দিতে পারে সাফল্যের চাবি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও পৌঢ়ত্বের ঘেরা টোপে বন্দী আমাদের যে জীবন তার প্রতিটি পর্যায়েই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কর্মতৎপরতা। তাই প্রতিটি পর্যায়ের কাজগুলো যদি সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় তবেই জীবন সার্থক হয়, নতুবা তা ব্যর্থতার গ্লানিতে তলিয়ে যায়। সময়ের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। তারপর প্রয়োজন পরিকত্মনা মাফিক অগ্রসর হওয়া। মনে রাখতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তার সমগ্র সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়, আর পর মুহূর্তেই তা অনন্তকালের গহ্বরে হারিয়ে যায়। এ জন্য জীবনের কোন পর্যায়ের কোন কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকলে পরে তা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; পরে তা সম্পূর্ণ করতে গেলে জীবনের প্রতিটি কর্মেরই অঙ্গহানি ঘটে। এ অবস্থা যাতে না ঘটে তার জন্য যতক্ষণ কর্মক্ষমতা থাকে ততক্ষণ পরিকল্পনা মাফিক নিজেকে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। তবে জীবন কেবল কর্মময় নয়, সেখানে বিশ্রাম ও বিনোদনেরও একটি অধ্যায় আছে। কর্ম, বিশ্রাম ও বিনোদন এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন করে সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে মানব জীবন সার্থক হয়। জীবনের সাফল্যের মূলমন্ত্রই হচ্ছে সময়ানুবর্তিতা। মনে রাখা প্রয়োজন যে ঘড়ির টিকটিক শব্দ আমাদের কানে এ সাবধান বাণীই উচ্চারণ করছে, 'সাবধান, সময়কে ভুলো না; তোমার চৈতন্যকে জাগ্রত কর, গৌরব তোমারই হবে'।

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

সূচনা: প্রকৃতি বাংলাদেশকে অকৃপণ হাতে সাজিয়েছে পরম স্নেহে, পরম মমতায়। এর রূপ মাধুর্য বিশ্ববাসীকে নানাভাবে, নানা সময়ে মোহিত করেছে। এ দেশের মাটি, জল হাওয়া, বৈচিত্র্যময় অরণ্যানী, পাহাড়-সমুদ্র, কোন কিছুই মাধুর্যহীন নয়। এর রূপ বৈচিত্র্য এতটাই মধুর ও স্বতন্ত্র যে, কবি এ দেশকে বলেছেন 'সকল দেশের রাণী'।

বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি: বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ। প্রধানত সমতল তবে পাহাড়ি বৈচিত্র্যও এর কম নেই। চট্রগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি প্রকৃতির পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলের নদী নালা আর উত্তরাঞ্চরের দীর্ঘ মাঠ এদেশের প্রকৃতির প্রধান বৈচিত্র্য। তবে কক্সবাজার ও কুয়াকাটার নয়ন ভুলানো সমুদ্র আর সুন্দরবনের গাঢ় সবুজের সমাহার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দেশটি ছোট কিন্তু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের যেন কোন কমতি নেই সমগ্র দেশ জুড়েই; বহুবিচিত্র রূপ এ-দেশের ছোট্ট পরিধিতে সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সম্ভার।

ঋতুবৈচিত্র্য: বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ– প্রতিটি ঋতুই প্রকৃতিকে নিজের মত করে সজ্জিত করে। গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহের মধ্যেও মৌসুমী ফলের লোভনীয় আস্বাদ ভুলিয়ে দেয় খরতাপের দাহন। কালবৈশাখীর যে রুদ্রমূর্তি বৈশাখে দেখা যায় তাকে ভুলিয়ে দেবার জন্য পৃথিবীকে তার স্নিগ্ধ কোমল পরশে শীতল করে দেবার জন্যই যেন আসে বর্ষা। তবে অতিবর্ষণ আবার মাঝে মাঝে বন্যার ভয়াল মূর্তিতে রূপ নেয়। মাঠ-ঘাট-গ্রাম সব একাকার হয়ে যায় পানির নিষ্ঠুর তোড়ে। তার মধ্যেও জেগে থাকে সবুজের সমাহার, কচি ঘাস, আর গাছের কচি সবুজ পাতা প্রকৃতিকে সাজায় কুমারীর সাজে। ঘন বর্ষা কবির মনে গান জাগায় 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়।

শরতের বাংলার প্রকৃতি ধারণ করে শান্ত শোভাময় এক অপূর্ব শ্রী। শরতের কাশ ফুলে মাঠের পর মাঠ শ্বেত শুভ্র বসন পরে প্রকৃতি প্রেমিক মানুষকে আবাহন করে আনন্দ-প্রাঙ্গণে। মাথার ওপরে উদার নীল আকাশ আর মাঠ জুড়ে শুভ্রতার অজস্রতা কবির কণ্ঠে জাগায়-

শরৎ রাণীর বীণা বাজে
কমল দলে।
ললিত রাগের সুর ঝড়ে তাই
শিউলি তলে।
তাইতো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
ঢেউ উঠালে।

শরৎ রাণীর বিদায়ের পর 'হিমের ঘন ঘোমটায়' আবৃত হয়ে হেমন্ত এসে আসন পেতে বসে। ঘরে ঘরে তখন নতুন ফসলের আনন্দ সওগাত। নতুন ধানের নবান্ন উৎসব আর কৃষকবধূর স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনায় হেমন্ত পরিপূর্ণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তখন যেন কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এক সময় হেমন্ত তার বিনম্র অর্পণ প্রকৃতিকে নিঃশেষে উজার করে শীতের ঘন কুয়াশার আড়ালে বিদায় নেয়। এরপর শীত আসে তার গৈরিক বসন পরিধান করে। মাঠ তখন হয়ে উঠে ফসল শূন্য, শীতের পরশে ঝরে যেতে থাকে গাছের সবুজ পাতা। প্রকৃতিতে জেগে ওঠে এক নিরাভরণ রূপ। তবে এই নিরাভরণ সৌন্দর্যের মধ্যেই জেগে ওঠে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে পিঠাপুলির উৎসব। ভাপা পিঠা, রস পিঠা, পাটি সাপটা, ভাপাপুলি আরো নানা রকমের স্বাদে আর বৈচিত্র্যে শীত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আসে বসন্ত। আবার গাছে গাছে নতুন পাতার সমাহার ঘটে,

ফুলে ফুলে ভরে ওঠে গৃহ-প্রাঙ্গন। একারণে বসন্তকে বলা হয় ঋতুরাজ। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে মানব মনেও জাগে রঙের ছোঁয়া।

মানব মনে প্রভাব: বাংলাদেশের এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে এদেশের মানুষের মনেও এঁকে দেয় নানা রঙের ছবি। এদেশের মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে প্রকৃতি নির্ভর, প্রকৃতি সম্ভব এবং প্রকৃতিবিজড়িত। আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির রাজ্যেই বসবাস করি। ফলে তার হাতের কোমল-কঠিন পরশও আমাদের সমান ভাবে আকৃষ্ট করে। এদেশের প্রকৃতি এদেশের মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে বলেই মানুষের শান্ত জীবনের বৈশিষ্ট্য যেন প্রকৃতিরই অকৃপণ দান। তাই এদেশের মানুষ তাদের কাব্যে সাহিত্যে প্রকৃতির লীলাময় রূপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এদেশের গর্ব, অহংকার। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের প্রভাব পড়েছে এদেশের মানুষের মনে, মননে এবং আচরণে। এখানকার শান্তশ্রী সৌন্দর্যমন্ডিত প্রাকৃতিক শোভার কথা বিশ্ববাসীরও অজ্ঞাত নয়, তাদেরও অভিভূত আনন্দিত করেছে। দেশবাসীও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এর প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্যের জন্য।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা

সূচনা: **১৯৭১** সাল। বাঙালির জীবনে নেমে এসেছিল এক দীর্ঘ অন্ধকার। পাকিস্তানী শোষক বাহিনীর হাতে বাংলা-মা তখন আক্রান্ত। আর বাঙালি তাকে মুক্ত করার মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে, তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আর দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বোভৌম দেশ হিসেবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। পাকিস্তানী অপশক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে বাংলার দামাল ছেলেদের কাছে; বিজয়ের গর্বে বাঙালি বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ: বাংলাদেশের মুক্তযুদ্ধে কতিপয় দেশদ্রোহী রাজাকার ছাড়া তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল এ-দেশের আপামর জনগণ। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ বাহিনীর সদস্য, কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষ আর এ-দেশের সদাজাগ্রত ছাত্রসমাজ। ছাত্র-সমাজের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছিল নতুন মাত্রা। তারা দেশের ভেতরে এবং দেশের বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে পরাশক্তির হাত থেকে বাংলা মায়ের মুক্তিকে ত্বরান্বিত ও সুনিশ্চিত করেছিল। তাই আমাদের মুক্তি সংগ্রামে ছাত্র-সমাজের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা সর্বজনবিদিত ও সর্বস্বীকৃত।

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের অংশগ্রহণ: স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল বাঙালি তার স্বাধীন জাতিসত্ত্বাকে খুঁজে পায় নি। তার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। **১৯৫২** সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশের ছাত্র সমাজই প্রথম সত্যিকারভাবে অনুধাবন করে যে পাকিস্তানিরা ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী হবার কারণে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান অসম্ভব। ছাত্রসমাজ তাদের মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে সত্যকে অনুধাবন করেছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ- দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে তা সঞ্চারিত করেছিল। তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ-দেশের মানুষ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া নানা প্রকার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ- আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়। আর বাঙালি তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক্রমাগত সংঘবদ্ধ হতে থাকে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এ-জাতির বিভিন্ন দুঃসময়ে যে একত্র ও সংঘবদ্ধ হতে পেরেছিল তার মূল প্রেরণাই ছিল এ-দেশের ছাত্র-সমাজ। **১৯৫২** সালের ভাষা আন্দোলন, আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, **১৯৬৯** এর গণ অভ্যুত্থান এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়েই ছাত্র সমাজ পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক ভূমিকা। বস্তুতপক্ষে বাঙালি জাতির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্র সমাজের যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল তার থেকেই অনুমান করা যায় মুক্তিযুদ্ধের মত একটি মহান সংগ্রামে এ-দেশের ছাত্রসমাজ কতটা শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-সমাজের প্রত্যক্ষ ভূমিকা: এ-দেশের ছাত্র-সমাজ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নির্মাণে ও দেশবাসীকে একত্র করার কাজেই বিভিন্ন সময় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নি বরং মুক্তি সংগ্রামেও অস্ত্রহাতে নিয়ে, জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ছাত্র-সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণই বাংলাদেশের বিজয়কে সুনিশ্চিত করেছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাকিস্তানি নরপশুরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তার প্রথম শিকার হয়েছিল এ-দেশের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছিল বাঙালি জাতির মূল শক্তির উৎস হচ্ছে এ-দেশের ছাত্র সমাজ ফলে তাদের প্রথম টার্গেট হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তা মনে পড়লে এ-দেশের প্রতিটি মানুষই ভয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের অবদান: বাংলাদেশের সচেতন ছাত্র সমাজ পাকিস্তানি নরপশুদের এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ মেনে নেয় নি কোন ভাবেই। তারা হাতের কলম ফেলে জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে তুলে নেয় অস্ত্র। ছড়িয়ে পড়ে এদেশের গ্রামেগঞ্জে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্যে চলে যায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী হিসেবে ছাত্ররা পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। অসংখ্য ছাত্র মুক্তিসেনা দেশের বিভিন্ন অংশে হামলা চালিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করে। এভাবে সামনা-সামনি ও গেরিলা যুদ্ধের তীব্রতায় পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা সম্মিলিত মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ছাত্র-সমাজের অংশ গ্রহণ না হলে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্য মন্ডিত হতে পারতো না। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনেও ছাত্র সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। বস্তুতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজের যে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে তার কোন তুলনা নেই।

উপসংহার: আমাদের দেশের সব আন্দোলনে ছাত্র সমাজই অগ্রণী, সচেতন ও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়তা নিয়ে দেশের মুক্তি সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের ত্যাগের কোন তুলনা নেই। ছাত্র সমাজের তারুণ্যমাখা অদম্য শক্তিই ছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বড় ভরসা। মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ যে সদর্থক চেতনার স্বাক্ষর রেখেছিল তার প্রেরণা নিয়েই তাদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখানো হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সূচনা: সমগ্র বিশ্ব আজ একটি পরিবার; সেখানে রয়েছে নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের বসবাস। তাদের সম্মিলিত ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থানের কারণেই পৃথিবী সুন্দর হয়, বৈচিত্র্য লাভ করে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভেদ, জাতিতে-জাতিতে হিংসা, দ্বেষ। আর তার মধ্য দিয়ে ঘটে ঘৃণার জাগরণ, বিরোধের সূচনা। আর পরিণামে পৃথিবীতে নেমে আসে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিষ, মানুষকে করে তোলে খন্ডিত, বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কোন শুভ শক্তির প্রতীক নয়– বরং তা কালে কালে বিশ্ব সভ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ধরা আছে সে কলঙ্কের আখ্যান।

সাম্প্রদায়িকতার কারণ: নানা অশুভ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য পৃথিবীতে কালে কালে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, ছড়ানো হয়েছে এর বিষাক্ত বীজ। প্রধানত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি সফল করার জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে ব্যবহার করা হয়। এক ধর্মের বা এক জাতির লোক ক্ষমতার দম্ভে অন্যের ওপর প্রভুত্ব করবে তা কখনো মেনে যায় না। ফলে দাঁনা বাঁধতে থাকে নির্যাতিতদের মধ্যে অসন্তোষ। আর এক সময় তা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে। সমাজ থেকে

শুভ-অশুভ বোধ লোপ পায়। ক্ষমতাধরেরা তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ও বিস্তারে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আর এ-উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে ধর্মের মত একটি স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ ধর্মের দোহাই তাদের অকল্যাণকর কর্মে প্রথম হাতিয়ার; যা তাদের অন্যায় প্রতিষ্ঠা সহজতর করে। ফলে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ধর্মের নামে বা জাতিসত্ত্বার নামে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি বা জাতিগত ভেদবুদ্ধির আড়ালে তখন সূচিত হয় হিংসার, ক্ষমতার, নির্যাতনের এক অন্ধকার অধ্যায়। শুরু হয় হত্যা, ধর্ষণ, দাঙ্গা, লুণ্ঠন বা নানা প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা।

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা: এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা একটি বহু আবর্তিত সমস্যা। ১৭৩০ সালে মোঘল সম্রাট ফররুক শিয়রের রাজত্বকালে দোল খেলা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ হয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল– ইতিহাস থেকে সে তথ্য আমরা জানতে পারি। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯২২ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে এ দেশে ১১২টি ছোট বড় দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং তাতে ৪৫০ জনের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রতি বছরই কোন না কোন কারণে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছিল তার পেছনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও মাড়োয়ারীদের গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। ভারত বিভাগের পর ১৯৬৪, ১৯৯০ এবং ১৯৯২ সালেও ছোট খাট সাম্প্রদায়িক অংসহিষ্ণুতার কথা আমরা জানি। তবে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা এবং মসজিদের অবমাননা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল তা ক্রমশ দাঙ্গায় রূপ নিয়েছিল।

দেশে দেশে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি: বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িক অসম্প্রতির কথা আজ আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। শুধু ধর্মের নামেই নয় জাতিতে-জাতিতে গোত্রে-গোত্রে এমন কী সাদা-কালো মানুষদের পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি পৃথিবীকে আজ নিয়ে যাচ্ছে এক অজানা অন্ধকারের সীমানায়। কম্যুনিস্ট আমলের পতনের পর চেক, ক্রোয়েট ও স্লাভদের মধ্যে যে জাতিগত দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে তাতে সমগ্র ইউরোপ লজ্জিত হয়েছে। কসোভো, বসনিয়া-হার্জেগোভিনয়া কিংবা আল বেনিয়াতে ধর্মের নামে, জাতির নামে যে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির নজির আধুনিক বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে তাতে বিশ্ববাসী বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। সুদীর্ঘকাল প্যালেস্টাইনী জনতা তাদের অধিকার ফিরে পাবার জন্য রক্ত দিয়েছে। লেবাননে ইসরাইল দীর্ঘ ২২ বছর যাবত অবৈধ দখলদারিত্ব করছে। এ-সবই হচ্ছে ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে। ধর্মান্ধতা কিংবা জাতিগত বিদ্বেষ মানুষকে কী পরিমাণ অমানুষ, নিষ্ঠুর ও বর্বর বানিয়ে ফেলে তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা দেখলে।

সাম্প্রদায়িকতা প্রতিকারের উপায়: সাম্প্রদায়িকতা প্রকৃত পক্ষে অশুভ শক্তির একটি সবল হাতিয়ার। সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে মুনাফা অর্জনই হচ্ছে ঐ অশুভ শক্তির মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। ভারত বর্ষে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে এই অশুভ শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে বৃটিশ রাজশক্তি ফায়দা লুটেছে। তাই বৃটিশদের মত নতুন কোন নয়া ঔপনিবেশিক শক্তি এ ধরনের কোন অপকর্মে লিপ্ত কী-না সে-বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। জনগণকে অবহিত করতে হবে যে কোন সাম্প্রদায়িক বিভেদই মানবজাতির জন্য সুখকর নয়। তাদের দিতে হবে সহনশীলতার দীক্ষা। এ–ছাড়া মৌলবাদী রাজনৈতিক দলসমূহ, যারা ধর্মকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না, তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে নতুন প্রজন্মকে উদার মানবিক ও মুক্ত চিন্তার মানুষে পরিণত করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ মানবিকতার অঙ্গীকার।

এছাড়া শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করে, সংখ্যা লঘুদের মৌলিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো আশু সমাধানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব লোপ পাবে।

উপসংহার: সাম্প্রদায়িকতা নিঃসন্দেহে একটি ঘৃণ্য দিক। তবে মনে রাখা দরকার যা মানব কল্যাণের পরিপন্থী এবং মানব সভ্যতার কদর্যরূপের ধারক তা কখনো স্থায়িত্ব লাভ করে না। সম্মিলিত প্রচেষ্টায়,

সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমে এবং ঐকান্তিক সাধনায় বিশ্ব থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে নির্মূল করা সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে মুক্ত হলে পৃথিবী সুন্দর হবে। সদ্ভাব, সহাবস্থান ও সম্প্রীতিতে পৃথিবী মুখরিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
২। 'বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
৩। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। 'সময়ানুবর্তিতা' বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
২। 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা' বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
৩। 'শ্রমের মর্যাদা' বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

নির্দেশ	মূল পাঠের সহায়তা নিয়ে উত্তরগুলো নিজে তৈরি করুন